আসান ফেকাহ

১

মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী

www.icsbook.info

আসান ফেকাহ

১ম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.icsbook.info

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১১০

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৩

২৮তম প্রকাশ

রজব	১৪৩৩
আষাঢ়	১৪১৯
জুন	২০১২

বিনিময় ঃ ১৭০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ASAN FIQAH 1st Volume by Maulana Mohammad Yousuf Islahee. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 170.00 Only.

www.icsbook.info

প্রকাশকের কথা

দীর্ঘদিন থেকে ইলমে ফেকাহের উপর এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল যা হবে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রত্যেক মুসলিমের জীবনের সর্ব দিকের প্রয়োজন মেটাবে। আল্লাহ্‌র শোকর, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত "আসান ফেকাহ্" আমাদের সে প্রয়োজন পূর্ণ করেছে। দু'খণ্ডে রচিত এ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক জনাব আব্বাস আলী খান কর্তৃক ভাষান্তর হওয়ায় বইটির অনুবাদ যথার্থ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ খণ্ডে 'আকায়েদ', 'তাহারাত' ও 'সালাত' নামে তিনটি অধ্যায় রয়েছে। ২য় খণ্ডে রয়েছে 'যাকাত', 'সাওম' ও 'হজ্জের আহকাম'।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইলমে ফেকাহের চারটি মত প্রচলিত রয়েছে, তা হলো হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। এ ছাড়াও ভিন্ন একটি মতেরও অনুসারি রয়েছে যাঁরা উপরোক্ত চার মতের কারো অনুসরণ করেন না। তাঁরা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের পক্ষপাতী। তাঁরা 'সালাফী' বা 'আহলে হাদীস' নামে পরিচিত। উপরোক্ত সব মতই সঠিক। সব মতের ভিত্তিই কুরআন ও হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেরই প্রচেষ্টা ছিল কুরআন ও হাদীসের সার্বিক অনুসরণ। উপরোল্লেখিত মতপার্থক্যের কারণে একে অন্যের উপর দোষারোপ করা একে অন্যকে দ্বীন থেকে খারেজ মনে করে মুসলিম উম্মার ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির প্রচেষ্টা কোন মুখলেস হকপন্থীর কাজ হতে পারে না।

উপমহাদেশে সব মতের অনুসারীই রয়েছে। কিন্তু হানাফী মতের অনুসারীদের সংখ্যাই অধিক বিধায় মতপার্থক্য এড়িয়ে শুধুমাত্র হানাফী মতের উপর ভিত্তি করেই এ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। যাতে করে সাধারণ মুসলমান দ্বিধাহীন চিত্তে ও পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সহিত নিজস্ব মাযহাবের অনুসরণ করতে পারে। তবে স্থান বিশেষে কোথাও কোথাও ফেক্‌হী মাস্‌লাকের অভিমতও টিকায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন যুগে ওলামায়ে কেরাম কোন কোন মাসয়ালার ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণার পর বিভিন্ন মতের সুপারিশ করেছেন, এসব মতের যেটিকে সঠিক মনে করা হয়েছে তাও টিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে যে চায় প্রশস্ত অন্তকরণে তার উপরও আমল করতে পারে। এ ছাড়া মাসয়ালা মাসায়েলের সাথে সাথে ইবাদাত ও আমলের ফযীলত ও গুরুত্ব হাদীসের আলোকে বর্ণিত হয়েছে যাতে ইবাদাতের প্রতি অন্তরে জযবা পয়দা হয়।

আমাদের সাফল্য পাঠকদেরই বিচার্য। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তার দ্বীনের পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দিন। আমীন।

প্রকাশক

পরিভাষা

ফেকাহর কেতাবগুলোতে কিছু এমন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলোর কিছু নির্দিষ্ট এবং বিশেষ অর্থ রয়েছে। ফেকাহর আহকাম ও মাসায়েল বুঝতে হলে এগুলোর সঠিক অর্থও জেনে রাখা দরকার।

এ গ্রন্থেও স্থানে স্থানে প্রয়োজনমত এসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেকবার তা ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে গ্রন্থের প্রথমেই তার ব্যাখ্যাসহ তালিকা সন্নিবেশিত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করা হয়েছে। বাংলা ভাষার আক্ষরিক ক্রম অনুসারে এ পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনবোধ করলে তা দেখে নেয়া যেতে পারে। সকল পরিভাষাগুলো একত্রে মনে করে নেয়াও যেতে পারে।

সূচীপত্র

আকায়েদ অধ্যায় ৩৯
আরকানে ইসলাম ৪১
ইসলামী ধারণা—বিশ্বাস ও চিন্তাধারা ৪৩
নেক আমলের বুনিয়াদ ৪৩
ঈমান বলতে কি বুঝায় ৪৩
আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান ৪৪
তাকদীরের উপর ঈমান ৪৮
ফিরেশতাদের উপর ঈমান ৪৯
রসূলগণের প্রতি ঈমান ৫১
আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান ৫৩
আখেরাতের উপর ঈমান ৫৪
গায়ের ইসলামী আকায়েদ ও চিন্তাধারা ৫৮

তাহারাত অধ্যায় ৬৩
তাহারাত ৬৫
নাজাসাতের (অপবিত্রতা) বর্ণনা ৬৮
নাজাসাতের প্রকারভেদ ৬৮
নাজাসাতে হাকিকী থেকে পাক করার পদ্ধতি ৭১
নাপাক শোষণ করে নিতে পারে না এমন জিনিস পাক করার নিয়ম ৭৩
যেসব জিনিস নাজাসাত চুষে নেয় তা পাক করার নিয়ম ৭৩
তরল ও তৈলাক্ত জিনিস পাক করার নিয়ম ৭৫
জমাট জিনিস পাক করার নিয়ম ৭৬
চামড়া পাক করার নিয়ম ৭৬
শরীর পাক করার নিয়ম

তাহারাতের ছয়টি কার্যকর মূলনীতি ৭৭
তাহারাতের হুকুমগুলোতে শরীয়তের সহজকরণ ৭৯
পাক-নাপাকের বিভিন্ন মাসয়ালা ৮০

নাজাসাতে হুকমী **৮২**
নাজাসাতে হুকমীর প্রকারভেদ **৮২**

হায়েযের বিবরণ **৮৪**
হায়েয হওয়ার বয়স ৮৪
হায়েযের সময়-কাল ৮৪
হায়েযের মাসয়ালা ৮৪
নেফাসের বিবরণ **৮৭**
নেফাসের মুদ্দত ৮৭
নেফাসের মাসয়ালা ৮৭
হায়েয নেফাসের হুকুম ৮৮
এস্তেহাযার বিবরণ **৯১**
এস্তেহাযার অবস্থা ৯১
এস্তেহাযার হুকুম ৯২
প্রদর ৯২

পানির বিবরণ **৯৩**
পানির প্রকার ৯৩
পাক পানি ৯৩
মায়ে নাজাসাত (নাপাক পানি) ৯৪
পানির ব্যাপারে ছয়টি কার্যকর মূলনীতি **৯৫**
পানির মাসয়ালা ৯৬
পানি- যা দিয়ে তাহারাত দুরস্ত ৯৬
এমন পানি যা দিয়ে তাহারাত দুরস্ত নয় ৯৮
এমন পানি যা দিয়ে তাহারাত মাকরুহ ১০০
ঝুটা পানি প্রভৃতির মাসয়ালা ১০০

কূপের মাসয়ালা ও হুকুম ১০২
কূপের পানি পাক করার বিস্তারিত হুকুম ১০২
যে নাপাকির জন্যে সমুদয় পানি তুলে ফেলতে হবে ১০৩
যে নাপাকির জন্যে সমুদয় পানি তুলে ফেলা জরুরী নয় ১০৪
যে অবস্থায় কূপ নাপাক হয় না ১০৫

এস্তেঞ্জার বিবরণ ১০৭
পেশাব পায়খানা করার আদব ও হুকুম ১০৭
এস্তেঞ্জার আদব ও হুকুম ১০৯

অযুর বিবরণ ১১১
অযুর ফযীলত ও বরকত ১১১
অযুর মসনূন তরীকা ১১২
মুসেহ করার পদ্ধতি ১১৪

অযুর হুকুম ১১৫
যে যে অবস্থায় অযু ফরয হয় ১১৫
যেসব অবস্থায় অযু ওয়াজেব ১১৫
যেসব কারণে অযু সুন্নাত ১১৫
যে যে অবস্থায় অযু মুস্তাহাব ১১৫
অযুর ফরযসমূহ ১১৬
অযুর সুন্নাতসমূহ ১১৬
অযুর সুন্নাত পনেরটি ১১৬
অযুর মুস্তাহাব ১১৭
অযুর মাকরুহ কাজগুলো ১১৮
ব্যান্ডেজ এবং ক্ষত প্রভৃতির উপর মুসেহ ১১৮
যেসব জিনিসের উপর মুসেহ জায়েয নয় ১১৯
যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় ১১৯
যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় না ১২১
হাদাসে আসগারের হুকুমাবলী ১২২

রোগীর জন্যে অযূর হুকুম ১২২
রোগীর মাসয়ালা ১২৩
মুজার উপর মুসেহ **১২৪**
কোন্ কোন্ মুজার উপর মুসেহ জায়েয ১২৪
মুজার উপর মুসেহ করার পদ্ধতি ১২৫
মুসেহের মুদ্দত ১২৬
যে যে কারণে মুসেহ নষ্ট হয়ে যায় ১২৭
মুসেহ করার কতিপয় মাসয়ালা ১২৮
গোসলের বিবরণ **১২৯**
গোসলের পারিভাষিক অর্থ ১২৯
গোসল সম্পর্কে সাতটি হেদায়েত ১২৯
গোসলের মসনূন তরীকা ১৩০
গোসলের ফরয **১৩১**
গোসলের মাত্র তিন ফরয ১৩১
চুলের খোঁপা এবং অলংকারের হুকুম ১৩১
গোসলের সুন্নাত ১৩১
গোসলের মুস্তাহাব ১৩২
গোসলের হুকুম **১৩৩**
গোসলের প্রকার ১৩৩
গোসল ফরয হওয়ার অবস্থা ১৩৩
গোসল ফরয হওয়ার প্রথম অবস্থা ১৩৩
বীর্যপাত সম্পর্কে কিছু মাসয়ালা ১৩৪
গোসল ফরয হওয়ার দ্বিতীয় কারণ ১৩৪
গোসল ফরয হওয়ার কতিপয় মাসয়ালা ১৩৫
গোসল ফরয হওয়ার তৃতীয় কারণ ১৩৫
গোসল ফরয হওয়ার চতুর্থ কারণ ১৩৬
যে যে অবস্থায় গোসল ফরয হয় না ১৩৬
যে যে অবস্থায় গোসল সুন্নাত ১৩৬

যে যে অবস্থায় গোসল মুস্তাহাব ১৩৬
যে যে অবস্থায় গোসল মুবাহ ১৩৭
গোসলের বিভিন্ন মাসয়ালা ১৩৭
হাদাসে আকবারের হুকুমাবলী ১৩৮
তায়াম্মুমের বয়ান ১৩৯
তায়াম্মুমের অর্থ ১৪০
কি কি অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয ১৪০
তায়াম্মুমের মসনূন তরীকা ১৪১
তায়াম্মুমের ফরযগুলো ১৪২
তায়াম্মুমের সুন্নাত ১৪২
যেসব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয বা নাজায়েয হয় ১৪৩
যেসব জিনিসে তায়াম্মুম নষ্ট হয় ১৪৩
তায়াম্মুমের বিভিন্ন মাসয়ালা ১৪৪

সালাত অধ্যায় ১৪৭
নামাযের বয়ান ১৪৯
নামাযের অর্থ ১৪৯
নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব ১৫০
একামাতে সালাতের শর্ত ও আদব ১৫৩
তাহারাত বা পবিত্রতা ১৫৩
সময়ের নিয়মানুবর্তিতা ১৫৪
নামাযের সময় নিষ্ঠা ১৫৪
কাতার বন্দীর ব্যবস্থাপনা ১৫৫
মনের প্রশান্তি ও মধ্যবর্তীতা ১৫৬
জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থাপনা ১৫৭
কুরআন তেলাওয়াতে তারতীল ও চিন্তাভাবনা ১৫৮
আগ্রহ ও মনোযোগ ১৫৮
শিষ্টাচার ও আত্মসমর্পণ ১৫৯
বিনয় নম্রতা ১৬০

আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অনুভূতি ১৬০
আল্লাহ্‌র স্মরণ ১৬১
রিয়া থেকে দূরে থাকা ১৬২
পূর্ণ আত্মসমর্পণ ১৬২
নামায ফরয হওয়ার সময়কাল ১৬৩

নামাযের সময় ১৬৪
ফজরের সময় ১৬৪
যোহরের সময় ১৬৫
আসরের সময় ১৬৬
মাগরেবের সময় ১৬৬
এশার সময় ১৬৭
বেতরের নামাযের সময় ১৬৭
দু'ঈদের নামাযের সময় ১৬৭
নামাযের এ সময়গুলো সারা বিশ্বের জন্যে ১৬৮

নামাযের রাকয়াতসমূহ ১৬৯
ফজরের নামায ১৬৯
যোহরের নামায ১৭০
জুমার নামায ১৭০
আসরের নামায ১৭০
মাগরেব ১৭০
এশা ১৭১

নামাযের মাকরূহ সময় ১৭২
যে যে সময়ে প্রত্যেক নামায নিষিদ্ধ ১৭২
যে যে সময়ে নামায পড়া মাকরূহ ১৭২
যে যে সময় শুধু নফল নামায মাকরূহ ১৭২

আযান ও একামাতের বয়ান ১৭৪
আযান ও একামাতের অর্থ ১৭৪

আযানের ফযীলত	১৭৪
আযান ওএকামাতের মসনূন তরীকা	১৭৫
আযানের জবাব ও দোয়া	১৭৬
আযান ও মুয়াযযেনের রীতি পদ্ধতি	১৭৮
আযান ও একামাতের মাসয়ালা	১৭৯
আযানের জবাব দেয়া ওয়াজেব কিন্তু সাত অবস্থায় না দেয়া উচিত	১৮০
নামায ফরয হওয়ার শর্ত	১৮১
নামাযের ফরযসমূহ	**১৮২**
শারায়েতে নামায	১৮২
নামাযের আরকান	১৮৪
নামাযের ওয়াজেবসমূহ	১৮৫
নামাযের সুন্নাতসমূহ	১৮৬
নামাযের মুস্তাহাবগুলো	১৮৯
যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়	১৯০
যেসব কারণে নামায মাকরুহ হয়	১৯৩
নামাযের মাকরুহ কাজগুলো আটাইশটি	১৯৩
যেসব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয অথবা ওয়াজেব	১৯৬
নামায পড়ার বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতি	**১৯৯**
তাকবীর	২০০
সূরা ফাতেহা ও কুরআন পাঠ	২০১
রুকু’	২০১
রুকু’র তাসবীহ	২০১
কাওমা	২০২
সিজদা	২০২
জালসা	২০২
কা’দা	২০৩
তাশাহহুদ	২০৩
দরুদের পর দোয়া	২০৪

সালাম	২০৫
নামাযের পরে দোয়া	২০৫
নারীদের নামাযের পদ্ধতি	২০৬
বেতর নামাযের বিবরণ	২০৮
বেতর নামায পড়ার নিয়ম	২০৮
দোয়া কুনুত	২০৯
কুনুতে নাযেলা	২১১
কুনুতে নাযেলার মাসয়ালা	২১১
কুনুতে নাযেলার দোয়া	২১২
নফল নামাযের বিবরণ	২১৫
তাহাজ্জুদের নামায	২১৫
তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত	২১৭
তাহাজ্জুদের রাকয়াতসমূহ	২১৯
তারাবীহর নামায	২১৯
চাশতের নামায	২২০
তাহিয়্যাতুল মসজিদ	২২০
তাহিয়্যাতুল অযু	২২০
সফরে নফল	২২১
সালাতুল আওয়াবীন	২২১
সালাতুত তাসবীহ	২২১
সালাতে তাওবা	২২২
সালাতে কসূফ ও খসূফ	২২৩
সালাতে হাজাত	২২৪
এস্তেখারার নামায	২২৫
এস্তেখারা করার নিয়ম পদ্ধতি	২২৬
এস্তেখারার দোয়া	২২৬
মসজিদের বিবরণ	২২৮
মসজিদের আদব ও শিষ্টাচার	২৩০

জামায়াতে নামাযের বর্ণনা	**২৩৭**
জামায়াতের তাকীদ ও ফযীলত	২৩৭
জামায়াতের হুকুম	২৪০
জামায়াত ওয়াজেব হওয়ার শর্ত	২৪১
জামায়াত ছেড়ে দেয়ার ওযর	২৪১
কাতার সোজা করা	২৪২
মহিলাদের জামায়াত	২৪৪
সুতরা	২৪৪
জামায়াত সম্পর্কে মাসয়ালা	২৪৫
দ্বিতীয় জামায়াতের হুকুম	২৪৭
ইমামতির বর্ণনা	**২৪৯**
ইমাম নির্বাচন	২৪৯
ইমামতির মাসয়ালা	২৫০
মেশিনের সাহায্যে ইমামতি	২৫২
মুক্তাদীর হুকুম	**২৫৫**
মুক্তাদীর প্রকার	**২৫৬**
নামাযে কেরায়াতের মাসয়ালা	**২৫৮**
নামাযে মসনূন কেরায়াত	২৬০
সিজদায়ে তেলাওয়াত	২৬১
ইমামের পেছনে কেরায়াতের হুকুম	২৬১
ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া	২৬২
সিজদায়ে সহুর বয়ান	**২৬৩**
সহু সিজদার নিয়ম	২৬৩
যেসব অবস্থায় সিজদা সহু ওয়াজেব হয়	২৬৩
সহু সিজদার মাসয়ালা	২৬৪
কাযা নামায পড়ার বিবরণ	**২৬৮**
কাযা নামাযের হুকুম	২৬৮

কাযা নামাযের মাসয়ালা ও হেদায়েত ২৬৯
সাহেবে তরতীব এবং তার কাযা নামায ২৭২

অক্ষম ও রোগীর নামায **২৭৩**

কসর নামাযের বয়ান **২৭৫**
কসর নামাযের হুকুম ২৭৫
সফরে সুন্নাত এবং নফলের হুকুম ২৭৫
কসরের দূরত্ব ২৭৬
কসর শুরু করার স্থান ২৭৭
কসরের মুদ্দত ২৭৭
কসরের বিভিন্ন মাসয়ালা ২৭৭
সফরে একত্রে দু'নামায ২৭৯

জুমার নামাযের বিবরণ **২৮১**
জুমার দিনের ফযীলত ২৮১
জুমার নামাযের অপরিহার্যতা ২৮৩
জুমার নামাযের হুকুম, ফযীলত ও গুরুত্ব ২৮৩
জুমার নামাযের শর্ত ২৮৬
শারায়েতে ওজুব ২৮৭
শারায়েতে ওজুব পাওয়া না গেলে জুমার নামাযের হুকুম ২৮৭
শারায়েতে সেহহাত ২৮৭
শর্তগুলোর ব্যাখ্যা ২৮৮
পল্লীগ্রামে জুমার নামায ২৯১
জুমার নামাযের জন্যে মুসলমান শাসকের শর্ত ২৯৩
জুমার সুন্নাতসমূহ ২৯৪
জুমার আহকাম ও আদব ২৯৫
খুতবার আহকাম ও আদব ২৯৮
নামায এবং খুতবায় মাইকের ব্যবহার ৩০২
জুমার আযানের পরে বেচা-কেনা নিষিদ্ধ ৩০২
খুতবায় মসনূন পদ্ধতি ৩০৩

দুই ঈদের নামাযের বিবরণ	**৩০৪**
ঈদুল ফেতরের মর্ম	৩০৪
ঈদুল আযহার মর্ম	৩০৪
ঈদুল ফেতরের দিনে সুন্নাত কাজ	৩০৫
ঈদুল আযহার দিনে সুন্নাত কাজ	৩০৬
ঈদের নামায	৩০৬
ঈদের নামাযের নিয়ত	৩০৬
ঈদের নামাযের পদ্ধতি	৩০৬
ঈদের নামাযের সময়	৩০৭
ঈদের নামাযের মাসয়ালা	৩০৭
ঈদের খুতবার মাসয়ালা	৩০৯
তাকবীরে তাশরীক	৩১০
রোগ ও মৃত্যুর বিবরণ	**৩১১**
রোগীর এয়াদাতের মাসয়ালা ও আদব	৩১১
মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্যে আদব–কায়দা ও হুকুম	৩১৩
মাইয়েতের গোসলের হুকুম	৩১৫
মাইয়েত গোসলের সুন্নাত মুতাবেক পদ্ধতি	৩১৬
কাফনের মাসয়ালা	৩১৬
কাফন পরাবার নিয়ম	৩১৮
জানাযার নামায	**৩১৯**
জানাযার নামাযের হুকুম	৩১৯
জানাযা নামাযের সুন্নাত	৩১৯
নামায পড়ার নিয়ম	৩১৯
নাবালেগ মাইয়েতের জন্যে দোয়া	৩২১
নাবালিকার দোয়া	৩২১
জানাযার বিভিন্ন মাসয়ালা	৩২২
জানাযা কাঁধে নেয়ার নিয়ম	৩২৩
দাফনের মাসয়ালা	৩২৪

সান্ত্বনা দান ৩২৫

ইসালে সওয়াব **৩২৬**

ইসালে সওয়াবের নিয়ম ৩২৬

ইসালে সওয়াবের মাসয়ালা ৩২৬

গ্রন্থপঞ্জী **৩২৮**

আক্ষরিক ক্রমানুসারে ফেকাহর পরিভাষা

আ

১. আদা

যে এবাদত তার নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা হয় তাকে 'আদা' বলে। যেমন ফজরের নামায সুবহে সাদেকের পর থেকে বেলা ওঠার আগে পর্যন্ত পড়া এবং রমযানের রোযা রমযান মাসেই রাখাকে বলে 'আদা'।

২. আওসাতে মুফাস্‌সাল

সূরা الطارق থেকে البينة পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'আওসাতে মুফাস্‌সাল' বলে। আসর এবং এশার নামাযে এগুলো পড়া মসনুন।

৩. আইয়ামে তাশরীক

যুলহজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখগুলোকে 'আইয়ামে তাশরীক' বলে। ইয়াওমে আরফা (৯ই যুলহজ্জ), ইয়াওমে নহর (১০ই যুলহজ্জ) এবং আইয়ামে তাশরীক–এ পাঁচ দিনের প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে তাকবীর পড়া হয় তাকে তাকবীরে তাশরীক বলে।

৪. আকীদাহ্‌

অর্থাৎ এমন এক সত্য যার উপর মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, যেমন এ সত্য যে আল্লাহ্‌ এক এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, হুকুক ও এখতিয়ারে তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই। এ হলো মুসলমানের আকীদাহ্‌।

৫. আমলে কালীল

আমলে কালীল বলতে এমন কাজ বুঝায় যা নামাযী বেশী করে না। কোন প্রয়োজনে আমলে কালীল হলে তাতে নামায নষ্টও হয় না এবং মাকরুহও হয় না।

৬. আমলে কাসীর

এমন কাজ যা নামাযী বেশী করে এবং কেউ দেখলে মনে করে যে, লোকটি নামায পড়ছে না। যেমন কেউ দু'হাতে শরীর চুলকাতে লেগে

গেল অথবা কোন মেয়েলোক নামাযে মাথার চুল বাঁধতে লাগলো। এগুলোকে আমলে কাসীর বলে এবং এতে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

৭. আওরত

শরীরের ঐসব অংশকে আওরত বলে যা আবৃত রাখা ফরয। পুরুষের জন্যে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখা ফরয। হাঁটু ঢেকে রাখাও ফরয। নারীদের জন্যে মুখ, হাতের তালু এবং পায়ের তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত রাখা ফরয।

ই

৮. ইসলামী শায়ায়ের

ইসলামী শায়ায়ের বলতে ঐসব দ্বীনী এবাদত এবং আমল বুঝায় যা দ্বীনের মহত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের নিদর্শন এবং যা দ্বীনের জন্যে আকর্ষণ, ভালোবাসা ও তার মহত্ব এবং গুরুত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

৯. ইসালে সওয়াব

নিজের নেক আমল এবং আর্থিক ও দৈহিক এবাদতের সওয়াব কোন মৃত ব্যক্তিকে পৌছানো অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে এ দোয়া করা, 'আমার এ এবাদত অথবা নেক আমলের সওয়াব অমুক ব্যক্তির রূহে পৌছিয়ে দিন' একে বলে ইসালে সওয়াব।

১০. ইয়ায়েসা

যে বৃদ্ধার হায়েয বন্ধ হয়, তাকে ইয়ায়েসা বলে।

এ

১১. এযনে আম

এ হচ্ছে জুমার নামায ওয়াজেব হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে একটি। তার অর্থ হলো যেখানে জুমার নামায পড়া হয় সেখানে সকল শ্রেণীর লোকের শরীক হওয়ার অবাধ অনুমতি থাকবে এবং কারো জন্যে কোন প্রকারের বাধা নিষেধ থাকবে না।

১২. একামাত

জামায়াতে দাঁড়াবার পূর্বে এক ব্যক্তি ঐ কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করা যা

আযানে বলা হয়েছে এবং অতিরিক্ত قد قامت الصلوة ও দু'বার বলা তাকে একামাত বলে। সাধারণত একে তাকবীরও বলা হয়।

১৩. এক্তেদা

ইমামের পেছনে জামায়াতে নামায পড়াকে 'এক্তেদা' বলে। এক্তেদাকারীকে 'মুক্তাদী বলে। যে ইমামের এক্তেদা করা হয় তাকে 'মুক্তাদা' বলা হয়।

১৪. এস্তেকবালে কেবলা

নামায পড়ার সময় কেবলার দিকে মুখ করাকে এস্তেকবালে কেবলা বলে। কেবলার দিকে মুখ করার অর্থ মুখ এবং বুক কেবলা মুখী করা। এ হলো নামাযের শর্তাবলীর মধ্যে একটি এবং এ শর্ত পূরণ না করলে নামায সহীহ হয় না।

১৫. এস্তেখারা

এস্তেখারা অর্থ হলো মঙ্গল কামনা করা। পরিভাষা হিসাবে এস্তেখারা অথবা ইস্তেখারার নামায বলতে ঐ নফল নামায বুঝায় যা নবী (সঃ) মুসলমানদেরকে এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি কখনো কোন জায়েয কাজ করতে গিয়ে তার ভালো দিকটা কি তা সুস্পষ্ট হয় না এবং ভালো মন্দ কোন দিক সম্পর্কেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তখন দু' রাক্‌য়াত নফল নামায পড়ে এস্তেখারার মসনূন দোয়া পড়বে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ এস্তেখারা নামাযের বরকতে কোন একটি দিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা অথবা মনের প্রবণতা সৃষ্টি করে দেবেন।

১৬. এস্তেঞ্জা

মানবীয় প্রয়োজন তথা পেশাব পায়খানার পর শরীরের অগ্রপশ্চাৎ অংশ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করাকে বলা হয় 'এস্তেঞ্জা'। এ এস্তেঞ্জা মাটি অথবা পানি দ্বারা হতে পারে।

১৭. এস্তেহাযা

হায়েয ও নেফাস ছাড়া মেয়েদের প্রশ্রাবদ্বার দিয়ে যে রক্ত আসে তাকে এস্তেহাযা বলে।

১৮. এক মিসাল

বেলা গড়ার সময় প্রত্যেক বস্তুর যে আসল ছায়া হয় তা বাদে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমান হলে তাকে এক মিসাল বলে।

১৯. এয়াদাত

এয়াদাতের অর্থ হলো রোগীর নিকটে গিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা। এ কাজ মুস্তাহাব।

ও

২০. ওয়াজেব

ওয়াজেব আদায় করা ফরযের মতোই অনিবার্য। যে ব্যক্তি একে তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মনে করে এবং বিনা কারণে ত্যাগ করে সে ফাসেক এবং শাস্তির যোগ্য হবে। এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। অবশ্য ওয়াজেব অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না।

২১. ওয়াদী

বীর্যপাত এবং তার পূর্ব মুহূর্তে যে তরল পদার্থ বের হয় তাছাড়া অন্য সময়ে যে গাঢ় পদার্থ লিংগ দিয়ে নির্গত হয় এবং বেশীর ভাগ প্রস্রাবের পর নির্গত হয় তাকে ওয়াদী বলে।

২২. ওয়াতনে আসলী

এমন স্থানকে 'ওয়াতনে আসলী' বলে যেখানে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যদি কেউ সে স্থান পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা করে তাহলে সে স্থান 'ওয়াতনে আসলী' হয়ে যাবে। প্রথম স্থান 'ওয়াতনে আসলী' আর থাকবে না।

ক

২৩. কেরায়াত

নামাযে কুরআন পাক তেলাওয়াত করাকে কেরায়াত বলে। নামাযে একটি বড়ো আয়াত অথবা তিনটি ছোটো আয়াতের পরিমাণ কেরায়াত ফরয। কেরায়াত নামাযের রুকনগুলোর মধ্যে একটি। এছাড়া নামায হয় না।

২৪. কুরবানী

ঈদুল আযহার দিনগুলোতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পশু যবেহ করাকে 'কুরবানী' বলে। এ হচ্ছে একথারই অংগীকার যে প্রয়োজন হলে আল্লাহর পথে নিজের রক্ত দিতে বান্দাহ কুন্ঠিত হবে না।

২৫. কা'দায়ে উলা

চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় রাক্'আতের পর 'আত্তাহিয়্যাত' পড়ার জন্যে বসাকে 'কা'দায়ে উলা' বলে।

২৬. কা'দায়ে আখিরা

প্রত্যেক নামাযের শেষ রাক্'আতে 'আত্তাহিয়্যাত' পড়ার জন্যে বসাকে 'কা'দায়ে আখিরা' বলে। দু'রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাক্'আতের, তিন রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাক্'আতের এবং চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের চতুর্থ রাক্'আতের বৈঠককে 'কা'দায়ে আখিরা' বলা হবে। প্রত্যেক নামাযে 'কা'দায়ে আখিরা' ফরয।

২৭. কাওমা

রুকু থেকে উঠার পর নিশ্চিন্ত মনে সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে বলে কাওমা। এটা নামাযের ওয়াজেবগুলোর একটি।

২৮. কেসারে মুফাস্‌সাল

সূরা الزلزال থেকে সূরা الناس পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'কেসারে মুফাস্‌সাল' বলে। মাগরেবের নামাযে এ সূরাগুলো পড়া মসনূন।

২৯. কুনুতে নাযেলা

কুনুতে নাযেলা বলতে ঐ দোয়া বুঝায় যা দুশমনের ধ্বংসকারিতা থেকে বাঁচতে, তার শক্তি চূর্ণ করতে এবং তার ধ্বংসের জন্যে নবী (সঃ) পড়েছেন। নবীর পর সাহাবীগণও তা পড়ার ব্যবস্থা করেছেন।

খ

৩০. খসূফ

চাঁদে গ্রহণ লাগাকে বলে 'খসূফ'। কুরআনে আছে وخسف القمر অর্থাৎ "চাঁদে গ্রহণ লাগবে এবং তা আলোহীন হয়ে যাবে।" খসূফের সময় যে দু'রাক্'আত নামায পড়া হয় তাকে সালাতুল খসূফ বা খসূফের নামায বলে।

গ

৩১. গায়ের দমুবী জানোয়ার

যে সব প্রাণীর মোটেই রক্ত নেই অথবা থাকলেও তা চলাচল করে না, যেমন মশা, মাছি, বোলতা, বিচ্ছু প্রভৃতি তাদেরকে গায়ের দমুবী বলে।

৩২. গোসল

শরীয়ত অনুযায়ী গোটা শরীর ধুয়ে তাকে নাজাসাতে হাকীকি ও হুকমী থেকে পাক করাকে গোসল বলে।

ছ

৩৩. ছায়া আসলী

দুপুর বেলা প্রত্যেক বস্তুর যে ছায়া থাকে তাকে ছায়া আসলী বলে।

৩৪. ছায়া এক মিসাল

ছায়া আসলী বাদে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমান হলে তাকে 'ছায়া এক মিসাল' বলে।

৩৫. ছায়া দু'মিসাল

ছায়া আসলী বাদে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলে তাকে 'ছায়া দু'মিসাল' বলে।

জ

৩৬. জালসা

দু' সিজদার মাঝখানে বৈঠককে ফেকাহর পরিভাষায় জালসা বলে, নামাযের ওয়াজেবগুলোর মধ্যে এ একটি।

৩৭. জামায়াতে সানী

মসজিদে নিয়মিত জামায়াত হওয়ার পর যারা এ জামায়াতে শরীক হতে পারেনি, তারা যদি পুনরায় জামায়াত করে তাকে 'জামায়াতে সানী' বলা হয়। কোন অবস্থায় এ জামায়াতে সানী জায়েয এবং কোন অবস্থায় মাকরূহ।

৩৮. জমা' বায়নাস সালাতাইন

দু' ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে একত্রে পড়াকে 'জমা' বায়নাস সালাতাইন' বলে। যেমন যোহর এবং আসরের নামায যোহরের ওয়াক্তে পড়া। হজ্জের সময় আরফাতে ৯ই যুল হজ্জের যোহরের সময়ে যোহর এবং আসরের নামায একত্রে পড়া হয়। তারপর মুযদালফায় পৌঁছে এশার ওয়াক্তে মাগরেব এবং এশা একসাথে পড়া হয়। হজ্জে তো 'জমা'

বায়নাস সালাতাইন' করাই হয়ে থাকে, কিছু লোকের মতে সফরেও তা জায়েয।

৩৯. জময়ে' সূরী

এর অর্থ এই যে, এক নামাযকে বিলম্বিত করে এমন সময় পড়া যখন তার সময় শেষ হতে থাকে এবং দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামায ওয়াক্ত শুরু হতেই পড়া। এভাবে দৃশ্যত তো এটাই মনে হবে যে, দু'নামায একই সাথে পড়া হলেও প্রকৃতপক্ষে উভয় নামায আপন আপন ওয়াক্তে পড়া হলো। হানাফীদের মতে হজ্জের সময় ব্যতীত অন্যান্য সফরে শুধু 'জময়ে' সূরী' জায়েয, জময়ে হাকীকি জায়েয নয়।

৪০. জময়ে হাকীকি

এর অর্থ হলো কোন এক নামাযের ওয়াক্তে দু'ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়া। যেমন যোহরের ওয়াক্তে যোহর এবং আসর এক সাথে পড়া।

৪১. জময়ে' তাকদীম

এর অর্থ হচ্ছে দ্বিতীয় নামাযকে ওয়াক্তের পূর্বেই প্রথম নামাযের ওয়াক্তে এক সাথে পড়া। যেমন আসরের নামায তার সময় হওয়ার পূর্বে যোহরের ওয়াক্তে যোহরের নামাযের সাথে পড়া। যেমন হজ্জের সময় আরাফাতে পড়া হয়।

৪২. জময়ে' তা'খীর

এর অর্থ হলো, এক ওয়াক্তের নামায বিলম্বিত করে দ্বিতীয় নামাযের ওয়াক্তে দ্বিতীয় নামাযের সাথে পড়া। যেমন মাগরেবের নামায মাগরেবের ওয়াক্তে না পড়ে তা বিলম্বিত করে এশার ওয়াক্তে এশার নামযের সাথে পড়া। যেমন মুযদালফায় পড়া হয়।

৪৩. জানাবাত

জানাবাতের আভিধানিক অর্থ দূরে থাকা। ফেকাহর পরিভাষায় তাকে নাপাকির ঐ অবস্থা বুঝায় যাতে পুরুষ বা নারীর জন্যে গোসল ফরয হয়। আর এ গোসলের প্রয়োজন হয় যৌনকার্য সম্পন্ন করার পর অথবা অন্য উপায়ে বীর্যপাত করলে বা হলে। এমন অবস্থায় যেহেতু মানুষকে তাহারাত এবং নামায থেকে দূরে থাকতে হয়, সে জন্যে তাকে 'জানাবাত' বলা হয়।

৪৪. জেহ্‌রী নামায

অর্থাৎ এমন নামায যাতে ইমামের জন্যে উচ্চ শব্দে কেরায়াত করা ওয়াজেব হয়। যেমন মাগরেব এবং এশার প্রথম দু রাক্‌য়াত, ফজর, জুমা এবং দু' ঈদের নামায জেহ্‌রী। এ নামাযগুলোতে উচ্চ শব্দে কেরায়াত করা ইমামের জন্যে ওয়াজেব।

ত

৪৫. তাহমীদ

রুকু থেকে উঠার পর 'কাওমা'র অবস্থায় رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ পড়া।

৪৬. তাহিয়্যাতুল মসজিদ

তাহিয়্যাতুল মসজিদ এমন নামাযকে বলে যা মসজিদে প্রবেশকারীদের জন্যে পড়া মসনূন। তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক্‌য়াতও পড়া যায় এবং তার বেশীও। যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করার পর কোন ফরয ওয়াজেব অথবা সুন্নাত নামায পড়ে তাহলে তা তাহিয়্যাতুল মসজিদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

৪৭. তাসবীহ

নামাযে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' অথবা 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়া।

৪৮. তাসমী

রুকু থেকে উঠার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ পড়া।

৪৯.তাসমিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া।

৫০. তাশাহহুদ

বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া। তার শেষে যেহেতু তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য দেয়া হয় সে জন্যে একে 'তাশাহহুদ' বলে।

৫১.তায়াউয

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পড়া।

৫২. তা'দীলে আরকান

রুকু সিজদা প্রভৃতি নিশ্চিত মনে করা এবং 'কাওমা', 'জালসা' প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পালন করা।

৫৩. তা'যিয়াত

মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়া, শোক প্রকাশ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্যে দোয়া করাকে 'তা'যিয়াত' বলে।

৫৪. তাকবীরে তাহ্‌রীমা

নামায শুরু করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা। একে 'তাকবীরে তাহরীমা' এ জন্যে বলা হয় যে, তারপর নামায শুরু হয় এবং নামায অবস্থায় কথাবার্তা, খানাপিনা প্রভৃতি সবই হারাম হয়ে যায়।

৫৫. তাকবীর

'আল্লাহু আকবার' বলা। সাধারণতঃ একামাতকেও তাকবীর বলা হয়।

৫৬. তাকবীরে তাশরীক

যুলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের ফজরের পর থেকে ১৩ই যুলহজ্জের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার উচ্চস্বরে যে তাকবীর বলা হয় তাকে তাকবীরে তাশরীক বলে। তা হলো-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

৫৭.তাহ্‌লীল

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ পড়াকে তাহ্‌লীল বলে।

৫৮. তাহাজ্জুদ

তাহাজ্জুদের অর্থ ঘুম থেকে উঠা, রাতে কিছু সময় ঘুমাবার পর উঠে যে নামায পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদ নামায বলে। তাহাজ্জুদের মসনূন তরীকা এই যে, মানুষ অর্ধেক রাত পর ঘুম থেকে উঠে নামায পড়বে।

৫৯. তায়াম্মুম

অভিধানে তায়াম্মুমের অর্থ হলো সংকল্প ও ইচ্ছা করা এবং ফেকাহর পরিভাষায় তায়াম্মুমের অর্থ হলো পানির অভাবে পাক মাটি প্রভৃতি দিয়ে নাজাসাতে হুকমী থেকে তাহারাত লাভ করা। অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায় এবং গোসলের পরিবর্তেও।

৬০. তায়ামন

প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা। যেমন ডান হাত থেকে অযু শুরু করা, ডান পায়ে প্রথমে জুতা পরা ইত্যাদি।

৬১. তোওয়ালে মুফাস্‌সাল

সূরায়ে الحجرات থেকে সূরায়ে البروج পর্যন্ত সূরাগুলোকে তোওয়ালে মুফাস্‌সাল বলে। ফজর এবং যোহর নামাযে এগুলো পড়া মসনূন।

৬২. তাহারাত

তাহারাত নাজাসাতের বিপরীত। তাহারাত অর্থ শরীরের নাসাজাতে হাকীকি ও হুকমী থেকে শরীয়ত অনুযায়ী পাক হওয়া।

৬৩. তোহর

দু'হায়েযের মধ্যবর্তী পাক অবস্থাকে তোহর বলে।

৬৪. দাবাগাত

কাঁচা চামড়া পাকা করে তার আর্দ্রতা ও দুর্গন্ধ দূর করাকে দাবাগাত করা বলে। দাবাগাতের দ্বারা প্রত্যেক হালাল ও হারাম পশুর চামড়া পাক হয়। কিন্তু শুকরের চামড়া কিছুতেই পাক হয় না।

৬৫. দামুবী প্রাণী

যার মধ্যে রক্ত চলাচল করে।

৬৬. দিরহাম

দিরহামের ওজন তিন মাসা এক রতি। প্রায় এক টাকার সমান।

৬৭. দু'মিসাল

বেলা পড়ার সময় প্রত্যেক বস্তুর যে আসল ছায়া হয় তা বাদে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলে তাকে 'দু'মিসাল' বলে।

ন

৬৮. নাজাসাতে হাকীকি

নাজাসাতে হাকীকি বলতে ঐ সব মল বুঝায় যার থেকে মানুষের স্বাভাবিক ঘৃণার উদ্রেক হয়, তার থেকে নিজের শরীর, কাপড়-চোপর

ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাঁচিয়ে রাখা এবং শরীয়ত তার থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়।

৬৯. নাজাসাতে হুকমী

নাপাক হওয়ার এমন অবস্থা যা দেখা যায় না, বরং শরীয়তের মাধ্যমে জানা যায় তাকে নাজাসাতে হুকমী বলে, যেমন অযু না থাকা গোসলের প্রয়োজন হওয়া। একে হাদাসও বলে।

৭০. নাজাসাতে খফীফা

ঐসব অনুভূত মলিনতাকে নাজাসাতে খফীফা বলে, যার মলিনতা কিছুটা লঘু এবং শরীয়তের কোন কোন দলীল প্রমাণ অনুযায়ী তা পাক হওয়ারও সন্দেহ হয়। এ জন্যে শরীয়তে তার হুকুমও কিছুটা লঘু। যেমন হারাম পাখীর মল।

৭১. নাজাসাতে গালীযা

যার মল হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না তাকে নাজাসাতে গালীযা বলে। মানুষও স্বাভাবিকভাবে তাকে ঘৃণা করে এবং শরীয়তেও তার নাপাক হওয়ার প্রমাণ আছে। যেমন, শুকর এবং তার প্রত্যেকটি বস্তু, মানুষের পেশাব পায়খানা প্রভৃতি।

৭২. নফল

এমন কাজ যা নবী (সঃ) মাঝে মধ্যে করেছেন এবং অধিকাংশ সময় করেননি তাকে নফল বলে। নফলকে মন্দুব, মুস্তাহাব এবং তাতাবো'ও বলে

৭৩. নেফাস

বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর নারীর বিশেষ অংগ থেকে যে রক্ত বের হয় তাকে নেফাস বলে। এ রক্ত বেরুবার মুদ্দৎ বেশী পক্ষে ৪০ দিন এবং কমের কোন নির্দিষ্ট মুদ্দৎ নেই।

৭৪. নামাযে চাশত

সূর্য ভালোভাবে উঠার পর থেকে দুপুর পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয় তাকে চাশতের নামায বলে। এ নামায মুস্তাহাব। এ চার রাক্‌য়াতও পড়া যায় অথবা তার বেশী।

৭৫. নামাযে কসর

নামাযে কসর বলতে সফর কালীন সংক্ষিপ্ত নামায বুঝায়। শরীয়ত মুসাফিরকে এতখানি সুবিধা দান করেছে যে, সে যোহর, আসর এবং এশার নামায চার রাক্আতের পরিবর্তে দু'রাক্আত করে পড়তে পারবে। ফজর ও মাগরেবের কসর নেই।

ফ

৭৬. ফরয

এমন কাজ যা করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য এবং তা অস্বীকারকারী কাফের। যে ব্যক্তি বিনা ওযরে ফরয ত্যাগ করবে সে ফাসেক ও শাস্তিরযোগ্য। ফরয দু'প্রকার। ফরযে আইন, ফরযে কেফায়া।

৭৭. ফরযে আইন

যা করা প্রত্যেক মুসলমানের একেবারে অপরিহার্য, না করলে কঠিন গুনাহগার এবং শাস্তির যোগ্য। যেমন নামায, রোযা প্রভৃতি।

৭৮. ফরযে কেফায়া

যা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জন্যে অপরিহার্য নয়, সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানের ফরয, যাতে করে কিছু লোক আদায় করলে সকলের জন্যে হয়ে যায়, আর কেউই আদায় না করলে সকলে গুনাহগার হবে। যেমন জানাযার নামায, মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন করা ইত্যাদি।

৭৯. ফেকহ্

ফেকহ্ শব্দের অর্থ বুদ্ধি বিবেচনা, ধী'শক্তি, উপলব্ধি, পরিভাষায় ফেকাহ্র অর্থ শরয়ী আহকাম। যা কুরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞান ও পারদর্শিতা সম্পন্ন আলেমগণ কুরআন সুন্নাহ থেকে যুক্তি প্রমাণসহ বের করেছেন।

৮০. ফিদিয়া

ফিদিয়ার অর্থ হলো এমন সদকা যা কাযা করা নামাযের পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় করা হয়। এক ওয়াক্তের নামাযের ফিদিয়া সোয়া সের গম অথবা আড়াই সের যব। তার মূল্যও দেয়া যায়।

ম

৮১. মায়ে জারী

প্রবহমান পানিকে 'মায়ে জারী' বলে। যেমন–নদী, সমুদ্র, পাহাড়ী ঝর্ণা, নালা প্রভৃতির পানি। 'মায়ে জারী' পাক। তার দ্বারা 'তাহারাত' লাভ করা যায়। তবে যদি তাতে এত পরিমাণ মলমিশ্রিত হয় যে, তার রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তার দ্বারা তাহারাত হবে না।

৮২. মায়ে রাকেদ কালীল

রাকেদ অর্থ স্থির। 'মায়ে রাকেদ কালীল' অর্থ এমন স্থির বা আবদ্ধ পানি যা পরিমাণে এতো অল্প যে তার একধারে কোন মল পড়লে অন্য ধার পর্যন্ত সমস্ত পানির রং গন্ধ এবং স্বাদ বদলে যায়।

৮৩. মায়ে রাকেদ কাসীর

এমন আবদ্ধ পানি যা পরিমাণে এতো বেশী যে তার একধারে কোন মল পড়লে অন্যধারে কোন পরিবর্তন আসে না। অর্থাৎ পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদ বদলায় না।

৮৪. মায়ে তাহের মুতাহ্হের

যে পানি স্বয়ং পাক এবং অন্য জিনিসও পাক করতে পারে এবং যার দ্বারা অযু, গোসল দুরস্ত হয় তাকে 'মায়ে তাহের মুতাহ্হের' বলে।

৮৫. মায়ে মুস্তা'মাল

এমন পানি যার দ্বারা কেউ অযু করেছে, হাদাসে আসগার থেকে পাক হওয়ার জন্যে অথবা সওয়াবের নিয়তে করেছে, অথবা যার গোসল ফরয এমন ব্যক্তি গোসল করেছে তবে তার শরীরে কোন নাজাসাত লেগে ছিল না। এমন পানি স্বয়ং পাক কিন্তু তার দ্বারা অযু গোসল দুরস্ত হবে না।

৮৬. মায়ে মশকুক

মায়ে মশকুক (সন্দেহযুক্ত) এমন পানি যা পাক কিন্তু তার দ্বারা পাক হওয়া না হওয়া নিয়ে সন্দেহ আছে। যেমন গাধা বা খচ্চরের ঝুটা পানি। এ পানির হুকুম এই যে, তার দ্বারা অযু করে আবার তায়াম্মুমও করতে হবে।

৮৭. মায়ে নাজাস (নাপাক পানি)

এমন পানি যার দ্বারা তাহারাত হবে না এবং তা কাপড় অথবা শরীরে লাগলে তাও নাপাক হবে।

৮৮. মুবাহ্

প্রত্যেক জায়েয কাজ যা করলে সওয়াব নেই, না করলে গুনাহ নেই।

৮৯. মুবাশেরাত

যৌন সম্ভোগ করাকে মুবাশেরাত বলে।

৯০. মুদরেক

যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে জামায়াতে শামিল থাকে তাকে মুদরেক বলে।

৯১. মুযী

যৌন কার্যের চরম মুহূর্তে বীর্যপাতের পূর্বে যে শ্বেত তরল পদার্থ নির্গত হয় তাকে মুযী বলে।

৯২. মুরতাদ

মুরতাদ এমন ব্যক্তিকে বলে যে, ইসলামের প্রতি ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

৯৩. মুসাফির

শরীয়তের পরিভাষায় মুসাফির এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অন্ততঃপক্ষে ৩৬ মাইল* দূরত্ব পর্যন্ত ভ্রমণ করার জন্যে আপন বস্তি থেকে বের হয়। এমন ব্যক্তি সফরে কসর নামায পড়বে।

৯৪. মসবুক

মসবুক এমন মুক্তাদীকে বলা হয়, যে কিছু বিলম্বে জামায়াতে শরীক হয় যখন এক বা দু'রাকয়াত হয়ে গেছে।

৯৫. মুস্তাহাব

মুস্তাহাব এমন আমলকে বলা হয় যা নবী (সঃ) মাঝে মাঝে করেছেন এবং অধিকাংশ সময়ে করেননি। এ আমলে অনেক সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই।

---

* কতিপয় হানাফী আলেমের মতে এ দূরত্ব ৪৮ মাইল।

৯৬. মুসেহ

মুসেহ করার অর্থ হলো ভিজা হাত বুলানো। মাথা মুসেহ করা হোক অথবা মুজার ওপর, অব্যবহৃত পানি দিয়েই তা করতে হবে।

৯৭. মুক্তাদী

ইমামের পেছনে নামায পাঠকারীকে মুক্তাদী বলে।

৯৮. মুকাব্বের

একামাত এবং তাকবীর দানকারীকে মুকাব্বের বলে। বড়ো জামায়াত হলে যে ব্যক্তি ইমামের তাকবীর পুনরাবৃত্তি করে সকল মুক্তাদী পর্যন্ত সে আওয়াজ পৌছে দেয় তাকেও মুকাব্বের বলে

৯৯. মাকরুহ তাহরীমি

এমন প্রত্যেক কাজ যার থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ওয়াজেব। যে ব্যক্তি সত্যিকার ওযর ব্যতীত তা করে সে কঠিন গুনাহগার হয়ে পড়ে। অবশ্য অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না।

১০০. মাকরুহ তানযীহি

এমন কাজ যা থেকে দূরে থাকলে সওয়াব পাওয়া যাবে, করলে গুনাহগার হবে না।

১০১. মনি

এমন পদার্থ যা বের হলে যৌন বাসনা পরিপূর্ণ হয় এবং উত্তেজনা শিথিল হয়।

র

১০২. রুকন

রুকন কোন জিনিসের এমন অংশকে বলা হয় যার উপরে তার প্রতিষ্ঠিত থাকা না থাকা নির্ভর করে। রুকনের বহু বচন আরকান। যেমন নামাযের আরকানের অর্থ কেয়াম, কেরায়াত, রুকু, সিজদা, কাওমা এবং কা'দায়ে আখিরা এ সব নামাযের এমন অংশ যার উপর নামাযের অস্তিত্ব নির্ভর করে। ইসলামের আরকান-আকীদাহ, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ। এ সবের উপরেই ইসলামের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। এসব না হলে এ প্রাসাদ কায়েম থাকতে পারবে না।

ল

১০৩. লাহেক

লাহেক এমন মুক্তাদীকে বলে-যে শুরু থেকে জামায়াতে শামিল থাকে কিন্তু তারপর তার এক অথবা একাধিক রাক্‌য়াত নষ্ট হয়।

স

১০৪. সুত্‌রা

নামাযী যদি এমন স্থানে নামায পড়ে যে, তার সামনে দিয়ে লোক চলা-চল করে, তাহলে তার সামনে আড়াল করার জন্যে কোন উঁচু জিনিস খাড়া করাকে পরিভাষা হিসাবে সুত্‌রা বলে।

১০৫. সতরে আওরত

আওরত বলতে শরীরের ঐ অংশ বুঝায় যা প্রকাশ করা শরীয়তের দিক দিয়ে হারাম। পুরুষের জন্যে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা ফরয, মেয়েদের জন্যে মুখ, হাত এবং পা ছাড়া সমস্ত শরীর আবৃত রাখা ফরয। সতরে আওরতের অর্থ এসব অংশ ঢাকা, যা ফরয।

১০৬. সিজদায়ে সহু

সহু অর্থ ভুলে যাওয়া। নামাযের মধ্যে ভুলবশতঃ যে কম বেশী হয় তাতে যে নামাযের অনিষ্ট হয় তা পূরণের জন্যে নামাযের শেষে দুটি সিজদা করা ওয়াজেব হয়ে যায়। তাকে সহু সিজদা বলে।

১০৭. সেররী নামায

যে সব নামাযে ইমামের চুপে চুপে কেরায়াত করা ওয়াজেব তাকে বলে সেররী নামায। যেমন যোহর ও আসরের নামায।

১০৮. সুন্নাত

সুন্নাত ঐসব কাজ যা নবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) করেছেন। তা দু প্রকার-সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ।

১০৯. সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

ঐসব কাজ যা নবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) হামেশা করেছেন এবং ওযর ব্যতীত কখনো ত্যাগ করেননি। অবশ্যি যারা করেনি

তাদেরকে সতর্ক করে দেননি। তবে যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তা পরিত্যাগ করে এবং ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস করে সে ফাসেক এবং গুনাহগার। নবী (সঃ)–এর শাফায়াত থেকে সে বঞ্চিত হবে। অবশ্যি ঘটনাক্রমে কোনটা বাদ গেলে সে অন্য কথা।

১১০. সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ

যে কাজ নবী (সঃ) অথবা সাহাবীগণ করেছেন এবং বিনা ওযরে কখনো আবার ছেড়েও দিয়েছেন। এ কাজ করলে খুব সওয়াব না করলে গুনাহ নেই।

১১১. সাহেবে তরতীব

যে মুমেন বান্দার কখনো নামায কাযা হয়নি অথচ এক, দুই অথবা দিন রাতের পাঁচ ওয়াক্ত কাযা হয়েছে, ক্রমাগত হোক কিংবা বিভিন্ন সময়ে হোক অথবা পূর্বে কাযা হয়ে থাকলে তা পড়ে ফেলেছেন এবং তার ঘাড়ে এক দু'কিংবা পাঁচ নামাযের কাযা আছে–এমন ব্যক্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় সাহেবে তরতীব বলে।

১১২. সদ্‌কায়ে ফেতর

সদ্‌কায়ে ফেতর ঐ সদকাকে বলে যা প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তি ঈদুল ফেতরের নামাযের পূর্বে হকদারকে দিয়ে দেয়। এ দিয়ে দেয়া প্রত্যেক এমন মুসলমানের ওয়াজেব যার এতটা সম্পদ থাকে যা তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তার উপর যাকাত ওয়াজেব হোক বা না হোক। তারপর এ শর্তের দরকার নেই যে, সে মাল এক বৎসর স্থায়ী হতে হবে। প্রত্যেক নাবালেগের পক্ষ থেকেও দেয়া ওয়াজেব। এমন কি পাগল যদি মালদার হয় তার পক্ষ থেকেও দেয়া ওয়াজেব।

كتاب العقائد

আকায়েদ অধ্যায়

আরকানে ইসলাম

যে কোন দালানকোঠা অথবা ঘরদোর হোক, তা অবশ্যই কোন ভিত্তি বা স্তম্ভের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। এ ঘরদোর ততোক্ষণ পর্যন্তই ঠিক থাকে, যতোক্ষণ তার ভিত্তি বা স্তম্ভ মজবুত থাকে। এ স্তম্ভ যদি নড়বড়ে হয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে তার উপরে যে ঘর সেটাও দুর্বল হয়ে যাবে। আর যদি সে স্তম্ভ গোড়া থেকেই নড়ে যায় অথবা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে যেতে চায়, তাহলে ঘরখানাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না এবং যে কোন সময়ে ধড়াস করে মাটিতে পড়ে যাবে। ইসলামের দৃষ্টান্ত ঠিক একটি ঘরের মত। এর পাঁচটি আরকান বা স্তম্ভ আছে। এগুলোকে ইসলামের আরকান বলে।

ইসলামী অট্টালিকা বা ঘরের এসব স্তম্ভ যতোটা মজবুত হবে ইসলামী দালানটাও ততোটা স্থায়ী হবে। যদি আল্লাহ্ না করুন এসব আরকান দুর্বল হয়, গোড়া আলগা হয়ে যায় অথবা পড়ে যাওয়ার মতন হয়, তাহলে ইসলামী দালানও ঠিক থাকতে পারবে না। ধড়াস করে এক সময় যমীনের উপরে পড়ে যাবে।

এখন ইসলাম যদি আমাদের কাছে প্রিয় হয় এবং যদি আমরা এ ঘরের ছায়ায় থেকে নিশ্চিন্ত মনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এক আল্লাহ্র বন্দেগী করতে চাই এবং সেই সাথে এ মহৎ আকাংখাও পোষণ করি যে, আল্লাহ্র সকল বান্দা এ দালান ঘরে আশ্রয় নিয়ে কুফর ও শির্কের বিপদ থেকে দূরে থাক, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাহ হিসাবে জীবনযাপন করুক এবং দ্বীন ও দুনিয়ায় সাফল্য লাভ করুক, তাহলে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে আরকানে ইসলামের মর্মকথা ভালভাবে জানতে হবে এবং তার স্থায়িত্ব ও মজবুতির পুরোপুরি ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কোন অবস্থাতেই তাকে দুর্বল হতে দেয়া যাবে না। তার কারণ এই যে, ইসলামের এ বিরাট দালান ঘর তার অসংখ্য বরকতসহ তখনই কায়েম থাকতে পারে যখন তার এসব স্তম্ভ মজবুত হয়ে বিদ্যমান থাকবে।

ইসলামের আরকান পাঁচটি ঃ

১. কালেমায়ে তাইয়েবাহ। অর্থাৎ কুফর ও শির্কের ধারণা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী আকায়েদের উপর ঈমান আনা।

২. নামায কায়েম করা।

৩. যাকাত দেয়া।

৪. রমযানের রোযা রাখা।

৫. বায়তুল্লাহর হজ্জ করা।

নবী (সঃ) বলেন ঃ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর।

شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ –

এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্র রসূল।

وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ

এবং নামায কায়েম করা

وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ

এবং যাকাত দেয়া

وَصَوْمِ رَمَضَانَ

এবং রমযানের রোযা রাখা।

وَحَجِّ الْبَيْتِ

এবং আল্লাহ্র ঘরের যিয়ারত করা বা হজ্জ করা।

ইসলামী ধারণা—বিশ্বাস ও চিন্তাধারা

নেক আমলের বুনিয়াদ

ইসলামে যাবতীয় এবাদত ও নেক আমলের বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে কোন এবাদত নির্ভরযোগ্য নয়–কোন নেকী কবুল হবার নয় এবং নাজাতও সম্ভব নয়। যে কোন আমল দেখতে যতোই নেক মনে হোক না কেন, ঈমান যদি তার বুনিয়াদ না হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তার কোনই মর্যাদা হবে না, কুরআন সেই আমলকে নেক আমল বলে, যার প্রেরণার উৎস ঈমান।

আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে, তা সে পুরুষ হোক অথবা নারী, সে যদি মুমেন হয়, তাহলে তার জন্যে আমি পূতপবিত্র জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দেব।–(সূরা আন–নমল ঃ ৯৭)

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

(হে রসূল!) তাদেরকে বলুন, তোমাদের কি বলে দেব কারা তাদের আমলের দিকদিয়ে সবচেয়ে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ মনোরথ? তারা সেসব লোক যাদের সকল চেষ্টা–চরিত্র দুনিয়ার জীবনে গোমরাহীর মধ্যে ব্যয়িত হয়। অথচ তারা মনে করে যে, তারা নেক আমলই করছে। তারা ওসব লোক যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্‌র নিকটে হাযির হওয়ার ব্যাপার বিশ্বাস করেনি। সে জন্যে তাদের সব আমল ব্যর্থ হয়েছে। কিয়ামতের দিনে সে সবের কোনই মূল্য হবে না। (সূরা আল–কাহাফ ঃ ১০৩–১০৫)

ঈমান বলতে কি বুঝায়?

কালেমায়ে তাইয়েবা এবং কালেমায়ে শাহাদাতের মর্ম অন্তর দিয়ে মেনে নিয়ে মুখে উচ্চারণ করাকেই বলে ঈমান।

কালেমায়ে তাইয়েবাহ ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রসূল।

কালেমায়ে শাহাদাত ঃ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ –

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ এবং রসূল।

কালেমায়ে তাইয়েবাহ এবং কালেমায়ে শাহাদাতের উপর ঈমান আনার পর যে সব বিষয়ের মোটামুটি স্বীকৃতি দিতে হয় তাকে বলা হয় ইসলামী আকায়েদ।

ইসলামী আকায়েদ ছয়টিঃ

১. আল্লাহ্র ব্যক্তিসত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান।

২. ফেরেশতাদের উপর ঈমান।

৩. রসূলগণের প্রতি ঈমান (খতমে নবুয়তের প্রতি ঈমানসহ)।

৪. আসমানী কেতাবসমূহের উপর ঈমান

৫. আখেরাতের উপর ঈমান।

৬. তকদীরের উপর ঈমান।

এ ছ'টি আকীদা প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ছ'টি অংশ। এ সবের মধ্যে পারস্পরিক গভীর ও অনিবার্য সম্পর্ক আছে। এ সবের কোন একটিকে মেনে নিলে অন্যসব কয়টিকেই মেনে নিতে হয় এবং কোন একটিকে অস্বীকার করলে সবগুলোকেই অস্বীকার করা হয়। ঈমানের প্রকৃত অর্থ এই যে, এ সবগুলোকে অন্তর দিয়ে মেনে নেয়া। কেউ যদি এ সবের মধ্যে কোন একটি মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কিছুতেই মুমেন বলা যাবে না। ঠিক তেমনি সেও মুমেন নয় যে ইসলামের এ ছ'টি আকীদার অতিরিক্ত কোন নতুন আকীদা নিজের পক্ষ থেকে ঈমানের অংশ বলে মনে করে এবং ঈমানের জন্যে তা প্রয়োজনীয় মনে করে।

আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান

১. এই যে বিরাট বিশাল প্রকৃতি জগত, তার মধ্যে অসংখ্য সৌর জগত আছে। এ ধরনের আরো বহু জগত আছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনাও আছে। এসব কত বিরাট বিশাল তা আমাদের কল্পনার

অতীত। এসব সৃষ্টি হঠাৎ করে ঘটনাক্রমে অস্তিত্ব লাভ করেনি। বহু বছর যাবত বস্তুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলও এসব সৃষ্টি নয়। বরঞ্চ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর আপন ইচ্ছায় ও নির্দেশে বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে এসব সৃষ্টি করেছেন। তিনি এসবের প্রকৃত মালিক। তিনি তাঁর অসীম কুদরতে এসব কায়েম রেখেছেন এবং যতো দিন ইচ্ছা কায়েম রাখবেন।

২. প্রকৃতি রাজ্যের প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা। এমন কোন কিছু নেই যা তাঁর দ্বারা সৃষ্টি না হয়ে আপনা আপনিই অস্তিত্বে এসেছে। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব তাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনিই সকলের প্রতিপালক। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষা করেন এবং যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করেন।

৩. তিনি অনাদি কাল থেকে আছেন এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকবেন। তিনি চির জীবিত ও চির শাশ্বত। তাঁর ধ্বংস নেই।

৪. তিনি এক ও একক। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সর্বশক্তিমান। কেউ তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে না। তাঁর পিতা-মাতাও নেই, সন্তান-সন্তুতিও নেই। স্ত্রী, পুত্র-পরিজন, ভাই, বেরাদার, জ্ঞাতি, গোষ্ঠী কিছুই নেই।

৫. তিনি সকল বিষয়ে লা-শরীক। তাঁর সত্তায় ও গুণাবলীতে অধিকার ও এখতিয়ারে কোনই শরীক বা অংশীদার নেই। তিনি আপনা আপনি অস্তিত্ববান। তাঁর অধিকার ও এখতিয়ারে, সত্তা ও গুণাবলীতে কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী তাঁকে হতে হয় না।

৬. কোন কিছুই তাঁর সাধ্যের অতীত নয়। এমন কোন বিষয়ের কল্পনা করা যেতে পারে না যা করতে তিনি অক্ষম। সকল প্রকারের বাধ্যবাধকতা, অক্ষমতা ও দোষ-ত্রুটির উর্ধে তিনি। তিনি সকল মঙ্গলের উৎস। যতো পবিত্র নাম ও উৎকৃষ্ট গুণাবলী তা সবই তাঁর জন্যে। নিদ্রা অথবা তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি পাক পবিত্র এবং সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধে।

৭. তিনি সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির একমাত্র বাদশাহ বা শাসক। সকল কর্তৃত্বের উৎস তিনি। বিশ্ব প্রকৃতিতে একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব চলছে। তাঁর কর্তৃত্ব ও প্রভূত্ব প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি ব্যতীত কর্তৃত্ব প্রভূত্ব আর কারো হতে পারে না। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করারও কেউ নেই।

৮. তিনিই সকল শক্তির আসল উৎস ও কেন্দ্র। অন্য সকল শক্তি তাঁর কাছে নগণ্য। বিশ্ব প্রকৃতিতে এমন কিছু নেই যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ করতে পারে অথবা তার ইচ্ছার বিরদ্ধে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে তা সে মানুষ হোক, ফেরেশতা অথবা জ্বিন হোক অথবা অন্য কোন শক্তিশালী সৃষ্টি হোক। প্রকৃতি রাজ্যের কোন বৃহত্তম গ্রহ অথবা দৃশ্য অদৃশ্য কোন শক্তি (Energy) তারা যতো বড়ো ও শক্তিশালী হোক–তারা আল্লাহ্র অসীম কুদরত ও ক্ষমতার কাছে কিছুমাত্র নয়।

৯. তিনি সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। তিনি সর্বদ্রষ্টা। প্রত্যেকটি বস্তু তিনি দেখতে পান–তা সে ভূগর্ভে হোক অথবা অসীম আকাশের কোন স্থানে হোক। তিনি ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত। মানুষের মনের কথা তার অন্তরের অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত ভাবধারা ও আবেগ অনুভূতি এবং সকল প্রকার গোপন রহস্য তাঁর পুরোপুরি জানা। তিনি মানুষের কাঁধের শিরা-উপশিরা থেকেও নিকটে অবস্থান করেন। তিনি পূর্বাপর সকল বিষয়ের সুনিশ্চিত জ্ঞান রাখেন। গাছ থেকে এমন কোন পাতা পড়ে না যা তাঁর জ্ঞানের বাইরে অথবা ভূখণ্ডে লুক্কায়িত এমন শস্যবীজ নেই যা তাঁর জানা নেই।

১০. জীবন মৃত্যু তাঁর হাতে। যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন ও মৃত্যু দান করেন। যাকে তিনি মারতে চান তাকে রক্ষা করার কেউ নেই এবং যাকে তিনি জীবিত রাখতে চান তাকে কেউ মারতে পারে না।

১১. সকল সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। এ সম্পদ থেকে যাকে তিনি বঞ্চিত করতে চান তাকে কেউ কিছু দিতে পারে না। যাকে তিনি দিতে চান, কেউ তা ঠেকাতে পারে না। কাউকে সন্তান দান করা না করা সম্পূর্ণ তার এখতিয়ারে। যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা তাকে কন্যা অথবা যাকে ইচ্ছা তাকে উভয়ই দেন। আবার যাকে ইচ্ছা তাকে উভয় থেকেই বঞ্চিত করেন। তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কারো এতটুকু ক্ষমতা নেই।

১২. লাভ-লোকসান একমাত্র তাঁর এখতিয়ারে। তিনি কাউকে ক্ষতি অথবা বিপদের সম্মুখীন করতে চাইলে কেউ তা ঠেকাতে পারে না। আর যদি তিনি কারো মংগল করতে চান, তাহলে কেউ তার কোন ক্ষতি বা অমংগল করতে পারে না। মোট কথা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ কারো কোন মংগল-অমংগল করতে পারে না।

১৩. একমাত্র তিনিই সকলের রিজিকদাতা। রিজিকের চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনিই তাঁর যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। সকল-কেই তিনি রুজি দান করেন। রুজি রোজগারের ব্যাপারে কমবেশী করাও তাঁর হাতে। যার জন্যে তিনি যতটুকু নির্ধারিত করে রেখেছেন, সে ততটুকুই ঠিক মতো পাবে। এর কমবেশী করার অধিকার কারো নেই।

১৪. তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। তিনি বিজ্ঞ ও সুস্থ বিচার সম্পন্ন। তিনি সঠিক সিদ্ধান্তকারী। তিনি কোন হকদারের হক নষ্ট করেন না এবং কারো উপর যুলুম করেন না। এ তাঁর ন্যায়-নীতির খেলাপ যে, সুকৃতিকারী এবং দুষ্কৃতিকারী তার নিকটে সমান হবে। প্রত্যেককে তার আপন আপন কৃতকর্ম অনুযায়ী তিনি প্রতিদান দেন। কোন অপরাধীকে তিনি তার অপরাধের অধিক শাস্তি দেন না এবং কোন নেক লোককে তার যথোপযুক্ত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেন না। তাঁর একটি সিদ্ধান্ত তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান সুস্থ বিচার-বুদ্ধি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

১৫. তিনি তাঁর বান্দাহকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি গুনাহ মাফ করে দেন, তওবাকারীর তওবা কবুল করেন। তিনি তাঁর বান্দাহদের উপর সর্বদা রহমত বর্ষণ করে থাকেন। তাঁর রহমত ও মাগফিরাত থেকে মুমেনদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

১৬. তিনিই একমাত্র সত্তা যাকে ভালোবাসা যেতে পারে। একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। তাঁকে ব্যতীত আর কাউকে ভালোবাসতে হলে তাঁরই জন্যে ভালোবাসতে হবে, তাঁর ভালোবাসাই সকল ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

১৭. একমাত্র তিনিই আমাদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার। সকল এবাদত দাসত্ব ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই। তিনি ব্যতীত অপর কেউ না আনুগত্য লাভের অধিকারী হতে পারে আর না তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা যেতে পারে। একমাত্র তাঁর সামনেই সবিনয়ে দাঁড়ানো যেতে পারে। তাঁকেই সিজদা করা যেতে পারে। তাঁর কাছেই সব কিছু চাওয়া যেতে পারে। তাঁর কাছেই সবিনয়ে কাকুতি মিনতি করা যেতে পারে।

১৮. এ অধিকার একমাত্র তাঁর যে, মানুষ তাঁর আনুগত্য করবে। তাঁর আইন মেনে চলবে। নিরংকুশভাবে তাঁর নির্ধারিত শরীয়তের বিধান মেনে চলবে।

হালাল হারাম নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র তাঁর। এ ব্যাপারে কারো কণামাত্রও অধিকার নেই।

১৯. একমাত্র তাঁকেই ভয় করতে হবে। তাঁর উপরেই আশা ভরসা রাখতে হবে। প্রতিটি ব্যাপারে সাহায্য তাঁর কাছেই চাইতে হবে। তাঁকেই বাসনা পূরণকারী, ত্রাণকর্তা, অভিভাবক ও সাহায্যদাতা মনে করতে হবে সকল ব্যাপারে নির্ভর তাঁর উপরেই করতে হবে।

২০. হেদায়েত তাঁর কাছেই চাইতে হবে। সুপথ দেখানো তাঁর কাজ। তিনি যাকে হেদায়েত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না।

২১. কুফর, শির্ক, নাস্তিকতা বিদআত প্রভৃতি ইহকাল ও পরকালের জন্যে ধ্বংস নিয়ে আসে। দুনিয়ার মধ্যে নিকৃষ্ট মানুষ তারাই যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাঁর দ্বীন কবুল করে না, তাঁর সাথে অন্যকে অংশীদার বানায় এবং তাঁর আনুগত্য করার পরিবর্তে আপন প্রবৃত্তির আনুগত্য করে।

২২. কুফরী অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের উপর আল্লাহ্র লানৎ, ফেরেশতাদের লানৎ এবং সমগ্র মানবজাতির লানৎ।

২৩. কুফর ও শির্কের পরিণাম আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি এবং তার ফলে চিরন্তন শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।

২৪. শির্ক সুস্পষ্ট যুলুম ও মিথ্যা। অন্যান্য সকল গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু শির্কের গুনাহ কিছুতেই মাফ করবেন না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

তাকদীরের উপর ঈমান

তাকদীরের উপর ঈমান বলতে গেলে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমানেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ জন্যে কুরআনে তার উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য হাদীসে এর গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে একে ইসলামের স্থায়ী আকীদাহ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

তাকদীরের উপর ঈমানের প্রকৃত অর্থ এই যে, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু ভালো ও মন্দ আছে অথবা ভবিষ্যতে হবে তা সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়

এবং সবই তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ভালো মন্দের কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকও তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত নয়। তাঁর জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। মানুষ দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করে ভাল কাজ করবে, না মন্দ কাজ করবে, তা তার জন্মের পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌র জানা আছে। বিশ্ব প্রকৃতির কোন অণুপরমাণু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গতিশীল ও ক্রিয়াশীল হতে পারে না, আর না কোন সূক্ষ্ম বস্তুরও কার্যক্রম বা গতিশীলতা তার জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে। আল্লাহ্ যার জন্যে যা লিখে রেখেছেন তা খণ্ডন করার এতটুকু শক্তি কারো নেই। তিনি কাউকে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করে থাকলে তা দেবার ক্ষমতাও কারো নেই। ভালো মন্দ ভাগ্য নির্ধারণ একমাত্র তাঁরই হাতে এবং মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তাঁর পূর্ব নির্ধারিত।[১]

নবী পাক (সঃ)-এর এরশাদ ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ (مسلم)

আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিজগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্‌র আরশ ছিল পানির উপর। অর্থাৎ পানি ব্যতীত কোন সৃষ্টিই তখন ছিল না। (মুসলিম)

ফেরেশতাদের উপর ঈমান

১. ফেরেশতা আল্লাহ্ তায়ালার এক অনুগত সৃষ্টি। এ নূরের পয়দা। এ আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত। তাঁরা নারীও নন, পুরুষও নন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। সে কাজই তাঁরা করে যাচ্ছেন।

---

১ আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার বুকে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে তার সীমিত পরিমণ্ডলে ভাল-মন্দ কাজ করার যে স্বাধীনতা বা এখতিয়ার দিয়েছেন, তাঁর সব কিছু জানা থাকলেও সে এখতিয়ার ক্ষুণ্ন করা হয় না। দ্বীন ইসলামের শিক্ষা এই যে, মানুষ যেন সর্বদা নেক আমল করতে থাকে এবং দ্বীনের আনুগত্যের ব্যাপারে অবহেলা না করে। তাকদীর প্রসঙ্গটি নিয়ে মাথা ঘামানো এবং তার জটিল তথ্যানুসন্ধান থেকে বিরত থাকতে হবে। শুধু এতটুকু মনে রাখতে হবে যে, নেক আমলকারী মুমেনের জন্যে আল্লাহ্ বেহেশত তৈরী করে রেখেছেন এবং দুষ্কৃতিকারীদের জন্যে জাহান্নাম। ঈমান এনে যদি আমি নেক আমল করি, তাহলে আমি বেহেশতের হকদার হবো। আর কাফের হয়ে যদি মন্দ কাজ করি তাহলে আমাকে জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে।

২. ফেরেশতাগণ আপন মর্জি মত কিছু করেন না। আল্লাহ্‌র শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রভূত্বেও তাঁদের কোন অধিকার নেই। তাঁরা আল্লাহ্‌র এখতিয়ার বিহীন প্রজা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে যে আদেশ করা হয়, তা দ্বিধাহীন চিত্তে পালন করার কাজেই তাঁরা লেগে যান। তাঁদের এমন সাধ্য নেই যে, তাঁর হুকুমের বিপরীত কিছু করেন।

৩. তাঁরা হরহামেশা আল্লাহ্‌র স্তবস্তুতি করে থাকেন। না তাঁরা আল্লাহ্‌র কোন আদেশ লংঘন করেন, আর না তাঁরা আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক স্তবস্তুতিতে ক্লান্তিবোধ করেন। দিন রাত নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাঁরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করেন।

৪. ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। আল্লাহ্‌র নাফরমানী অথবা বিদ্রোহের ধারণাও তাঁরা করতে পারেন না।

৫. যে কাজে তাঁরা নিয়োজিত তা পরিপূর্ণ দায়িত্ব সহকারে সমাধা করেন। কর্তব্যে কোন অবহেলা প্রদর্শন অথবা কাজে ফাঁকি দেয়ার কোন মনোভাব তাদের থাকে না।

৬. তাঁদের সংখ্যা কত তা আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন। তবে চারজন অতি প্রসিদ্ধ এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভকারী। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

ক. হযরত জিবরাইল (আ)। তাঁর কাজ ছিল আল্লাহ্‌র কেতাব ও পয়গাম নবীগণের নিকট পৌছানো। সে কাজ তাঁর শেষ হয়েছে। এ জন্যে যে, নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ) ছিলেন সর্বশেষ নবী।

খ. হযরত ইসরাফীল (আ)। ইনি কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে সিংগায় ফুঁক দিবেন।

গ. হযরত মিকাইল (আ)। বৃষ্টি বর্ষণ ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবের প্রতি রিজিক পৌছানোর দায়িত্ব তার উপর।

ঘ. হযরত আযরাইল (আ)। তিনি প্রতিটি সৃষ্টি জীবের জীবন গ্রহণের কাজে নিয়োজিত।

৭. দু'জন করে ফেরেশতা প্রত্যেক মানুষের সাথে থাকেন। একজন তার ভালো কাজ এবং অন্যজন তার মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁদেরকে বলা হয় 'কেরামান কাতেবীন' (সম্মানিত লেখক বৃন্দ)।

৮ দু'জন ফেরেশতা মানুষের মৃত্যুর পর তার কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাদেরকে বলা হয় 'মনকির' ও 'নাকির'।

রসূলগণের প্রতি ঈমান

১. আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর হুকুম আহকাম ও হেদায়েত পৌছাবার জন্যে যে ব্যবস্থা করেন তাকে 'রেসালাত' বলা হয়। যাঁরা মানুষের কাছে এ হেদায়েত এবং পয়গাম পৌছিয়ে দেন, তাদেরকে বলা হয় নবী, রসূল অথবা পয়গাম্বর।

২. রসূল বা নবী আল্লাহ্র বাণী মানুষের কাছে ঠিকমতো পৌছিয়ে দেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কোন খেয়ানত করেন না। না অতিরঞ্জিত করেন। না কিছু গোপন করেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি 'অহী' নাযিল হয়। তা মানুষের কাছে পৌছাবার পুরোপুরি হক তাঁরা আদায় করেন।

৩. 'রেসালাত' আল্লাহ্র দান। যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে তা দান করেন। এ মর্যাদা মানুষের কোন ইচ্ছা-অভিলাষ এবং কোন চেষ্টা-চরিত্রের ফল নয়। এ আল্লাহ্র বিশেষ দান। তিনিই জানেন এ মহান খেদমত কার কাছ থেকে নেবেন এবং কিভাবে নেবেন।

৪. 'রসূল' অবশ্যই মানুষ হয়ে থাকেন। ফেরেশতা, জ্বিন অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এ মর্যাদা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্র উপরেও তাদের কোন অধিকার অথবা প্রভাব থাকে না। তাঁদের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্ তাঁদেরকে তাঁর প্রতিনিধি এবং রেসালতের দায়িত্ব পালনের জন্যে বেছে নেন। তাঁদের কাছে তিনি তাঁর 'অহী' পাঠান।

৫. যে জীবন বিধান বা 'দ্বীন' তিনি পেশ করেন, তা তিনি স্বয়ং পুরোপুরি মেনে চলেন এবং তিনি তাঁর দাওয়াতের আদর্শ বা নমুনা হয়ে থাকেন। তাঁর এ কাজ নয় যে, তিনি অন্যকে দ্বীনের আনুগত্যের দাওয়াত দিবেন এবং স্বয়ং তা থেকে দূরে থাকবেন।

৬. প্রত্যেক যুগে নবী এসেছেন। প্রত্যেক জাতির জন্যে এসেছেন। প্রত্যেক দেশে এসেছেন। মুসলমান সব নবীর উপর ঈমান আনে। কারো নবুয়তকে অস্বীকার করে না। যেসব নবী রসূলগণের উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে আছে মুসলমান তাদের প্রতি ঈমানের স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কিন্তু যাদের উল্লেখ কুরআন হাদীসে নেই, তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে। না তাদের নবী হওয়ার কথা স্বীকার করে, আর না তাদের সম্পর্কে এমন কোন উক্তি করে যার দ্বারা তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

৭. প্রত্যেক নবীর দাওয়াত একই ছিল। তাঁদের কোন এক জনকে অস্বীকার করলে সকলকে অস্বীকার করা বুঝায়। তাঁরা সকলে একই দলভুক্ত ছিলেন এবং সকলে একই বাণী নিয়ে এসেছেন।

৮. নবীর উপর ঈমান আনার অর্থ এই যে, তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে। নবীর আনুগত্য করা না হলে শুধু মৌখিক নবী বলে স্বীকার করলে তা হবে একেবারে অর্থহীন।

৯. নবী মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত এসে নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। সে জন্যে তিনি খাতামুন নাবিয়ীন। তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্যে এবং যতোদিন দুনিয়া থাকবে, ততোদিনের জন্যে তাঁর নবুয়ত থাকবে। আল্লাহ্‌র কাছে তারাই নাজাত পাবে যারা তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর আনুগত্যের ভেতরেই জীবন যাপন করবে।

১০. আমাদের জন্যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আদর্শ নবী মুহাম্মাদ (সঃ)–এর জীবন। দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর হুকুমই চূড়ান্ত। মুসলমানের কাজ হচ্ছে এই যে, যে কাজের নির্দেশ তাঁর পক্ষ থেকে আসবে তা মন প্রাণ দিয়ে পালন করতে হবে। যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। মোট কথা তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিতে হবে।

১১. রসূলের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য। রসূলের নাফরমানী তেমনি আল্লাহ্‌র নাফরমানী হবে। আল্লাহ্‌র মহব্বতের তাগিদেই রসূলের আনুগত্য, এ হচ্ছে ঈমানের কষ্টিপাথর। রসূলের নাফরমানী মুনাফেকীর আলামত।

১২. রসূলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক। তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা ও বেয়াদবি যাবতীয় নেক আমল বরবাদ করে দেয়। মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হলো রসূলকে তার মা–বাপ, সন্তানাদি ও আত্মীয়–স্বজন থেকেই শুধু অধিকতর প্রিয় মনে করবে না, বরঞ্চ তার নিজের জীবন অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় মনে করবে।

কুরআন বলে ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ – (الاحزاب : ٦)

নবী মুমেনদের জন্যে তাদের নিজেদের জীবন অপক্ষোও অধিকতর প্রিয়। (আহযাব ঃ ৬)।

১৩. রেসালাতের উপরে ঈমানের সুস্পষ্ট দাবী হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক মুসলমান নবী মুস্তাফা (সঃ)-এর উপরে দরূদ পড়বে এবং তাঁর জন্যে দোয়া করবে।

আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান

১. আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্যে বহু ছোটো বড়ো কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাবে তিনি দ্বীনের কথা বলেছেন এবং জীবন পরিচালনার জন্যে বিধানও দিয়েছেন। নবীগণ এসব কিতাবের মর্মকথা সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং নিজে আমল করে দেখিয়েছেন।

২. সমস্ত আসমানী কিতাবের উপরে ঈমান আনতে হবে। কারণ এসব কিতাবের বুনিয়াদী শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ বলা হয়েছে, আল্লাহ্র বন্দেগী কর এবং কুফর ও শির্ক থেকে দূরে থাক।

৩. আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে চারটি প্রসিদ্ধ যা চার জন প্রখ্যাত পয়গাম্বরের উপর নাযিল করা হয়েছিল। যথাঃ-

ক. তাওরাত। এ নাযিল হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-এর উপর।

খ. যবুর। এ নাযিল হয়েছিল হযরত দাউদ (আ)-এর উপর।

গ. ইঞ্জিল। এ নাযিল হয়েছিল হযরত ঈসা (আ)-এর উপর।

ঘ. কুরআন মজীদ। নাযিল হয়েছিল সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর।

৪. আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র কুরআন মজীদ তার আসল রূপ ও আকৃতিতে তার প্রতিটি আসল শব্দ, অক্ষর ও যের-যবর-পেশসহ অবিকল বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্ স্বয়ং তার সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন। কিছু যালেম - পাপাচারী যদি (নাউযুবিল্লাহ) কুরআনের সকল অনুলিপি জ্বালিয়ে ফেলে, তথাপি তা সংরক্ষিত থাকবে। তার কারণ এই যে, সকল যুগে সকল দেশে এমন কোটি কোটি মুসলমান ছিল, আছে এবং থাকবে যাদের বক্ষে কুরআন অবিকল সংরক্ষিত ছিল, আছে এবং থাকবে।

৫. অন্য তিনটি আসমানী কিতাবের বহুলাংশ পরিবর্তন করা হয়েছে। তার কোনটি এখন তার আসল রূপে বিদ্যমান নেই। প্রথমতঃ এ কিতাবগুলো সে সব নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার অনেক পরে সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ পথভ্রষ্ট ও দুনিয়ার স্বার্থ শিকারী লোকেরা এসব কিতাবে বর্ণিত শিক্ষার সাথে এমন কিছু সংযোজিত করেছে যা দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এমন সব বিষয় ছাঁটাই করেছে যা ছিল তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। এ জন্যে আজকাল আল্লাহ্র প্রকৃত দ্বীন জানবার এবং তার উপর আমল করার একটি মাত্র সংরক্ষিত, নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন গৃহীত উপায় রয়েছে এবং তা হচ্ছে কুরআন মজীদ। তাকে অস্বীকার করে এবং তার মুখাপেক্ষী না হয়ে কেউই আল্লাহ্র সত্যিকার দ্বীনের আনুগত্য করতে পারে না। কেয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী মানবজাতির উচিত এ কিতাবের উপর ঈমান আনা। তার উপর ঈমান আনা ব্যতীত নাজাত কিছুতেই সম্ভব নয়।

৬. কুরআন পাকের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অধিকার কারো নেই। নবীর কাজও শুধু এই ছিল যে, তিনি ঠিক মতো তা মেনে চলবেন। কুরআন পাক থেকে নিজের মন মতো অর্থ বের করা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা তার আয়াতসমূহকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা নেহায়েত বেদ্বীন লোকের কাজ।

৭. কুরআনে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান আছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যার সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট হেদায়েত দেয়া হয়নি। এ জন্যে জীবনের কোন এক ক্ষেত্রে কুরআন থেকে বেপরোয়া হওয়া এবং তার দেয়া মূলনীতির মুকাবিলায় অন্য মুলনীতি অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলা পথ ভ্রষ্টতা এবং কুরআনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

আখেরাতের উপর ঈমান

১. মানুষের জীবন শুধু এ দুনিয়ার জীবনই নয়। বরঞ্চ মরণের পর পুনর্জীবন লাভ করার পর এক দ্বিতীয় জীবন শুরু হবে যা হবে চিরন্তন জীবন এবং যার পর মৃত্যু আর কাউকে স্পর্শ করবে না। এ জীবন আপন আপন কর্ম অনুযায়ী অত্যন্ত সুখের হবে অথবা অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের। এ জীবনের উপর বিশ্বাসকেই বলে আখেরাতের উপর বিশ্বাস।

২. মরণের পর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির নিকটে 'মনকির' ও 'নকীর' ফেরেশতাদ্বয় এসে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ-

০ বল তোমার রব কে?

০ বল তোমার দ্বীন কি?

০ নবী মুস্তাফা (সঃ)-কে দেখিয়ে বলবেন-বল ইনি কে?

এই হচ্ছে আখেরাতের পরীক্ষার প্রথম ঘাঁটি।

৩. একদিন যখন শিংগায় ফু’ক দেয়া হবে তখন সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি লন্ড-ভন্ড হয়ে যাবে। পৃথিবী ভয়ংকরভাবে এবং থর থর করে কাঁপতে থাকবে। সূর্য চন্দ্রের মধ্যে সংঘর্ষ হবে। তারকারাজি আলোক বিহীন অবস্থায় চারদিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। পাহাড় পর্বত ধুনানো তুলার মতো উড়তে থাকবে। আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রকার জীব মৃত্যুবরণ করবে এবং গোটা বিশ্বজগত সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪. অতপর আল্লাহ্‌র আদেশে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফু’ক দেয়া হবে। তখন সকল মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করবে। এক নতুন জগত অস্তিত্বলাভ করবে। এবার মানুষের জীবন হবে চিরন্তন জীবন। একেই বলে কেয়ামতের দিন এবং এ দিনটি হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। ভয় ও সন্ত্রাসে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হতে থাকবে। দৃষ্টি থাকবে নীচের দিকে। প্রত্যেকে তার পরিণামের প্রতীক্ষা করবে।

৫. সকল মানুষ হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র সম্মুখে একত্র হবে। আল্লাহ্ বিচারের আসনে সমাসীন হবেন সেদিন সকল কর্তৃত্ব প্রভুত্ব একমাত্র তাঁরই হবে। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কারো মুখ খুলবার সাহস হবে না। আল্লাহ্ প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে হিসাব নেবেন। তিনি তাঁর জ্ঞান, সুস্থবিচার বুদ্ধি ও ন্যায় পরায়ণতার ভিত্তিতে সঠিক ফায়সালা করবেন। প্রত্যেককে তার সঠিক ও ন্যায় সংগত প্রতিদান দেয়া হবে। কারো প্রতি কণামাত্র অবিচার করা হবে না।

৬. নেক বান্দাহদের ডান হাতে এবং পাপীদের বাম হাতে তাদের নামায়ে আমল দেয়া হবে। নেক লোকেরা নাজাত ও সাফল্য লাভ করবেন এবং পাপাচারী ব্যর্থ মনোরথ হবে। সাফল্যকারীদের মুখমণ্ডল আনন্দে সমুজ্জল হবে। পক্ষান্তরে পাপাচারীদের মুখমণ্ডল দুঃখ-বেদনায় মলীন ও কালো হবে। নেক ও ধার্মিক লোকেরা বেহেশতে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন এবং খোদাদ্রোহীদেরকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে।

৭. সে দিনের সিদ্ধান্ত হবে অটল ও অপরিবর্তনীয়। এ সিদ্ধান্ত কেউ এড়াতে পারবে না। মিথ্যা কথা বলে অথবা কোন বাহানা করে কেউ আল্লাহ্‌কে

প্রতারিত করতে পারবে না। আর না কোন অলী অথবা কোন নবী কারো অন্যায় সুপারিশ করবেন। শাফায়াত বা সুপারিশের জন্যে একমাত্র তিনি মুখ খুলতে পারবেন যাকে আল্লাহ্ অনুমতি দেবেন। একমাত্র তারই জন্যে সুপারিশ করা হবে যার জন্যে আল্লাহ্ সুপারিশের অনুমতি দেবেন। দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আসারও সুযোগ কারো হবে না যাতে করে সে নেক আমল করে আখেরাতের জীবন সার্থক করবে। কারো ক্রন্দন ও বিলাপও কাউকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

৮. দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের আমল সংরক্ষিত করা হচ্ছে। আমরা যা কিছুই বলছি এবং করছি তা সবই আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ লিখে রাখছেন। মুখ থেকে কোন কথা বেরুবার সাথে সাথেই ফেরেশতা তা অবিকল সংরক্ষিত করে রাখছেন।

৯. মানুষের কোন আমলই সেদিন আল্লাহ্র দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না। তা সরিষা পরিমাণ হোক কঠিন পাথরের মধ্যে প্রোথিত হোক, আকাশে বাতাসে হোক অথবা ভূগর্ভের কোন অন্ধকার স্তরে লুক্কায়িত হোক, আল্লাহ্ সেদিন তা এনে হাজীর করবেন। প্রত্যেকেই সেদিন আল্লাহ্র সামনে ধরা পড়বে।

১০. জান্নাতবাসী মুমেনদেরকে এমন অনুপম ও অফুরন্ত সুখসম্পদ দান করা হবে যে, যা চোখ কোন দিন দেখেনি, কান এ সম্পর্কে কিছু শুনেনি এবং অন্তর তা কোনদিন কল্পনাও করেনি। যেদিকেই তাঁরা যাবেন, চারদিক থেকে 'সালাম, সালাম, খোশ আমদেদ, খোশ আমদেদ, ধ্বনীই শুধু শুনা যাবে। এ আনন্দ-সুখ থেকে তাদেরকে কোনদিন বঞ্চিত করা হবে না। তাদের সব চেয়ে বড় পাওয়া হবে এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে তার দীদার দান করবেন এবং বলবেন, হে আমার বান্দাগণ! আজ আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তোষ প্রকাশ করছি। এখন আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি নারায হবো না।

১১. খোদাদ্রোহীদেরকে জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। আগুন তাদেরকে ঘিরে রাখবে এবং সেখান থেকে কোনদিন তারা পালাতে পারবে না। তারা মরেও যাবে না যে, যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আর না তারা জীবিত থাকবে জীবন উপভোগ করার জন্যে। নৈরাশ্যে প্রতি মুহূর্তে তারা মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু মৃত্যু তাদের কপালে আর ঘটবে না। জাহান্নামের আগুন রাগে ফেটে পড়তে

থাকবে এবং কখনো নিভে যাবে না। পিপাসায় কাতর হয়ে যখন জাহান্নামবাসী ছটফট করবে, তখন তাদেরকে উত্তপ্ত গলিত ধাতু পানীয় হিসাবে দেয়া হবে। যার ফলে মুখ পুড়ে যাবে। অথবা এমন জিনিস দেয়া হবে যা গলদেশ পার হতে পারবে না। তাদের গলায় আগুনের হাঁসুলি এবং আলকাতরা ও আগুনের পোশাক পরানো হবে। ক্ষুধায় তাদেরকে কন্টকযুক্ত খাদ্য খেতে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ থাকবেন।

১২. কে বেহেশতবাসী এবং কে জাহান্নামবাসী তার সঠিক জ্ঞান আল্লাহ্ তায়ালার রয়েছে। অবশ্যি যে কাজগুলো একজন মানুষকে বেহেশতে নিয়ে যাবে তা নবী করীম (সঃ) সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে যে কাজগুলোর পরিণাম জাহান্নাম তাও সুস্পষ্ট করে তিনি বলে দিয়েছেন। দুনিয়ায় আমরা কাউকে নিশ্চিত সহকারে বেহেশতী বলতে পারি না। অবশ্যি ঐ সব ভাগ্যবান ব্যতীত যাদেরকে নবী পাক (সঃ) বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু ভালো নিদর্শন দেখে আল্লাহ্র রহমতের আশা অবশ্যই করা যেতে পারে।

১৩. আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যে কোন গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন। কুরআন বলে, "আল্লাহ কুফর ও শির্কের গুনাহ মাফ করবেন না। তবে খাঁটি দেলে তওবা করলে তিনি মাফ করবেন।" (সূরায়ে ফুরকান)।

১৪. জীবনের যে কোন সময়ে ঈমান আনলে অথবা গুনাহ থেকে তওবা করলে তার ঈমান এবং তওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। মৃত্যুর সময় যখন আযাবের ফেরেশতা দেখা যায় তখন না কারো ঈমান কবুল হবে না তওবা।

গায়ের ইসলামী আকায়েদ ও চিন্তাধারা

মুসলমান হওয়ার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন যে, ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয়ে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তার উপর ঈমান এনে তার ভিত্তিতেই জীবনকে সংশোধিত করে গড়ে তুলতে হবে। ঠিক তদনুরূপ এটাও প্রয়োজন যে, ইসলাম ও ঈমানের পরিপন্থী গায়ের ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত হতে হবে। এসব আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে মন-মস্তিষ্ক মুক্ত ও পবিত্র করতে না পারলে ইসলামের দাবী পূরণ ও সত্যিকার ইসলামী জীবন যাপন কিছুতেই সম্ভব নয়।

নিম্নে সংক্ষেপে সে সব গায়ের ইসলামী ধারণা বিশ্বাসের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার থেকে একজন মুসলমান পূর্ণ অনুভূতি সহকারে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে পারে।

১. কুফরী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড পসন্দ করা, এতে গর্ববোধ করা এবং অপরকেও এর জন্যে উদ্বুদ্ধ করা ঈমানের একেবারে খেলাপ। এসব থেকে অতি সত্বর তওবা করতে হবে।

২. দ্বীন ইসলামের আসল আখলাক এবং তার নিদর্শনাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা। ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, অবজ্ঞা ও ঘৃণা সহকারে এ সবের উল্লেখ করা। ইসলামের প্রতি নির্লজ্জ উক্তি এবং নিকৃষ্ট ধরনের মুনাফেকী। এ ধরনের কথাবার্তা বরদাশত করা, কথা ও কাজের দ্বারা এ সবের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ না করা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করা হয়। দ্বীনের প্রতি আনুগত্যহীনতা প্রকাশ করা হয় এবং এর দ্বারা ঈমানের চরম দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়।

৩. আল্লাহ্ ও তাঁর নবী পাক (সঃ)-এর নিদর্শনাবলী অবগত হওয়ার পরেও বাপ-দাদার প্রথা এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালনে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালনকে অবমাননাকর মনে করা ইসলাম বিরোধী আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ফল। ঈমানের সাথে এ সবের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই।

৪. আল্লাহ ও রসূলের হুকুম আহকাম নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করা, তার অর্থ বিকৃত করে আপন স্বার্থের অনুকূল করা এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ-নিষেধগুলো হুবহু পালন করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা চরম মুনাফেকীর কাজ।

৫. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম-আহকামের সমালোচনা করা, তার মধ্যে ত্রুটি বের করা, সময়োপযোগী মনে না করা, এ ধরনের উক্তি করা যে, এসব অন্ধযুগের কাজ-কারবার। এসব কিছুই ভ্রান্ত চিন্তাধারার ফলশ্রুতি যার সাথে ঈমানের কোনই সম্পর্ক নেই।

৬. আল্লাহ্‌র অবিশ্বাসীরা হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করে ধন-সম্পদ উপার্জন করে এবং আনন্দমুখর জীবন যাপন করে। এসব দেখে কোন মুসলমান যদি তার ঈমান সম্পর্কে লজ্জাবোধ করে এবং বলে, আহা! যদি মুসলমান না হতাম তাহলে আমরাও দুনিয়াকে উপভোগ করতে পারতাম, তাহলে এসব চিন্তা, ধারণা ও উক্তি ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারারই ফল বলতে হবে। এসব থেকে ঈমানকে রক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৭. শরীয়তের বাধা-নিষেধকে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা মনে করা, মহিলাদেরকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করাতে গর্ববোধ করা, ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকে পরস্পরের সাথে হাত মিলাতে, নিঃসংকোচে গল্প আলাপ করতে সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখে গর্ববোধ করা এবং এটাকেই প্রগতি মনে করা নির্লজ্জ ধরনের ধর্মহীনতা। এটা আত্মমর্যাদা এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের একেবারে খেলাপ।

৮. দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণে ঔদাসীন্য, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতায় শুধু নিশ্চিত থাকাই নয়। বরঞ্চ অজ্ঞতার কারণেই ইসলামের উপর আমল না করার জন্যে অক্ষমতা প্রকাশ ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিন্তাধারা যা একজন মুসল-মানের ঈমান-আকীদাহ নষ্ট করে দেয়।

৯. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে লাভ-লোকসান, সম্মান-অসম্মান, উন্নতি-অবনতি প্রভৃতির মালিক মোখতার মনে করা, তৌহীদী বিশ্বাসের বিপরীত।

১০. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্যে অন্তরে ভীতি পোষণ করা, কারো উপরে ভরসা করা, কারো উপরে আশা পোষণ করা, মানব জীবনের

উত্থান-পতনের এখতিয়ার অন্য কারো আছে বলে বিশ্বাস করা ঈমানকে বিনষ্ট করে।

১১. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, কার্যসম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী, সাহায্যদাতা ও রক্ষাকর্তা মনে করা তৌহীদী আকীদার বিপরীত।

১২. ভবিষ্যত সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তা বিশ্বাস করা ঈমান নষ্ট করে দেয়।

১৩. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে হাযের-নাযের মনে করা যে, গোপন এবং প্রকাশ্য সব তার জানা আছে,-ইসলামী আকীদার খেলাপ।

১৪. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে ডাকা, কারো কাছে রুজি ও সন্তানাদি চাওয়া, কারো নামে সন্তানের নাক কান ছিদ্র করার চুলের ঝুঁটি রাখা, কারো নামে মানত মানা পরিপূর্ণ শির্ক।

১৫. আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে পশু ছেড়ে দেয়া, পশু যবেহ করা, সন্তান বাঁচার জন্যে বেদআতি কাজ-কর্ম করা, নবপ্রসূত সন্তানকে রক্ষা করার জন্যে তার শিয়রে কোন অস্ত্র রাখা, সন্তানের জীবনের জন্যে অন্য কোন শক্তিকে ভয় করা প্রভৃতি শির্ক এবং তৌহীদের বিপরীত।

১৬. বিয়ে শাদী, সন্তানের জন্ম ও খাৎনার সময় এমন সব কাজ-কর্ম অপরিহার্য মনে করা যা ইসলাম অপরিহার্য মনে করেনি, গায়ের ইসলামী চিন্তা ধারা ও কুসংস্কার।

১৭. রোগ ও মৃত্যুর জন্যে আল্লাহ্‌র উপর দোষারোপ করা, অসংগত ও গোস্তাখীপূর্ণ উক্তি করা, আল্লাহ্‌র প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা ঈমান বিনষ্টকারী।

১৮. অসাধারণ বিপদ-আপদে পতিত হয়ে এবং বার বার বিপদ ও বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রত্যাশা না করা এবং (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্‌কে দয়ামায়াহীন মনে করা কুফরী চিন্তা ধারার বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের শয়তানী অসঅসা মনের মধ্যে প্রকাশ পেলে সংগে সংগে খাঁটি দেলে তওবা করা উচিত।

১৯. কারো সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, কাউকে সিজদা করা, কারো সামনে মস্তক অবনত করা শির্ক।

২০. কবরে চুমো দেয়া, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, কবরে কপাল ঠেকানো এবং এ ধরনের আর যত সব কর্মকাণ্ড সবই তৌহীদী আকীদার পরিপন্থী এবং চরম অবমাননা।

২১. কোন পীরের ছবি বরকতের জন্যে কাছে রাখা, তাতে ফুলের মালা পরানো এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পুরোপুরি শির্ক।

২২. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং এমন বিশ্বাসের ঘোষণা করা যে, অবস্থার পরিবর্তন করার ক্ষমতা তার আছে–একেবারে শির্ক।[১]

২৩. কারো আদেশ–নিষেধকে আল্লাহ্র আদেশ–নিষেধের সমতুল্য মনে করা, তার নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেয়া, শরীয়তের বিধানগুলোতে কমবেশী করার অন্য কারো অধিকার আছে বলে মনে করা, কাউকে শরীয়তের উর্ধে মনে করা অথবা কাউকে এমন মনে করা যে, শরীয়তের কোন বিধান সে মাফ করে দিতে পারে—একেবারে শির্ক।

২৪. কারো বাড়ী এবং কবরের তওয়াফ করা, কোন স্থানকে কা'বা শরীফের মতো মনে করে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ইসলাম বিরোধী আকীদারই বহিঃপ্রকাশ।

২৫. আলী বখস, নবী বখশ, হোসেন বখশ, আবদুন্নবী প্রভৃতি নাম রাখা এবং কাউকে ইয়া গউসুল মদদ, ইয়া অলীউল মদদ প্রভৃতি নাম ধরে ডাকা তৌহীদি আকীদার খেলাপ।

২৬. আল্লাহ্র আইনের তুলনায় মানুষের তৈরী আইন সঠিক মনে করা, তা মেনে চলা, অপরিহার্য মনে করা, তা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা–চরিত্র করা, তার সমর্থক ও সাহায্যকারী হওয়া ঈমান ও ইসলামী চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

২৭. আখেরাতে নাজাতের জন্যে ঈমান ও আমলের পরিবর্তে পীর অলীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাকে যথেষ্ট মনে করা এবং এমন মনে করা যে, তাঁর সুপারিশে সব কিছু হয়ে যাবে অথবা আল্লাহ্র উপর তিনি এতোখানি

---

১. কোন মৃত ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যেতে তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্যে গাড়ী বা যানবাহন থামানো এবং সেই মৃত ব্যক্তি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে পারে বলে তার কবরে কিছু নযর নিয়ায দেয়া, না দিলে নারাষ হয়ে কোন বিপদে ফেলতে পারেন বলে বিশ্বাস করা ষোল আনা শির্ক–অনুবাদক।

প্রভাব খাটাতে পারেন যে, যেমন খুশী তেমন সিদ্ধান্ত করাতে পারেন- একেবারে ইসলাম বিরোধী আকীদাহ-বিশ্বাস।

২৮. নিজেকে পাপ অথবা পূণ্য করতে একেবারে বাধ্য মনে করা এবং মনে করা যে, বান্দার ভালো-মন্দ করার কোনই অধিকার নেই ভালো-মন্দ সবই আল্লাহ্ করান এবং বান্দাহ বাধ্য হয়েই তাই করে-একেবারে ইসলাম বিরোধী ধারণা বিশ্বাস। এ বিশ্বাসসহ আখেরাতের উপর বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে পড়ে।

২৯. নিজেকে সকল কাজ করতে পরিপূর্ণ সক্ষম মনে করা এবং এমন মনে করা যে, মানুষ যা কিছু করে তাতে আল্লাহ্র করার কিছুই নেই, প্রত্যেক কাজ করার পূর্ণ এখতিয়ার মানুষের আছে-ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা। এমন চিন্তাধারা থেকে অন্তরকে পাক-পবিত্র রাখা দরকার।

৩০. নবী-রসূলগণকে নিষ্পাপ মনে না করা, কোন মন্দ কাজ তাঁদের প্রতি আরোপ করা অথবা তাঁদেরকে আসমানী কিতাবের প্রণেতা মনে করা ইসলাম বিরোধী আকীদাহ-বিশ্বাস।

৩১. সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর সমালোচনা করা, তাঁদের দোষত্রুটি বের করা, তাঁদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা অথবা তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা। এসব চিন্তাধারা থেকে তওবা করা উচিত।

৩২. আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল দ্বীন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে কিংবা নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে দ্বীন সম্পর্কে নতুন কিছু আবিষ্কার করা, তা চালু করা ও তা প্রয়োজনীয় মনে করা বিদআত। বিদআত বড়ো গুনাহ এবং গোমরাহী।

৩৩ বিপদ ও দুঃখ কষ্টে পড়ে নিজের ভাগ্যকে ভালোমন্দ বলা, তাকদীরের বিরুদ্ধে উক্তি করা এবং এ ধরনের কথা বলা-কি বলব, আমার তাকদীর মন্দ, আল্লাহ আমার কপালে এই রেখেছিলেন, আমার ভাগ্য কি এমন যে, সুখের মুখ দেখবো-এ ধরনের উক্তি করায় আল্লাহ্র প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা হয় এবং তাঁর শানে গোস্তাখী করা হয়। এ ধরনের ইসলাম বিরোধী ধারণা ও উক্তি থেকে নিজেকে পাক রাখা দরকার। আল্লাহ্র প্রত্যেকটি কাজে সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া প্রকৃত ঈমানের আলামত।

كِتَابُ الطَّهَارَة

তাহারাত অধ্যায়

তাহারাত

নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত হবার পর নবীর দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নবী মুস্তাফা (সঃ)-এর উপর প্রথমে যে অহী নাযিল হয় তাতে তৌহীদের শিক্ষার পরই এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা (তাহারাত) অবলম্বন করতে হবে।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (المدثر ٤)

নিজেকে পাক পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন (মুদ্দাসসির-৪)।

ثياب শব্দটি ثوب শব্দের বহুবচন। যার শাব্দিক অর্থ পোশাক। কিন্তু এখানে ثياب (সিয়াব) বলতে শুধুমাত্র পোশাক-পরিচ্ছদ বুঝানো হয়নি। বরঞ্চ শরীর, পোশাক, মন-মস্তিষ্ক মোট কথা সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষায় طاهرالثوب ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মলিনতার উর্ধে। কুরআনের নির্দেশের মর্ম এই যে, স্বীয় পোশাক, শরীর ও মন-মস্তিষ্ককে সকল প্রকার মলিনতা থেকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে হবে। মন-মস্তিষ্কের মলিনতার অর্থ শির্ক কুফরের ভ্রান্ত মতবাদ ও চিন্তাধারা এবং চরিত্রের উপর তার প্রতিফলন। শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদের মলিনতার অর্থ এমন অপবিত্রতা ও অশুচিতা যা অনুভব করা যায় এবং রুচিপ্রকৃতির কাছে ঘৃণ্য। অতপর শরীয়তও যার অপবিত্র (নাপাক) হওয়ার ঘোষণা করেছে।

পবিত্রতার এ গুরুত্বকে সামনে রেখে কুরআন পাক স্থানে স্থানে এর জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কুরআনের দু' স্থানে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন যে, যারা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে তারা তাঁর প্রিয় বান্দাহ্।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ (التوبه ١٠٨)

যারা পাকসাফ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন- (তওবা ঃ ১০৮)।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (البقرة ٢٢٢)

যারা বার বার তওবা করে এবং পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন (বাকারা ঃ ২২২)।

নবী পাক (সঃ) স্বয়ং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। উম্মতকে তিনি পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার জন্যে বিশেষভাবে তাগীদ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে তার গুরুত্ব বর্ণনা করে পাকসাফ থাকার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক (اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ)। অতপর তিনি বিস্তারিতভাবে ও সুস্পষ্টরূপে তার হুকুম-আহকাম ও পন্থা বলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বয়ং তাঁর বাস্তব জীবনে তা কার্যকর করে তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝাবার এবং হৃদয়ংগম করার হক আদায় করেছেন। অতএব প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সে সব মূল্যবান নির্দেশ মেনে নেয়া স্মরণ রাখা এবং তদনুযায়ী নিজের যাহের ও বাতেনকে (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক) পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা। মন ও মস্তিষ্ককে ভ্রান্ত মতবাদ ও চিন্তাধারা এবং শির্ক ও কুফরের আকীদাহ-বিশ্বাস থেকে পবিত্র রাখা, নিজের শরীর, পোশাক ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলোকেও সকল প্রকার অপবিত্রতা ও মলিনতা থেকে পাক রাখাও প্রত্যেকের অপরিহার্য কর্তব্য। শির্ক কুফরের আকীদাহ-বিশ্বাসসমূহ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে প্রকাশ্যে নাজাসাতগুলোর (নাপাকীর) হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে এ বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, পাক-নাপাকের কষ্টিপাথর হলো আল্লাহ্র শরীয়ত। এ ব্যাপারে নিজের জ্ঞান-বিবেক অথবা রুচি অনুযায়ী কিছু কম-বেশী করার অধিকার কারো নেই। একমাত্র ওসব বস্তুই পাক যাকে শরীয়ত পাক বলেছে এবং হক শুধু তাই যাকে শরীয়ত হক বলে ঘোষণা করেছে। ঠিক তেমনি ওসব বস্তু অবশ্য অবশ্যই বাতিল এবং নাপাক যাকে শরীয়ত বাতিল ও নাপাক বলেছে। অতপর শরীয়ত পাক করার ও পাক হওয়ার যেসব পন্থা ও পদ্ধতি বলে দিয়েছে একমাত্র সেভাবেই পবিত্রতা অর্জন করা যায়। এ ব্যাপারে নিজস্ব কোন রুচি ও ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে পাক-নাপাকের কোন কষ্টিপাথর ঠিক করা এবং অযথা কুসংস্কার ও সন্দেহের কারণে আল্লাহ্র সহজ সরল শরীয়তকে দুঃসাধ্য করে ফেলা শুধু নিজেকেই বিরাট অসুবিধার মধ্যে ঠেলে দেয়া নয়, বরঞ্চ একটা

সাংঘাতিক রকমের গোমরাহী এবং দ্বীনের সঠিক ধারণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা ও কার্যকলাপের ফলে অনেক সময় মারাত্মক কুফল দেখতে পাওয়া যায় এবং লোকে শরীয়তকে নিজের জন্যে এক বিরাট মসীবত মনে করে দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়।

নাজাসাতের (অপবিত্রতা) বর্ণনা

নাজাসাতের (نجاست) অর্থ হচ্ছে মলিনতা, অশুচিতা ও অপবিত্রতা। এ হলো তাহারাত (طهارت) বা পবিত্রতার বিপরীত। তাহারাতের মর্ম পন্থা-পদ্ধতি , হুকুম-আহকাম এবং মাসয়ালা জানার জন্যে প্রথমে প্রয়োজন হচ্ছে যে, নাজাসাতের মর্ম, তার প্রকারভেদ এবং তা পাক করার নিয়মপদ্ধতি জেনে নিতে হবে। এ জন্যে প্রথমেই নাজাসাতের হুকুমগুলো ও সে সম্পর্কিত মাসয়ালাগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে।

নাজাসাতের প্রকারভেদ

নাজাসাত দুই প্রকারের। নাজাসাতে হাকিকী ও নাজাসাতে হুকমী। উভয়ের হুকুম আহকাম ও মাসয়ালা পৃথক পৃথক। পবিত্রতা অর্জন করার জন্যে তার হুকুম ও মাসয়ালাগুলো ভালো করে বুঝেসুঝে তা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী।

নাজাসাতে হাকিকী

নাজাসাতে হাকিকী হচ্ছে ঐ সব মল-মুত্র ও ময়লা জিনিস যা সাধারণত মানুষের ঘৃণার উদ্রেক করে এবং প্রত্যেকে সে সব থেকে নিজের শরীর জামা-কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রকে রক্ষা করতে চায়। শরীয়তও এ সব থেকে দূরে থাকার এবং পাক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন মল, মূত্র, বীর্য, রক্ত ইত্যাদি। এ আবার দু'প্রকারের-নাজাসাতে গালিযা এবং নাজাসাতে খফিফা।

নাজাসাতে গালিযা

ঐ সব জিনিসকে নাজাসাতে গালিযা বলা হয় যাদের নাপাক হওয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সেগুলোকে ঘৃণা করে এবং শরীয়ত সেগুলোকে নাপাক বলে ঘোষণা করে। এ সবের অপবিত্রতা অসুচিতা খুব তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং সে জন্যে শরীয়তে এ সবের জন্যে কঠোর নির্দেশ রয়েছে। নিম্নে নাজাসাতে গালিযার কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে।

১. শূকর। তার প্রতিটি বস্তুই নাজাসাতে গালিযা। সে জীবিত হোক অথবা মৃত।

২. মানুষের পেশাব, পায়খানা, বীর্য, প্রশ্রাবের দ্বার দিয়ে নির্গত যে কোন তরল বস্তু, সকল পশুর বীর্য এবং ছোট ছেলেমেয়েদের পেশাব-পায়খানা।

৩. মানুষ অথবা পশুর রক্ত।

৪. বমি যে কোন বয়সের মানুষের হোক।

৫. মেয়েদের প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে নির্গত রক্ত।

৬. মেয়েদের প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে নির্গত কোন তরল পদার্থ।

৭. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পুঁজ, রস অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ।

৮. যে সব পশুর ঝুটা নাপাক তাদের ঘাম ও লালা।

৯. যবেহ করা ব্যতীত যে সব পশু মারা গেছে তাদের গোশত, চর্বি ইত্যাদি এবং চামড়া নাজাসাতে গালিযা। অবশ্য চামড়া দাবাগাত (Tanning) করা হলে তা পাক। ঠিক তেমনি যার মধ্যে রক্ত চলাচল করে না যেমন শিং দাঁত ক্ষুর ইত্যাদি পাক।

১০. হারাম পশুর-জীবিত অথবা মৃত-দুধ এবং মৃত পশুর (হালাল অথবা হারাম) দুধ।

১১. মৃত পশুর দেহ থেকে নির্গত তরল পদার্থ।

১২. নাপাক বস্তু থেকে নির্গত নির্যাস অথবা ঐ ধরনের কোন বস্তু।

১৩. পাখী ব্যতীত সকল পশুর পেশাব পায়খানা। গরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর প্রভৃতির গোবর, উট ছাগল প্রভৃতির লাদ। উড়তে পারে না এমন পাখী, যেমন হাঁস-মুরগী ইত্যাদির পায়খানা। সকল হিংস্র পশুর পেশাব পায়খানা।

১৪. মদ এবং অন্যান্য তরল মাদক দ্রব্য।

১৫. সাপের খাল।

১৬. মৃত ব্যক্তির মুখের লালা।

১৭. শহীদ ব্যক্তির দেহ থেকে নির্গত রক্ত যা প্রবাহিত হয়।

নাজাসাতে খফিফা

ঐ সব জিনিস নাজাসাতে খফিফা যার ময়লা কিছুটা হালকা। শরীয়তের কোন কোন দলিল-প্রমাণ থেকে তাদের পাক হওয়ার সন্দেহ হয়। এ জন্যে শরীয়তে তাদের সম্পর্কে হুকুমও কিছুটা লঘু। নিম্নে এমন সব জিনিসের নাম করা হচ্ছে যাদের নাজাসাত নাজাসাতে খফিফা।

১. হালাল পশুর পেশাব, যেমন-গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি।

২. ঘোড়ার পেশাব।

৩. হারাম পাখীর মল, যেমন-কাক, চিল, বাজ প্রভৃতি। অবশ্যি বাদুরের পেশাব-পায়খানা পাক।

৪. হালাল পাখীর পায়খানা যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

৫. নাজাসাতে খফিফা যদি নাজাসাতে গালিযার সাথে মিশে যায় তা গালিযার পরিমাণ যতোই কম হোক না কেন, তথাপি সব নাজাসাতে গালিযা হয়ে যাবে।

নাজাসাতে হাকিকী থেকে পাক করার পদ্ধতি

নাপাক হওয়ার জিনিসগুলো যেমন বিভিন্ন ধরনের তেমনি তা থেকে পাক হওয়ার পদ্ধতিও বিভিন্ন, যেমন কতকগুলো জিনিস স্থির থাকে। কতকগুলো হালকা এবং বয়ে যায়। কতকগুলো আর্দ্রতায় শুকে যায়। কতকগুলো শুকায় না অথবা অল্পমাত্রায় শুকায়। কতকগুলোর ময়লা নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কতকগুলোর হয় না। সে জন্যে তাদের পাক করার নিয়ম-পদ্ধতি ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

মাটি প্রভৃতি পাক করার নিয়ম

১. মাটি নাপাক হলে, অল্প কিংবা তরল মল দ্বারা হোক অথবা ঘনো গাঢ় মল দ্বারা, উভয় অবস্থাতেই শুকে গেলেই পাক হয়ে যাবে। কিন্তু এমন মাটিতে তায়াম্মুম করা ঠিক হবে না।

২. নাপাক মাটি শুকোবার আগে তাতে ভালো করে পানি ঢেলে দিতে হবে যেন পানি বয়ে যায়। অথবা পানি ঢেলে দিয়ে তা কোন কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে চুষিয়ে নিতে হবে যেন মলের কোন চিহ্ন না থাকে বা গন্ধ না থাকে। এতেও মাটি পাক হয়ে যাবে। অবশ্যি তিন বার এ রকম করা উচিত।

৩. মাটি, ঢিল, বালু, পাথর প্রভৃতি শুকে গেলে পাক হয়। যে পাথর মসৃণ নয় এবং তরল বস্তু চুষে নেয়, তা শুকে গেলে পাক হয়।

৪. মাটি থেকে উদগত ঘাস, শস্য, গাছের চারা নাপাক হওয়ার পর শুকে গেলে পাক হয়ে যায়।

৫. মাটিতে যেসব জিনিস সুদৃঢ় হয়ে থাকে, যেমন দেয়াল, স্তম্ভ, বেড়াটাটি, চৌকাঠ প্রভৃতি, তা শুকে গেলে পাক হয়ে যায়।

৬. নাপাক মাটি ওলট পালট করে দিলেও তা পাক হয়ে যায়।

৭. চুলা যদি মলদ্বারা নাপাক হয়ে যায় তাহলে আগুন জ্বালিয়ে ময়লার চিহ্ন মিটিয়ে দিলে পাক হয়ে যায়।

৮. নাপাক যমীনের উপর মাটি ঢেলে দিয়ে মল এভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন মলের গন্ধ না আসে,তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। অবশ্যি তাতে তায়াম্মুম করা যাবে না।

৯. নাপাক মাটি থেকে তৈরী পাত্র যতোক্ষণ কাঁচা থাকে ততোক্ষণ নাপাক। তা যখন শুকে পাকা হয়ে যাবে তখন পাক হবে।

১০. গোবর মাখা মাটি নাপাক। তাঁর উপর কোন কিছু বিছিয়ে না নিলে নামায পড়া দুরস্ত হবে না।

নাপাক শোষণ করে নিতে পারে না
এমন জিনিস পাক করার নিয়ম

১. ধাতু নির্মিত জিনিস, যেমন–তলোয়ার, ছুরি, চাকু, আয়না, সোনা, চাঁদি ও অন্যান্য ধাতুর গহনা অথবা তামা, পিতল, এলোমনিয়াম ও স্টীলের বাসন, বাটি প্রভৃতি নাপাক হয়ে গেলে মাটি দিয়ে ঘষে মেজে নিলে অথবা ভিজে কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে ফেললে পাক হয়ে যাবে। এমনভাবে ঘষে মেজে নিতে হবে বা মুছে ফেলতে হবে যেন নাজাসাতের কোন চিহ্ন বা গন্ধ না থাকে। অবশ্যি জিনিসগুলো যেন নকশী না হয়।

২. চিনা মাটি, কাঁচ অথবা মসৃণ পাথরের থালা, বাটি অথবা পুরাতন ব্যবহৃত থালা, বাটি, পাতিল যা নাজাসাত চুষে নিতে পারে না, মাটি দিয়ে ঘষে মেজে নিলে অথবা ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে পাক হয়। এমনভাবে তা করতে হবে যেন নাপাকীর কোন চিহ্ন না থাকে। অবশ্য যদি তা নকশী না হয়।

৩. ধাতু নির্মিত জিনিস অথবা চিনা মাটির জিনিস তিন বার পানি দিয়ে ধুলে পাক হয়।

৪. এসব জিনিসপত্র যদি নকশী হয় যেমন অলংকার অথবা নকশী থালা বাটি, তাহলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা ব্যতীত শুধু ঘষলে অথবা ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে পাক হবে না।

৫. ধাতু নির্মিত থালা, বাটি অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন চাকু, ছুরি, চিমটা, বেড়ি প্রভৃতি আগুনে দিলে পাক হয়।

৬. মাটি ও পাথরের থালা বাটি আগুনে দিলে পাক হয়ে যায়।

৭. চাটাই, চৌকি, টুল–বেঞ্চ অথবা এ ধরনের কোন জিনিসের উপর ঘন বা তরল ময়লা লেগে গেলে শুধু ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে দিলে পাক হবে না। পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

যেসব জিনিস নাজাসাত চুষে নেয় তা পাক করার নিয়ম

১. মুজা, জুতা অথবা চামড়ার তৈরী অন্যান্য জিনিস যদি নাপাক হয়ে যায় আর নাজাসাত যদি ঘনো হয় যেমন–গোবর, পায়খানা, রক্ত, বীর্য প্রভৃতি,

তাহলে নাজাসাত চেঁচে বা ঘষে তুলে ফেললে পাক হয়ে যায়। আর নাজাসাত যদি তরল হয় এবং শুকে গেলে দেখা না যায়, তাহলে না ধুলে পাক হবে না। তা ধুয়ে ফেলার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বার ধুবার পর এতটা বিলম্ব করতে হবে যেন পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তিনবার ধুতে হবে।

২. মাটির নতুন বরতন (থালা, বাটি, বদনা) অথবা পাথরের বরতন যা পানি চুষে নেয় অথবা কাঠের বরতন যাতে নাজাসাত মিশে যায় এ ধরনের থালা, বাটি অথবা ব্যবহারের জিনিসপত্র যদি নাপাক হয়ে যায়, তাহলে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা তিনবার ধুতে হবে এবং প্রতিবারে এতখানি শুকনো হতে হবে যেন পানি টপকানো থেমে যায়। কিন্তু প্রবাহিত পানিতে ধুতে গেলে এ শর্ত পালনের দরকার নেই। ভালো করে ধুয়ে ফেলার পর পানি সব নিংড়ে গেলেই যথেষ্ট হবে।

৩. খাদ্য শস্য নাপাক হলে তিনবার ধুতে হবে এবং প্রত্যেক বার শুকাতে হবে, যদি নাজাসাত গাঢ় হয় এবং এক স্থানে জমা হয়ে থাকে তাহলে তা সরিয়ে ফেললেই হবে। যেমন শস্যের স্তূপের উপর বিড়াল পায়খানা করেছে এবং তা শুকে জমাট হয়ে আছে। তা সরিয়ে ফেললেই চলবে। বড়ো জোর অন্য শস্যের উপর যদি তার কোন লেশ আছে বলে সন্দেহ হয় তাহলে সেগুলো তিনবার ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪. কাপড়ে নাজাসাত লাগলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেক বার ভালো করে চাপ দিয়ে নিঙড়াতে হবে। ভালো করে নিংড়িয়ে ধুবার পরও যদি দুর্গন্ধ থেকে যায় কিংবা দাগ থাকে তাতে কোন দোষ নেই, পাক হয়ে যাবে।

৫. কাপড়ে যদি বীর্য লাগে এবং শুকে যায়, তাহলে আচড়ে তুলে ফেললে অথবা রগড়ে মর্দন করে তুলে ফেললে পাক হয়ে যায়। আর যদি বীর্য শুকনো না হয় তাহলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললে কাপড় পাক হয়ে যায়। পেশাব করে পানি নেয়ার পর যদি বীর্য বের হয় তাহলে আবার ধুয়ে ফেলতে হবে। যদি বীর্য খুব তরল হয় এবং শুকে যায় তাহলে ধুলেই পাক হবে।

৬. পানির মতো যেসব জিনিস তরল এবং যদি তৈলাক্ত না হয় তাহলে তা দিয়ে কাপড়ে লাগা নাজাসাত ধুয়ে পাক করা যায়।

৭. প্রবাহিত পানিতে কাপড় ধুবার সময় নিংড়াবার দরকার নেই। কাপড়ের একদিক থেকে অন্যদিকে পানি চলে গেলেই যথেষ্ট।

৮. কাপড় যদি এমন হয় যে, চাপ দিয়ে নিংড়াতে গেলে তা ফেটে যাবে, তাহলে তিনবার ধুয়ে দিতে হবে। তারপর হাত দিয়ে অথবা অন্য কিছু দিয়ে এমনভাবে চাপ দিতে হবে যেন পানি বেরিয়ে যায় এবং কাপড়ও না ফাটে।

৯. নাপাক তেল, ঘি বা অন্য কোন তেল যদি কাপড়ে লাগে তাহলে তিনবার ধুয়ে দিলে কাপড় পাক হয় যদিও তেলের তৈলাক্ততা কাপড়ে রয়ে যায়। তেলের সাথে মিশ্রিত নাজাসাত তিনবার ধুলে পাক হয়ে যায়।

১০. যদি কোন মৃতের চর্বি দ্বারা কাপড় নাপাক হয় তাহলে তিনবার ধুলেই যথেষ্ট হবে না। তৈলাক্ততা দূর করে ফেলতে হবে।

১১. চাটাই, বড় সতরঞ্চি, কার্পেট বা এ ধরনের কোন বিছানা-পত্র যা নিংড়ানো যায় না, তার উপর যদি নাজাসাত লাগে তাহলে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তার উপর তিনবার পানি ঢালতে হবে। প্রত্যেকবার পানি ঢালার পর শুকাতে হবে। শুকাবার অর্থ এই যে, তার উপর কিছু রাখলে তা ভিজে উঠবে না।

১২. কোন খালি শূন্যগর্ভ পাত্র যদি নাপাক হয় এবং তা নাজাসাত চুষে নিয়ে থাকে তাহলে তা পাক করার পদ্ধতি এই যে, তা পানি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। নাজাসাতের চিহ্ন বা প্রভাব পানির মধ্যে দেখা গেলে পানি ফেলে দিয়ে আবার ভরতে হবে। যতোক্ষণ পানিতে নাজাসাতের লেশ পাওয়া যায় ততোক্ষণ এভাবে পানি ফেলতে হবে এবং নতুন পানি ভরতে হবে। এমনি করে যখন নাজাসাতের রং এবং দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে তখন পাত্র পাক হয়ে যাবে।

১৩. নাপাক রঙে রং করা কাপড় পাক করার জন্যে এতবার ধুতে হবে যেন পরিষ্কার পানি আসতে থাকে। তারপর রং থাক বা না থাক কাপড় পাক হয়ে যাবে।

তরল ও তৈলাক্ত জিনিস পাক করার নিয়ম

১. নাপাক চর্বি অথবা তেল থেকে সাবান তৈরী করলে সাবান পাক হবে।

২. তেল অথবা ঘি যদি নাপাক হয় তাহলে তেল বা ঘিয়ে সমপরিমাণ পানি

ঢেলে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। পানি শেষ হবার পর পুনরায় ঐ পরিমাণ পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হবে। অথবা তেল বা ঘিয়ের মধ্যে পানি দিতে হবে। পানির উপর তেল বা ঘি এসে যাবে। তখন তা উপর থেকে তুলে নিয়ে আবার পানি ঢালতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হয়ে যাবে।

৩. মধু, সিরাপ বা শরবত যদি নাপাক হয় তাহলে তাতে পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। পানি সরে গেলে আবার পানি দিতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হবে।

৪. যদি নাপাক তেল মাথায় বা শরীরে মালিশ করা হয়, তাহলে শুধু তিনবার ধুলেই মাথা বা শরীর পাক হবে। কোন কিছু দিয়ে তৈলাক্ততা দূর করার দরকার নেই।

জমাট জিনিস পাক করার নিয়ম

১. জমাট হওয়া ঘি, চর্বি অথবা মধু যদি নাপাক হয়, তাহলে নাপাক অংশটুকু বাদ দিলেই পাক হয়ে যাবে।

২. সানা আটা অথবা শুকনো আটা নাপাক হয়ে গেলে নাপাক অংশ তুলে ফেললেই বাকীটা পাক হয়ে যাবে। যেমন সানা আটার উপরে কুকুরে মুখ দিয়েছে, তাহলে সে অংশটুকু ফেলে দিলেই পাক হয়ে যাবে অথবা শুকনো আটায় যদি মুখ দেয় তাহলে তার মুখের লালা যতখানিতে লেগেছে বলে মনে হবে ততখানি আলাদা করে দিলে বাকীটুকু পাক হয়ে যাবে।

৩. সাবানে যদি কোন নাপাক লাগে তাহলে নাপাক অংশ কেটে ফেললেই বাকী অংশ পাক থাকবে।

চামড়া পাক করার নিয়ম

১. দাবাগত (পাকা) করার পর প্রত্যেক চামড়া পাক হয়ে যায়। সে চামড়া হালাল পশুর হোক অথবা হারাম পশুর। হিংস্র পশুর হোক অথবা তৃণভোজী পশুর। কিন্তু শূকরের চামড়া কোনক্রমেই পাক হবে না।

২. হালাল পশুর চামড়া যবেহ করার পরই পাক হয়, তা পাক করার জন্যে দাবাগত করার দরকার হয় না।

৩. যদি শুকরের চর্বি অথবা অন্য কোন নাপাক জিনিস দিয়ে চামড়া পাকা করা হয় তাহলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেই পাক হবে।

শরীর পাক করার নিয়ম

১. শরীরে নাজাসাতে হাকিকী লাগলে তিনবার ধুলেই পাক হবে। যদি বীর্য লাগে এবং শুকে যায় তাহলে তা তুলে ফেললেই শরীর পাক হবে। বীর্য তরল হলে ধুলে পাক হবে।

২. যদি নাপাক রঙে শরীর বা চুল রাঙানো হয়, তাহলে এতটুকু ধুলে যথেষ্ট হবে যাতে পরিষ্কার পানি বেরুতে থাকে। রং তুলে ফেলার দরকার করে না।

৩. শরীরে খোদাই করে যদি তার মধ্যে কোন নাপাক জিনিস ভরে দেয়া হয়, তাহলে তিনবার ধুলেই শরীর পাক হবে ঐ নাপাক জিনিস বের করে ফেলার দরকার নেই।

৪. যদি ক্ষতের মধ্যে কোন নাপাক জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া হয় তারপর ক্ষত ভালো হয়ে গেল, তাহলে ঐ নাপাক জিনিস বের করে ফেলার দরকার নেই। শুধু ধুলেই শরীর পাক হবে। যদি হাড় ভেঙ্গে যায় তার স্থানে যদি নাপাক হাড় বসানো হয়, অথবা ক্ষতস্থান নাপাক জিনিস দিয়ে সিলাই করা হলো, অথবা ভাঙা দাঁত কোন নাপাক জিনিস দিয়ে জমিয়ে দেয়া হলো–এ সকল অবস্থায় সুস্থ হওয়ার পর তিনবার পানি দিয়ে ধুলেই পাক হয়ে যাবে।

৫. শরীরে নাপাক তেল অথবা অন্য কোন তৈলাক্ত কিছু মালিশ করার পর শুধু তিনবার ধুয়ে ফেললেই শরীর পাক হবে। তৈলাক্ততা দূর করার প্রয়োজন নেই।

তাহারাতের ছয়টি কার্যকর মূলনীতি

১. অযথা পরিশ্রম থেকে বাঁচার জন্যে তাহারাতের হুকুমগুলোতে লাঘবতা করা হয়।

অর্থাৎ যে হুকুমগুলো কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত, তাদের মধ্যে কোন সময়ে যদি কোন অসাধারণ অসুবিধা হয়ে পড়ে, তাহলে শরীয়তের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং লাঘব করা হয়। যেমন ধরুন, মাইয়েত ধুয়ে দেবার সময় তার

লাশ থেকে যে পানি পড়ে তা নাপাক। কিন্তু যারা লাশ ধুয়ে দেয় তাদের শরীরে যদি সে পানির ছিটা পড়ে তাহলে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে। কারণ এর থেকে শরীর রক্ষা করা খুব কঠিন।

২. সাধারণত যেসব বিষয়ের সাথে মানুষ জড়িত হয়ে পড়ে তাও অযথা পরিশ্রমের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ যে কাজ সাধারণত সকলেই করে থাকে এবং কিয়াসের দ্বারা তাকে নাপাক বলা হয়, কিন্তু তা পরিহার করা বড়ই কঠিন। এ জন্যে এ বিষয়ে শরীয়তের হুকুম সহজ করা হয়েছে। যেমন ধরুন বৃষ্টির সময় সাধারণত রাস্তায় পানি কাদা হয়ে যায়। তার থেকে নিজেকে বাঁচানো খুব মুশকিল। সে জন্যে কাদা পানির ছিটা কাপড়ে লাগলে তা মাফ করা হয়েছে

৩. যে জিনিস বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয বলা হয়েছে, তা প্রয়োজন হলেই জায়েয হবে। অর্থাৎ যে জিনিস কোন সময়ে কোন বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয করা হয়েছে, তা শুধু সে অবস্থায় জায়েয হবে। অন্য অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে তা জায়েয হবে না।

যেমন, পশুর সাহায্যে শস্য মাড়াবার সময় শস্যের উপর পশু পেশাব করে দিলে প্রয়োজনের খাতিরে তা মাফ এবং শস্য পাক থাকবে। কিন্তু এ সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে শস্যের উপর পেশাব করলে তা নাপাক হবে।

৪. যে নাপাক একবার মিটে গেছে তা পুনরায় ফিরে আসবে না। অর্থাৎ শরীয়তে যে নাপাকি খতম হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয় তা আর পুনরায় হবে না। যেমন কাপড় থেকে শুকনো মণি বা বীর্য ঘষে তুলে ফেললে কাপড় পাক হয়ে যায়। তারপর সে কাপড় পানিতে পড়লে না কাপড় নাপাক হবে, না পানি। এমনি নাপাক মাটি শুকাবার পরে পাক হয়। তারপর ভিজে গেলে সে নাপাকী আর ফিরে আসে না।

৫. বিশ্বাস এবং দৃঢ় ধারণার স্থলে কুসংস্কার ও সন্দেহের কোন মূল্য দেয়া হবে না। অর্থাৎ যে বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাস অথবা দৃঢ় ধারণা আছে যে, তা পাক, তাহলে তা পাকই হবে। শুধু সন্দেহের কারণে তা নাপাক বলা যাবে না।

৬. সাধারণ ভাবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হুকুম দিতে হবে। অর্থাৎ জায়েয নাজায়েয হুকুম দেবার সময় প্রচলিত নিয়ম ও অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন, মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, সকলে খানাপিনাকে নাপাকী থেকে রক্ষা করতে চায়। অতএব অমুসলমানদের

খানাপিনার বস্তুকেও পাক মনে করতে হবে। তা নাপাক বলা তখনই ঠিক হবে যখন কোন প্রকৃত দলীল প্রমাণ দ্বারা তার নাপাক হওয়াটা জানা যাবে।

তাহারাতের হুকুমগুলোতে শরীয়তের সহজকরণ

১. নাজাসাতে গালিযা এক দিরহাম পরিমাণ মাফ। গাঢ় হলে এক দিরহাম ওযন পরিমাণ এবং তরল হলে এক দিরহাম আকারের পরিমাণ। অর্থাৎ এ পরিমাণে শরীর অথবা কাপড়ে নাজাসাতে গালিযা লাগলে যদি তা নিয়ে নামায আদায় করা হয় তবে নামায হয়ে যাবে, দোহরাতে হবে না। অবশ্যি ধুয়ে ফেলার সুযোগ হলে তা করা উত্তম।

২. নাজাসাতে খফিফা যদি শরীর অথবা কাপড়ে লাগে তাহলে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ মাফ।

৩. মাইয়েত গোসল করার সময় গোসলকারীদের যে ছিটা লাগে তা মাফ।

৪. উঠানে মাড়া দেবার সময় পশু পেশাব করলে শস্য পাক থাকে।

৫. পেশাব অথবা অন্য কোন নাজাসাতের সূচের মাথা পরিমাণ ছি'টা কাপড় বা শরীরে লাগলে তা নাপাক হবে না। যারা গৃহপালিত পশু বাড়ীতে প্রতিপালন করে তাদের শরীরে বা কাপড়ে পশুর পেশাব গোবর ইত্যাদি লাগলে তা এক দিরহামের বেশী হলেও মাফ।

৬. বর্ষার সময় যখন রাস্তাঘাটে পানি কাঁদা হয়ে যায় এবং তা থেকে বাঁচা মুশকিল হলে তার ছিটা মাফ।

৭. খাদ্যশস্যের সাথে ইঁদুরের পায়খানা মিশে গেলে এবং তা যদি এমন অল্প পরিমাণ হয় যে, তার কোন প্রভাব আটার মধ্যে অনুভব করা যায় না তাহলে সে আটা পাক। যদি কিছু পরিমাণ ইঁদুরের মল রুটি বা ভাতের সঙ্গে রান্না হয়ে যায় এবং তা যদি গলে না গিয়ে শক্ত থাকে, তাহলে সে খাদ্য পাক থাকবে এবং খাওয়া যেতে পারে।

৮. মানুষের রক্ত শোষণকারী ঐসব প্রাণী যাদের মধ্যে চলাচলকারী রক্ত নেই, যেমন মাছি, মশা, ছারপোকা ইত্যাদি। তারা যদি মানুষের রক্ত পান করে এবং তাদের মারলে যদি শরীরে বা কাপড়ে রক্ত লাগে তাহলে শরীর ও কাপড় নাপাক হবে না।

৯. নাজাসাত আগুনে জ্বালালে তার ধুঁয়া পাক এবং ছাইও পাক। যেমন গোবর জ্বালালে তার ধুঁয়া যদি রুটি বা কোন খাদ্যে লাগে অথবা তার ছাই দিয়ে থালা বাটি মাজা হয় তা জায়েয। কোন কিছু নাপাক হবে না।

১০. নাপাক বিছানায়, চাটাইয়ে, চৌকি অথবা মাটিতে যদি কেউ শয়ন করে আর যদি ভিজা থাকে অথবা নাপাক বিছানা অথবা মাটিতে কেউ ভিজা পা দেয় অথবা নাপাক বিছানার উপর শয়ন করার পর ঘাম আসে এ সকল অবস্থায় যদি শরীরের উপর নাজাসাতের প্রভাব সুস্পষ্ট না হয় তাহলে শরীর পাক থাকবে।

১১. দুধ দোহন করার সময় যদি হঠাৎ দু'এক টুকরা গোবর দুধে পড়ে যায়, গাইয়ের হোক অথবা বাছুরের, তাহলে সংগে সংগে তা তুলে ফেলতে হবে। এ দুধ পাক থাকবে এবং তা ব্যবহার করতে দোষ নেই।

১২. ভিজা কাপড় কোন নাপাক জায়গায় শুকাবার জন্যে দেয়া হয়েছে অথবা এমনিই রাখা হয়েছে, অথবা কেউ নাপাক চৌকির উপর বসে পড়েছে আর তার কাপড় ভিজা ছিল, তাহলে কাপড় নাপাক হবে না। কিন্তু কাপড়ে যদি নাজাসাত অনুভব করা যায় তাহলে পাক থাকবে না।

পাক নাপাকের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. মাছ, মাছি, মশা, ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। শরীর এবং কাপড়ে তা লাগলে নাপাক হবে না।

২. সতরঞ্চি, চাটাই বা এ ধরনের কোন বিছানার এক অংশ নাপাক এবং বাকী অংশ পাক হলে পাক অংশের উপর নামায পড়া ঠিক হবে।

৩. হাত, পা এবং চুলে মেহেদী লাগাবার পর মনে হলো যে মেহেদী নাপাক ছিল। তখন তিন বার ধুয়ে ফেললেই পাক হবে, মেহেদীর রং উঠাবার প্রয়োজন নেই।

৪. চোখে সুরমা অথবা কাজল লাগানোর পর জানা গেল যে, এ নাপাক ছিল। এখন তা মুছে ফেলা বা ধুয়ে ফেলা ওয়াজেব নয়। কিন্তু কিছু পরিমাণ যদি প্রবাহিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তা ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫. কুকুরের লালা নাপাক কিন্তু শরীর নাপাক নয়। কুকুর যদি কারো শরীর অথবা কাপড় ছুঁয়ে দেয় আর যদি তার গা ভিজাও হয়, তথাপি কাপড়

বা শরীর নাপাক হবে না। কিন্তু কুকুরের গায়ে কোন নাপাকী লেগে থাকলে তখন সে ছু'লে কাপড় বা শরীর নাপাক হবে।

৬. এমন মোটা তক্তা যে তা মাঝখান থেকে ফাঁড়া যাবে, তাতে নাজাসাত লাগলে উল্টা দিকের উপর নামায পড়া যাবে।

৭. মানুষের ঘাম পাক সে মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান এবং কোন স্ত্রী লোক হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় হোক না কেন তার ঘাম পাক। ঐ ব্যক্তির ঘামও পাক যার গোসলের দরকার।

৮. নাজাসাত জ্বালায়ে তার ধূঁয়া দিয়ে কোন কিছু রান্না করলে তা পাক হবে। নাজাসাত থেকে উথিত বাষ্পও পাক।

৯. মিশক এবং মৃগনাভি পাক।

১০. ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে যদি শরীর এবং কাপড়ে লাগে তা পাক থাকবে।

১১. হালাল পাখীর আণ্ডা পচে গেলেও পাক থাকে। কাপড় অথবা শরীরে লাগলে তা পাক থাকবে।

১২. যদি কোন কিছু নাপাক হয়ে যায় কিন্তু কোন্ স্থানে নাজাসাত লেগেছে তা স্মরণ নেই, তখন সবটাই ধুয়ে ফেলা উচিত।

১৩. কুকুরের লালা যদি ধাতু নির্মিত বা মাটির বাসনপত্রে লাগে তাহলে তিনবার ভালো করে ধুলে পাক হয়ে যাবে। উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, একবার মাটি দিয়ে মেজে পানি দিয়ে ধুতে হবে এবং দু'বার শুধু পানি দিয়ে ধুতে হবে।

নাজাসাতে হুকমী

নাজাসাতে হুকমী নাপাকীর এমন এক অবস্থা যা দেখা যায় না। শরীয়তের মাধ্যমে তা জানা যায়। যেমন অজুহীন হওয়া, গোসলের প্রয়োজন হওয়া। নাজাসাতে হুকমীকে হাদাসও বলে।

নাজাসাতে হুকমীর প্রকার ভেদ

নাজাসাতে হুকমী বা হাদাস দু'প্রকার ঃ হাদাসে আসগার এবং হাদাসে আকবার।

হাদাসে আসগার

পেশাব পায়খানা করলে, পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হলে, শরীরের কোন অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হলে, মুখ ভরে বমি হলে, ইস্তেহাযার রক্ত বের হলে, ঠেস দিয়ে ঘুমালে যে নাপাকীর অবস্থা হয় তাকে হাদাসে আসগার বলে। এর থেকে পাক হতে হলে অযু করতে হবে। পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার ক্ষতিকারক হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যায়। হাদাসে আসগার অবস্থায় নামায পড়া যাবে না, কুরআন পাক স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু যাদের হাতে সর্বদা কুরআন থাকে এবং বার বার অযু করা মুশকিল অথবা কুরআন পাঠকারী যদি শিশু হয় তাহলে অযু ছাড়া চলতে পারে। বিনা অযুতে অর্থাৎ হাদাসে আসগার অবস্থায় মৌখিক কুরআন পাঠ করা যায়।

হাদাসে আকবার

স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করার পর অথবা যে কোনভাবে কামভাবসহ বীর্য নির্গত হলে, অথবা স্বপ্নে বীর্যপাত হলে এবং হায়েয ও নেফাসের রক্ত বের হলে যে নাপাকীর অবস্থা হয় তাকে বলে হাদাসে আকবার। হাদাসে আকবার থেকে পাক হতে হলে গোসল করতে হয়। গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যায়। হাদাসে আকবারের অবস্থায় নামায পড়া যাবে না, কুরআন পাক স্পর্শ করা যাবে না, মৌখিক কুরআন

তেলাওয়াতও করা যাবে না এবং মসজিদে প্রবেশ করাও যাবে না। কিন্তু অত্যাবশ্যক কারণে মসজিদে যাওয়া যাবে। যেমন গোসলখানার রাস্তা মসজিদের ভেতর দিয়ে, পানির পাত্রের জন্যে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি শরীয়ত দান করে।

হায়েযের বিবরণ

সাবালিকা হওয়ার পর মেয়েদের প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে স্বভাবত যে রক্ত নির্গত হয় তাকে হায়েয বলে। এ রক্ত নাপাক। কাপড় এবং শরীরে লাগলে তা নাপাক হয়ে যাবে।

হায়েয হওয়ার বয়স

হায়েয হওয়ার বয়স কমপক্ষে ন' বছর। ন' বছরের পূর্বে কোন মেয়ের যদি রক্ত আসে তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না। তারপর সাধারণত মেয়েদের পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত হায়েয হয়ে থাকে। পঞ্চান্ন বছরের পর রক্ত এলে তা আবার হায়েয বলা যাবে না। হাঁ, তবে এ বয়সে রক্তের রং যদি গাঢ় লাল হয় অথবা কালচে লাল হয়, তাহলে হায়েয মনে করা হবে।

হায়েযের সময়–কাল

হায়েযের মুদ্দৎ কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত এবং উর্ধে দশ দিন দশ রাত। তিন দিন তিন রাতের কম রক্ত এলে তা হায়েয বলা যাবে না। তেমনি দশদিন দশ রাতের বেশী রক্ত এলে অতিরিক্ত যে রক্ত আসবে তা হায়েযের বলা যাবে না। একে বলা হবে এস্তেহাযার রক্ত যা রোগের কারণে হয়ে থাকে। তার হুকুম হায়েয থেকে পৃথক।

হায়েযের মাসয়ালা

১. হায়েযের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে একেবারে সাদা রঙের ব্যতীত যে রঙের রক্ত আসবে তা লাল, হলুদ, খাকি, সবুজ, কালো যাই হোক না কেন, সব হায়েয বলে গণ্য হবে।

২. যে সব মেয়েদের পঞ্চান্ন বছরের আগেও গাঢ় লাল বর্ণের ছাড়াও সবুজ, খাকি এবং হলুদ বর্ণের রক্ত আসে, তার পঞ্চান্ন বছরের পরেও সবুজ, খাকি এবং হলুদ বর্ণের রক্ত এলে তা হায়েয মনে করতে হবে।

৩. তিন দিন তিন রাতের সময়ের কিছু কম সময় রক্ত এলে তাও হায়েয হবে না। যেমন কোন মেয়ের জুমার দিন সূর্য উঠার সময় রক্ত এলো এবং সোমবার সূর্য উদয় হওয়ার বেশ খানিক পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে অর্থাৎ তিন দিন তিন রাত পূর্ণ হতে কিছু সময় বাকী থাকলো, তাহলে এ রক্ত হায়েযের মনে করা হবে না, বরঞ্চ এস্তেহাযার।

৪. যদি কোন মেয়ের তিন চার দিন রক্ত আসার অভ্যাস রয়েছে। তারপর কোন মাসে তার অধিক দিন এলো, তাহলে তা হায়েয হবে। কিন্তু দশ দিনের কিছু বেশী সময় যদি রক্ত আসে তাহলে যত দিনের অভ্যাস ছিল ততদিন হায়েয মনে করা হবে এবং বাকী দিনগুলো এস্তেহাযা।

৫. দু'হায়েযের মধ্যবর্তী পাক অবস্থার মুদ্দত কমপক্ষে পনেরো দিন এবং বেশী হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। অতএব কোন মেয়ের যদি কয়েক মাস পর্যন্ত অথবা সারা জীবন রক্ত না আসে তাহলে সে পাকই থাকবে। অথবা এক দুই দিন রক্ত এলো তারপর দশ বারো দিন ভালো থাকলো, তারপর এক দুই দিন রক্ত এসে বন্ধ হলো, তাহলে পুরা সময়টা এস্তেহাযা ধরতে হবে।

৬. কোন মেয়েলোকের হায়েযের মুদ্দতের কম সময় অর্থাৎ দু'একদিন রক্ত আসার পর ১৫ দিন সে পাক থাকলো। পরপর আবার দু'একদিন রক্ত এলো। এ ১৫ দিন তো সে পাক থাকবেই তারপর যে রক্ত এলো সেটা হবে এস্তেহাযা।

৭. কারো প্রথম রক্ত দেখা দিল। তারপর কয়েক মাস পর্যন্ত চললো। যে দিন প্রথমে রক্ত দেখা দিল সেদিন থেকে দশ দিন হায়েয, বাকী অতিরিক্ত দিন এস্তেহাযা। এভাবে প্রত্যেক মাসের প্রথম দশ দিন হায়েয এবং বাকী বিশ দিন এস্তেহাযা ধরতে হবে।

৮. কোন মেয়ে লোকের দু'একদিন রক্ত আসার পর ১৫ দিনের কম পাক থাকলো। তারপর আবার রক্ত আসা শুরু হলো। তাহলে এ পাক থাকার কোন বিশ্বাস নেই বরঞ্চ মনে করতে হবে যে, তার রক্ত বরাবর চলতে ছিল। এখন সে মেয়ে লোকের অভ্যাস অনুযায়ী সময়কাল তো হায়েয ধরা হবে আর বাকী সময়টা এস্তেহাযা। আর প্রথম বার তার রক্ত এলে প্রথম দশ দিন হায়েয এবং বাকী সময় এস্তেহাযা ধরতে হবে। যেমন ধরুন, কোন মেয়েলোকের মাসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে হায়েয হওয়ার অভ্যাস। অতপর কোন মাসে একই দিন রক্ত এসে বন্ধ হয়ে গেল, তারপর

চৌদ্দ দিন পাক থাকলো। তারপর ষোল দিনে আবার রক্ত এলো। তাহলে বুঝতে হবে ষোল দিন বরাবর রক্ত এসেছে তাহলে অভ্যাস অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন হায়েয ধরা হবে এবং বাকী তের দিন এস্তেহাযা। যদি চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিন হায়েযের অভ্যাস থাকে, তাহলে এগুলো হায়েযের দিন মনে করতে হবে এবং প্রথম তিন দিন এবং শেষের দশ দিন এস্তেহাযা মনে করতে হবে।

৯. যদি কোন মেয়েলোকের কোন অভ্যাস নির্দিষ্ট নেই। কখনো চার দিন, কখনো সাত দিন, কখনো দশ দিন। তাহলে এসব হায়েয বলে গণ্য হবে। তার যদি আবার দশ দিনের বেশী রক্ত আসে, তাহলে দেখতে হবে গত মাসে কত দিন এসেছিল। ততদিন হায়েয ধরা হবে এবং বাকী দিন এস্তেহাযা।

নেফাসের বিবরণ

বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর স্ত্রীলোকের বিশেষ অংগ থেকে যে রক্ত বের হয় তাকে নেফাস বলে। অবশ্য শর্ত এই যে, বাচ্চা অর্ধেকের বেশীর ভাগ বাইরে আসার পর যে রক্ত বের হয় তাই নেফাস এবং তার পূর্বে যা বেরোয় তা নেফাসের রক্ত নয়।

নেফাসের মুদ্দত

নেফাসের রক্ত আসার মুদ্দত খুব জোর চল্লিশ দিন। আর কমের কোন নির্দিষ্ট মুদ্দত নেই। এটাও হতে পারে যে, মেয়েলোকের নেফাসের রক্ত মোটেই আসবে না।

নেফাসের মাসয়ালা

১. যদি বাচ্চা পয়দা হবার পর কোন মেয়েলোকের মোটেই রক্ত না আসে, তবুও বাচ্চা হওয়ার পর তার গোসল করা ওয়াজেব।

২. নেফাসের মুদ্দতের মধ্যে একেবারে সাদা রং ব্যতীত যে রঙেরই রক্ত আসুক তা নেফাসের রক্ত হবে।

৩. নেফাসের পর হায়েয হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে পাক থাকার সময় কমপক্ষে ১৫ দিন।

৪. গর্ভপাত হওয়ার অবস্থায় বাচ্চার অংগ গঠন হয়ে থাকলে তারপর রক্ত এলে তা হবে নেফাসের রক্ত। কিন্তু বাচ্চা যদি শুধু একটা মাংসপিণ্ড হয় তাহলে যে রক্ত বেরুবে তা নেফাসের হবে না। কিন্তু এতে যদি হায়েযের শর্ত পূরণ হয় তাহলে হায়েয মনে করতে হবে। নতুবা এস্তেহাযা। যেমন ধরুন, তিন দিনের কম রক্ত এলো অথবা পাক থাকার সময় পূর্ণ ১৫ দিন হলো না তাহলে এস্তেহাযা হবে।

৫. যদি কোন মেয়ে মানুষের ৪০ দিনের বেশী রক্ত এলো এবং এ হচ্ছে তার প্রথম বাচ্চা, তাহলে ৪০ দিন নেফাসের এবং বাকী এস্তেহাযার। ৪০ দিন

পর গোসল করে পাক সাফ হয়ে দ্বীনী ফরযগুলো আদায় করবে, রক্ত বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে না, যদি তার প্রথম বাচ্চা না হয় এবং নির্দিষ্ট অভ্যাস জানা যায় তাহলে তার অভ্যাস অনুযায়ী নেফাসের মুদ্দত হবে, বাকী দিনগুলো এস্তেহাযার।

৬. কোন মেয়েলোকের অভ্যাস হয়ে পড়েছে যে, ৩০ দিন নেফাসের রক্ত আসে। কিন্তু কোন বারে ৩০ দিনের পরও রক্ত বন্ধ হলো না ৪০ দিন পুরা হওয়ার পর বন্ধ হলো তাহলে এ ৪০ দিনই তার নেফাস হবে। তারপর রক্ত এলে তা হবে এস্তেহাযার। এ জন্যে ৪০ দিনের পর সংগে সংগেই গোসল করে নামায ইত্যাদি আদায় করবে এবং পূর্বের ১০ দিনের নামায কাযা আদায় করবে।

৭. যদি কারো ৪০ দিন পুরা হবার আগেই রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে ৪০ দিন পুরা হবার অপেক্ষা না করে গোসল করে নামায ইত্যাদি পড়া শুরু করবে। যদি গোসলে কোন ভীষণ ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করে পাক হবে এবং নামায আদায় করবে। নামায কিছুতেই কাযা হতে দিবে না।

হায়েয নেফাসের হুকুম

১. হায়েযের দিনগুলোতে নামায রোযা হারাম। নামায একেবারে মাফ। কিন্তু পাক হওয়ার পর কাযা রোযা রাখতে হবে।

২. হায়েয নেফাসের সময় মেয়েদের জন্যে মসজিদে যাওয়া, কা'বা ঘরের তাওয়াফ করা এবং কুরআন পড়া হারাম।

৩. সিজদায়ে তেলাওয়াত এবং কুরআন স্পর্শ করাও জায়েয নয় অবশ্য জুযদান অথবা রুমালের সাহায্যে কুরআন স্পর্শ করা যায়। পরিধানের কাপড় দিয়েও জায়েয নয়। কুরআনের সাথে সেলাই করা কাপড় দিয়ে স্পর্শ করাও নাজায়েয।

৪. সূরায়ে ফাতেহা দোয়ার নিয়াতে পড়া জায়েয। এমনি দোয়ার নিয়তে দোয়ায়ে কুনুত এবং কুরআনের অন্যান্য দোয়া পড়া জায়েয।

৫. কলেমা পড়া, দরূদ পড়া, আল্লাহ্র যিকির করা, ইস্তেগফার এবং অন্য কোন অযীফা পড়া জায়েয। যেমন যদি কেউ 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' পড়ে তো দোষ নেই।

৬. ঈদগাহে যাওয়া, কোন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া এবং অনিবার্য প্রয়োজনে মসজিদে যাওয়া জায়েয। তবে তায়াম্মুম করে মসজিদে যাওয়া ভালো।

৭. যে মেয়েলোক কাউকে কুরআন শিক্ষা দেয় সে হায়েয অবস্থায় কুরআন শিখাতে পারে। তবে গোটা আয়াত এক নিঃশ্বাসে না পড়ে থেমে থেমে আয়াতকে খণ্ড খণ্ড করে পড়াবে। এ ধরনের মেয়েদের জন্যে এভাবে পড়া জায়েয।

৮. হায়েয নেফাসের সময় স্ত্রী সহবাস হারাম। এ একটি কাজ ব্যতীত অন্য সব জায়েয, যেমন চুমো দেয়া, এক সাথে খানাপিনা করা, এক বিছানায় শুয়ে থাকা ইত্যাদি। কিন্তু এ সময়ে এক বিছানায় থাকা, এক সাথে খানাপিনা করা, চুমো দেয়া, আদর করা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকা মাকরুহ।[১]

৯. কোন মেয়েলোকের ৫ দিন রক্ত আসার অভ্যাস, কিন্তু ৪ দিনের পর রক্ত বন্ধ হলো। এ ধরনের মেয়েদের গোসল করে নামায পড়া ওয়াজেব। অবশ্য ৫ দিন পূরণ হওয়ার পূর্বে স্বামী সহবাস করা যাবে না— হয়তো তারপর রক্ত আসতে পারে।

১০. কারো পুরো ১০ দিন ১০ রাত পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। এ অবস্থায় সে গোসল না করলেও তার সাথে সহবাস জায়েয। এমনি যার ৬ দিনের অভ্যাস আছে এবং তারপর রক্ত বন্ধ হলো। এ অবস্থাতেও তার গোসলের পূর্বে সহবাস জায়েয। কিন্তু নির্দিষ্ট অভ্যাসের পূর্বে রক্ত বন্ধ হলে অভ্যাসের দিনগুলো পূরণ হওয়ার পূর্বে সহবাস জায়েয নয়। সে মেয়েলোক যদি গোসলও করে ফেলে তবুও না।

১১. কোন মেয়ে মানুষের ৬ দিনে রক্ত বন্ধ হওয়ার অভ্যাস। কিন্তু কোন মাসে এমন হলো যে, ৬ দিন পুরো হয়ে গেল কিন্তু রক্ত বন্ধ হলো না, তাহলে সে গোসল করে নামায পড়বে না, বরঞ্চ রক্ত বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। তারপর ১০ দিন পুরো হওয়ার পর অথবা তার আগে র... বন্ধ হলে এ পুরো সময়টা হায়েয বলে গণ্য হবে। কিন্তু ১০ দি... পরও

১. মাকরুহ হওয়ার কারণ এই যে, নবী (সঃ) তাঁর বিবিগণের হায়েযের অবস্থ... তাঁদের সাথে মেলামেশা করতেন। আর একটা কারণ এই যে, ইহুদীরা হায়ে... সময় তাদের বিবিদেরকে অচ্ছুৎ বানিয়ে রাখতো। সে জন্যে মুসলমানদেরকে ইহুদীদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তাহলে হায়েযের মুদ্দত ঐ ৬ দিনই থাকবে। বাকী দিনগুলো এস্তেহাযার মধ্যে শামিল হবে।

১২. যে মেয়েলোক রমযান মাসে দিনের বেলায় পাক হলো, তার জন্যে দিনের বাকী অংশে খানাপিনা থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব। সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদারদের মতো কাটাবে এবং ঐ দিনের রোযা কাযা করবে।

১৩. কোন মেয়েলোক পাক থাকা অবস্থায় তার নির্দিষ্ট স্থানে কাপড়ের টুকরা গুঁজে রেখে শুয়ে পড়লো। অতপর সকালে দেখলো যে সে কাপড়ে রক্তের দাগ। এ অবস্থায় যখন রক্তের দাগ দেখা গেল তখন থেকে হায়েযের সূচনা ধরতে হবে।

এস্তেহাযার বিবরণ

এস্তেহাযা এমন এক প্রবাহিত রক্ত যা না হায়েযের আর না নেফাসের, বরঞ্চ রোগের কারণে বের হয়। এ এমন রক্ত যেমন কারো নাকশিরা ফেটে রক্ত বেরুতে থাকে এবং বন্ধ হয় না।

এস্তেহাযার অবস্থা

১. ন'বছর বয়সের কম বালিকার যে রক্ত আসে তা এস্তেহাযা এবং ৫৫ বছরের বেশী বয়সের মেয়ে মানুষের যে রক্ত আসে তাও এস্তেহাযা। কিন্তু শেষোক্ত বেলায় রক্তের রং যদি গাঢ় লাল অথবা কালচে লাল হয় তাহলে হায়েয মনে করতে হবে।

২. গর্ভবতী মেয়েদের যে রক্ত আসে তা এস্তেহাযা।

৩. তিন দিন তিন রাতের কম যে রক্ত আসে তা এস্তেহাযা এবং এমনি ১০ দিন ১০ রাতের পর যে রক্ত তা এস্তেহাযা।

৪. যে মেয়েলোকের হায়েযের মুদ্দত তার অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট, তার এ নির্দিষ্ট মুদ্দতের পর রক্ত এলে এ অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্ত এস্তেহাযা। তবে ঐ অবস্থায় যখন রক্ত দশ দিনের পরও চলতে থাকে।

৫. কোন মেয়েলোকের ১০ দিন হায়েয থাকার পর বন্ধ হলো তারপর ১৫ দিনের পূর্বেই আবার রক্ত আসা শুরু হলো। তাহলে এ হবে এস্তেহাযার রক্ত। কারণ দু'হায়েযের মধ্যে পাক থাকার সময় কমপক্ষে ১৫ দিন।

৬. চল্লিশ দিন নেফাসের রক্ত আসার পর বন্ধ হলো। তারপর ১৫ দিনের কম বন্ধ থেকে পুনরায় শুরু হলো। এই দ্বিতীয় রক্ত এস্তেহাযার। কেননা নেফাস বন্ধ হওয়ার পর হায়েয আসার জন্যে মাঝে অন্ততপক্ষে ১৫ দিন দরকার।

৭. বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর কোন মেয়েলোকের ৪০ দিনের বেশী রক্ত এলো। যদি তার প্রথম বাচ্চা হয় এবং কোন অভ্যাস নির্দিষ্ট না থাকে তাহলে ৪০ দিনের বেশী যতো দিন রক্ত আসবে তা হবে এস্তেহাযা। কিন্তু যদি

নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট অভ্যাসের অতিরিক্ত যত দিন রক্ত আসবে তা এস্তেহাযা হবে।

এস্তেহাযার হুকুম

যেসব মেয়েলোকের এস্তেহাযা হয় তাদের হুকুম ঐসব রোগীদের মতো যাদের নাকশিরা ফেটে রক্ত ঝরা শুরু হয় এবং বন্ধ হয় না। অথবা এমন ক্ষত যা থেকে সর্বদা রক্ত ঝরে অথবা পেশাবের রোগ যার কারণে সব সময় টপটপ করে পেশাব বের হয়। এস্তেহাযাওয়ালী মেয়েদের হুকুম নিম্নরূপ ঃ

১. এস্তেহাযার সময় নামায পড়া জরুরী। নামায কাযা করার অনুমতি নেই। রোযাও ছাড়তে পারবে না।

২. এস্তেহাযার সময় সহবাস জায়েয। এস্তেহাযা হওয়াতে মেয়েলোকের গোসল ফরয নয়।

৩. অযু করলেই পাক হবে।

৪. এ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত, মসজিদে প্রবেশ সব জায়েয।

৫. এ সব মেয়েলোক এক অযুতে একাধিক নামায পড়তে পারবে না। প্রত্যেক বারে নতুন অযু করতে হবে।

প্রদর

এ রোগে মেয়েলোকের বিশেষ অংগ থেকে সাদা অথবা হলুদ তরল পদার্থ অনবরত বেরুতে থাকে। তার হুকুমও ঠিক এস্তেহাযার মত। এসব মেয়েরা নামাযও পড়বে, রোযাও রাখবে। কুরআন তেলাওয়াতও করবে। অবশ্য প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গুপ্তাংগ ভালো করে ধুয়ে নেবে এবং তাজা অযু করে নামায পড়বে।

পানির বিবরণ

তাহারাত (পবিত্রতা) শুধু সেই পানি দ্বারা হতে পারে যা স্বয়ং পাক। নাপাক পানি দ্বারা না অযু-গোসল হতে পারে আর না কোন নাপাক জিনিস পাক হতে পারে। বরঞ্চ এর দ্বারা পাক জিনিসই নাপাক হয়ে যায়। এ জন্যে পানি পাক-নাপাক হওয়ার হুকুম ও মাসয়ালা ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার যাতে করে নিশ্চয়তা এবং নিশ্চিন্ততা সহকারে তাহারাত অর্জন করা যায়।

পানির প্রকার

বুনিয়াদীভাবে পানি দুই প্রকারের ঃ পাক ও নাপাক।

পাক পানি

পবিত্রতা অর্জনের দিক দিয়ে পাক পানি চার রকমের ঃ

১. **তাহের মুতাহহের গায়ের মাকরুহ ঃ** অর্থাৎ এমন পাক পানি যার দ্বারা কোন কেরাহাত (ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার ভাব) ব্যতিরেকে নিশ্চিন্ত মনে অযু-গোসল করা যায়। যেমন বৃষ্টির পানি, নদী, সমুদ্র, পুকুর, নালা, ঝর্ণা, কূপ, টিউবওয়েল প্রভৃতির পানি। সে পানি মিঠা হোক অথবা লোনা, শিশির অথবা বরফ পানি হোক কোন প্রকার কেরাহাত ব্যতিরেকে এ সব পানি দিয়ে অযু ও গোসল করা যাবে।

২. **তাহের মুতাহহের মাকরুহ ঃ** এটা এমন পানি যার দ্বারা অযু ও গোসল করা মাকরুহ। যেমন কোন ছোট শিশু পানিতে হাত দিয়েছে। তার হাত যে নাপাক ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে সন্দেহ হয়। অথবা বিড়াল বা এমন কোন প্রাণী মুখ লাগিয়েছে যার ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট মাকরুহ। অতএব এমন পানিতে অযু-গোসল মাকরুহ হবে।

৩. **তাহের গায়ের মুতাহহের ঃ** এমন পাক পানি-যার দ্বারা অযু ও গোসল জায়েয নয় যেমন, মায়ে মুস্তামাল অর্থাৎ এমন পানি যা দিয়ে কেউ অযু করেছে অথবা গোসল ফরয এমন ব্যক্তি গোসল করেছে কিন্তু শরীরে

কোন নাজাসাত লাগা নেই। এমন পানি যদি শরীর এবং কাপড়ে লাগে তাহলে নাপাক হবে না। কিন্তু এ পানি দিয়ে অযু গোসল হবে না।

৪. **মশকুক ঃ** অর্থাৎ এমন পানি যা দিয়ে অযু–গোসল জায়েয হওয়া না হওয়া বিষয়ে সন্দেহ আছে। যেমন, যে পানিতে গাধা বা খচ্চর মুখ দিয়েছে। সে পানির হুকুম এই যে, এ পানি দিয়ে অযু করার পর তায়াম্মুমও করতে হবে।

মায়ে নাজাসাত (নাপাক পানি)

১. **নাপাক পানির অবস্থা ঃ** প্রবাহমান পানিতে নাজাসাত পড়ে অবস্থা এমন সৃষ্টি করলো যে, পানির রং গন্ধ এবং স্বাদ বদলে দিল।

২. **কাসীর রাকেদ ঃ** আবদ্ধ অনেক পানি। কিন্তু ময়লা (নাজাসাত) পড়ার কারণে সব দিকের পানি রং গন্ধ এবং স্বাদ বদলে গেছে।

৩. **কালীল রাকেদ ঃ** অল্প আবদ্ধ পানি। তাতে যদি সামান্য নাজাসাত পড়ে এবং তার দ্বারা পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদে কোন পরিবর্তন না আসে, তথাপি সে পানি দিয়ে অযু–গোসল হবে না এবং কোন নাপাক জিনিস পাক করা যাবে না।

পানির ব্যাপারে ছয়টি কার্যকর মূলনীতি

১. পানি প্রকৃতপক্ষে পাক। অর্থাৎ মৌলিক দিক দিয়ে পাক। এ জন্যে যতোক্ষণ পর্যন্ত তার নাপাক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া না যাবে, ততোক্ষণ তা পাক বলতে হবে। যেমন ধরুন বনের মধ্যে কোন গর্তে পানি রয়েছে তা পাক। তবে যদি কোন যুক্তি প্রমাণে তা নাপাক হওয়া নিশ্চিত হয় তাহলে নাপাক মনে করতে হবে।

২. সন্দেহের কারণে নিশ্চিত বিষয় পরিত্যাগ করা যাবে না। যেমন ধরুন, কোন ঘরে পানি রাখা আছে। সেখান থেকে কুকুর বেরুতে দেখা গেল। এখন সন্দেহ হয় যে, হয়তো কুকুর তাতে মুখ দিয়েছে। অথবা কুকুরকে মুখ দিতে দেখা যায়নি, আর না কোন অবস্থাগত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুকুর পানিতে মুখ দিয়েছে। এমন অবস্থায় পানি পাক মনে করতে হবে। কারণ তার পাক হওয়াটা নিশ্চিত। নাপাক হওয়ার শুধু সন্দেহ হয়। সন্দেহের কারণে নিশ্চয়তা দূর হয় না।

৩. কঠিন অবস্থায় হুকুম লাঘব হয়। যেমন ধরুন পাখীর পায়খানা নাপাক। এখন কূপকে তার থেকে রক্ষা করা বড়ো কঠিন এ জন্যে হুকুম এই যে, পাখীর পায়খানাতে কূপের পানি নাপাক হয় না।

৪. অনিবার্য প্রয়োজনে নাজায়েয জিনিসও জায়েয হয়ে যায়। যেমন কোন সময়ে পিপাসায় প্রাণ যায় যায়। পাক পানি পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু নাপাক পানি পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় নাপাক পানি পান করা জায়েয।

৫. শরীয়তের হুকুম লাগাবার সময় অধিক বস্তুর উপর নির্ভর করতে হবে। যেমন ধরুন কোন পাত্রে পাককারী পানি এবং ব্যবহৃত পাক পানি মিশ্রিত হয়েছে। তার মধ্যে যার পরিমাণ বেশী হবে তার উপরে হুকুম হবে। যদি মুতাহহের পানি বেশী হয় তাহলে সমস্ত পানি মুতাহহের মনে করতে হবে। তা দিয়ে অযু গোসল জায়েয হবে। আর যদি মুস্তামাল (ব্যবহৃত) পানি বেশী হয় তাহলে সমস্তটাই মুস্তামাল মনে করতে হবে। তা দিয়ে অযু গোসল জায়েয হবে না।

৬. কোন নতুন বিষয় জানা গেলে, যখন তা জানা যাবে তখন থেকে মানতে হবে। যেমন ধরুন কোন কূপে মৃত ইঁদুর দেখতে পাওয়া গেল। এখন হুকুম

এই যে, যখনই দেখা যাবে তখন থেকে কূপের পানি নাপাক মনে করতে হবে। তার পূর্বে যদি ঐ পানি দিয়ে অযু গোসল করা হয়ে থাকে তাহলে তা জায়েয মনে করতে হবে।

পানির মাসয়ালা

পানি—যা দিয়ে তাহারাত দুরস্ত

১. বর্ষার পানি, নদী, সমুদ্র, পুকুর, ঝর্ণা, কূপ, টিউবওয়েল প্রভৃতির পানি, মিঠা হোক অথবা লোনা এবং এমনি শিশির, বরফ ও বরফগলা পানি পাক। এ সবের প্রত্যেক ধরনের পানি দিয়ে বিনা দ্বিধায় অযু গোসল করা জায়েয।

২. গোবর, পায়খানা প্রভৃতি দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে পানি গরম করলে তা পাক থাকবে এবং তা দিয়ে অযু গোসল করা দুরস্ত হবে।

৩. কোন পুকুর, হাউজ অথবা গর্তে বহুদিন ধরে পানি আবদ্ধ রয়েছে, অথবা পাত্রে বহুদিন যাবত পানি রাখা আছে, এ কারণে তার রং, গন্ধ অথবা স্বাদ বদলে গেছে, তথাপিও পানি পাক এবং তা দিয়ে বিনা দ্বিধায় তাহারাত হাসিল করা যাবে।

৪. বনে জংগলে ছোট বড় গর্তে যে পানি জমা হয় তা পাক। বিনা কেরাহাতে তা দিয়ে তাহারাত হাসিল করা যায়। তবে কোন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা যদি নাপাক হওয়া নিশ্চিত হয় অথবা প্রবল ধারণা জন্মে তাহলে তা দিয়ে অযু-গোসল করা ঠিক হবে না।

৫. পথের মধ্যে লোকে ঘড়া ও মটকাতে পানি রেখে দেয় যা থেকে ছোট, বড়ো, নগরবাসী, গ্রামবাসী সকলে পানি পান করে। এ ব্যাপারে পুরাপুরি সতর্কতাও অবলম্বন করা হয় না। এ পানি পাক এবং তার দ্বারা অযু-গোসল করা যাবে। তবে কোন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা নাপাক হওয়া সাব্যস্ত হলে অন্য কথা।

৬. ছোটো শিশু যদি পানির মধ্যে হাত দেয় এবং তার হাত নাপাক হওয়া সম্পর্কে না নিশ্চিত হওয়া যায় আর না সন্দেহ হয় কিন্তু যেহেতু শিশুরা সাবধানতা অবলম্বন করে না বলে মনে হয় যে, হয়তো তার হাতে নাজাসাত লেগেছিল, এমন অবস্থায় এ পানির হুকুম এই যে, তা পাক এবং তা দিয়ে অযু-গোসল দুরস্ত হবে।

৭. অমুসলমানদের পাত্রের পানি পাক। কেননা সাধারণত সকলেই নাজাসাত থেকে দূরে থাকতে চায়। তবে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তা নাপাক প্রমাণিত হলে তার দ্বারা অযু গোসল দুরস্ত হবে না।

৮. পানির মধ্যে যদি পাক জিনিস পড়ে যায় এবং তার দ্বারা পানির রং অথবা গন্ধ অথবা স্বাদ বদলে যায়, শর্ত এই যে, ঐ জিনিস পানির মধ্যে দিয়ে জাল দেয়া হয়নি আর না তার দ্বারা পানি গাঢ় হয়েছে যেমন স্রোতের পানির সাথে বালু মিশানো রয়েছে। অথবা জাফরান পড়ে পানিতে তার কিছুটা রং এসে গেল, অথবা সাবান প্রভৃতি গলে গেল অথবা এ ধরনের আর কোন পাক জিনিস পড়ে গেল, এ সকল অবস্থাতে পানি পাক থাকবে এবং তা দিয়ে অযু গোসল জায়েয।

৯. ঐসব কূপ, যার থেকে বিভিন্ন রকমের লোক পানি নেয় এবং তাদের হাত-পা, বালতি বদনা প্রভৃতি অপরিষ্কার থাকে, ধূলাবালিতে ভর্তি থাকে তবুও ঐসব কূপের পানি পাক। অবশ্যি যারা পানি নেয় তাদের হাত-পা বা পাত্র নাপাক হওয়ার যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তা অন্য কথা।

১০. গাছের পাতা পড়ার কারণে পানির তিনটি গুণ অথবা কোন একটি বদলে গেলেও পানি পাক থাকে। তা দিয়ে অযু গোসল দুরস্ত।

১১. কাপড় অথবা শরীর পরিষ্কার করার জন্যে অথবা পানি পরিষ্কার করার জন্যে সাবান, কুলপাতা অথবা অন্য এমন কোন কিছু দিয়ে পানি জ্বাল দেয়া হলো এবং তাতে পানি গাঢ় না হয়ে তরলই থাকলো, তাহলে তা দিয়ে অযু গোসল সবই দূরস্ত হবে যদিও তার রং, গন্ধ এবং স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়।

১২. যে পানিতে পাক পাত্র, চাউল, তরিতরকারী প্রভৃতি ধোয়া হয় অথবা পাক কাপড় চুবড়ানো হয় এবং তাতে পানির একটি গুণই বদলে যায় অথবা কিছুই বদলায় না, এমন অবস্থায় সে পানি দিয়ে অযু গোসল দুরস্ত হবে।

১৩. শূকর এবং কুকুর ছাড়া অন্য কোন জীবিত পশুকে যে পানিতে গোসল করানো হয়, আর যদি পশুর গায়ে কোন নাপাকী লেগে না থাকে এবং তার মুখের লালা পানিতে না লাগে, তাহলে সে পানি পাক। এমনি কোন পানিতে শূকর এবং কুকুর ছাড়া কোন পশু নেমে পড়ে বা গোসল করে এবং তার শরীরে কোন নাপাকী না থাকে, তাহলে সে পানি পাক। শর্ত

এই যে, পশুর মুখ উপর দিকে থাকে এবং লালা পানিতে না পড়ে। ঘোড়া এবং অন্য কোন পশু যার গোশত হালাল তার লালা পানিতে পড়লেও পানি পাক থাকবে। তা দিয়ে নিসন্দেহে অযু-গোসল করা যায়।

১৪. যদি পানিতে কিছু পরিমাণ দুধ পড়ে যায় এবং তাতে পানির রং কিছুটা পরিবর্তন হোক বা না হোক তা দিয়ে বিনা দ্বিধায় অযু-গোসল করা যাবে।

১৫. স্রোতের পানি নাপাক হওয়ার পর নাপাকীর প্রভাব যখনই নষ্ট হবে, তখন পুনরায় সে পানি পাক হবে। তা দিয়ে তাহারাত করা যাবে।

১৬. রক্ত চলাচল করে না এমন জীব মাছি, মশা, ভোমর প্রভৃতি পানিতে পড়ে মরে গেলে অথবা মরে পানিতে পড়লে সে পানি পাক থাকবে এবং তা দিয়ে অযু-গোসল করা যাবে।

১৭. পানির জীব যদি পানিতে মরে, যেমন মাছ, কাঁকড়া, কাছিম, ব্যাঙ প্রভৃতি তাহলে পানি পাক থাকবে। বিনা কেরাহাতে তা দিয়ে তাহারাত হাসিল করা যায়।

বিঃ দ্রঃ–স্থলের এবং পানির ব্যাঙ সম্পর্কে একই হুকুম। তবে স্থলের ব্যাঙের মধ্যে রক্ত হলে এবং তা পানিতে মরলে পানি নাপাক হবে।

এমন পানি যা দিয়ে তাহারাত দুরস্ত নয়

১. অল্প বদ্ধ পানিতে পেশাব, রক্ত অথবা মদের এক ফোঁটা পড়লে অথবা অন্য কোন নাজাসাত সামান্য পরিমাণে পড়লে অথবা রতি পরিমাণ পায়খানা পড়লে সমস্ত পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাতে পানির রং, স্বাদ ও গন্ধ বদলাক না-বদলাক তা দিয়ে তাহারাত দুরস্ত হবে না।

২. রক্ত চলাচল করে এমন জীব যদি অল্প পানিতে পড়ে মরে অথবা মরে পড়ে তাহলে পানি নাপাক হবে এবং রক্ত চলাচল করে না এমন জীবের মধ্যে যে সব মানুষের রক্ত চুষে (যেমন জোঁক, বড়ো মাছি, বড়ো ছারপোকা) সেগুলো মরে গেলে তাতে পানি নাপাক হবে। যে ব্যাঙের রক্ত হয় তা পানিতে মরলে পানি নাপাক হবে এবং তা দিয়ে তাহারাত দুরস্ত হবে না।

৩. পায়খানা এবং গোবরে যে পোকা হয় তা অল্প পানিতে মরলে পানি নাপাক হবে।

৪. কোন হাউজে অল্প পানিতে নাজাসাত ছিল। তারপর তাতে পানি ঢেলে দিয়ে অনেক বেশী করা হলো। তথাপি সব পানি নাপাক হবে–তাহারাত দুরুস্ত হবে না।

৫. যে পানিতে অন্য কিছু মিশানো হয় অথবা পাকানো হয়, তারপর তাকে আর সাধারণত পানি বলা হয় না। (যেমন শরবত, শিরা, শুররা, ছাতু প্রভৃতি), তা দিয়ে অযু-গোসল দুরুস্ত হবে না।

৬. যে সব প্রবহমান ও তরল বস্তুকে পানি বলা হয় না, তা দিয়ে অযু গোসল জায়েয নয় যেমন আখের রস, কেওড়া, গোলাব, সির্কা প্রভৃতি। এমনি ফলের আরক, ফলের পানি প্রভৃতি দিয়েও অযু-গোসল হবে না। যেমন লেবু-কমলার রস বা আরক, তরমুজ ও নারিকেলের পানি ইত্যাদি।

৭. যদি পানিতে কোন পাক জিনিস দিয়ে জ্বাল দেয়া হয় এবং তাকে সাধা-রণত পানি বলা হলেও তা কিছুটা গাঢ় হয় তা দিয়েও অযু-গোসল করা যাবে না।

৮. পানিতে দুধ অথবা জাফরান পড়ার পর ভালোবাবে দুধ বা জাফরানের রং হয়ে গেল। তা দিয়ে অযু-গোসল হবে।

৯. এমন কোন জীব পানিতে মরলো অথবা মরে পানিতে পড়লো যা পানির জীব নয় কিন্তু পানিতে থাকে, যেমন হাঁস। তাহলে সে পানি দিয়ে অযু-গোসল হবে না।

১০. মায়ে মুস্তামাল (ব্যবহৃত পানি) যদিও পাক, অর্থাৎ তা গায়ে বা কাপড়ে লাগলে তা নাপাক হবে না, কিন্তু তা দিয়ে অযু-গোসল জায়েয নয়। এ জন্যে যে, সে নিজে পাক হলেও অপরকে পাক করতে পারে না।

১১. পাক পানিতে ব্যবহৃত পানি মিশে গেল এবং ব্যবহৃত পানির পরিমাণ বেশী হলো, তখন সমস্ত পানিই ব্যবহৃত পানিতে গণ্য হবে এবং তা দিয়ে অযু-গোসল হবে না।

এমন পানি যা দিয়ে তাহারাত মাকরুহ

১. রোদে যে পানি গরম হয়, তা দিয়ে অযু-গোসল মাকরুহ হয়। এর থেকে শরীরে কুষ্ঠের সাদা দাগ হতে পারে।

২. অল্প পানিতে মানুষের থুথু, কাশি পড়লে তা দিয়ে অযু-গোসল মাকরুহ হবে।

৩. কোন অমুসলিম (যার পাক নাপাকের অনুভূতি নেই) যদি পাক পানিতে হাত দেয় কিন্তু হাতে নাপাকী থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, শুধু সন্দেহ হয় যে, যেহেতু সাধারণত অমুসলিম পাক নাপাকির অনুভূতি রাখে না, সে জন্যে হয়ত তার হাত নাপাক ছিল, এমন অবস্থায় সে পানি দিয়ে অযু-গোসল করা মাকরুহ হবে।

৪. অযু নেই এমন ব্যক্তির যমযমের পানিতে অযু না করা উচিত এবং এমন ব্যক্তির সে পানিতে গোসল করা উচিত নয় যার গোসল করা ফরয। এ পানি দিয়ে নাপাক ধোয়া এবং এস্তেঞ্জা করা মাকরুহ।

৫. যে স্থানে কোন জাতির উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়েছে, সে স্থানের পানিতে অযু-গোসল করা মাকরুহ।

৬. বিড়াল, ইঁদুর এবং হারাম পাখীর ঝুটা পানিতে অযু-গোসল মাকরুহ।

৭. গাধা এবং খচ্চরের ঝুটা পানিতে অযু-গোসল করা সন্দেহযুক্ত। কারণ পাক নাপাক কোনটাই নিশ্চিত করে বলা যায় না। সে জন্যে এ পানিতে অযু-গোসলের পর তায়াম্মুম করতে হবে।

ঝুটা পানি প্রভৃতির মাসয়ালা

১. মানুষের ঝুটা পাক। মুসলমান হোক কিংবা অমুসলমান, দ্বীনদার হোক অথবা বদকার নারী হোক অথবা পুরুষ, জানাবাত অবস্থায় হোক কিংবা হায়েয নেফাস অবস্থায় হোক, সকল অবস্থায় তাদের ঝুটা পাক। অবশ্যি শারাব এবং অন্য কোন নাপাক জিনিস খাওয়ার পর পরই পানি ঝুটা করলে তা নাপাক হবে।

২. হালাল প্রাণীর ঝুটা পাক, পাখী হোক অথবা তৃণভোজী পশু হোক। যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, হরিণ, ঘুঘু, কবুতর ইত্যাদি। ঘোড়ার ঝুটাও পাক।

৩. রক্ত চলাচল করে না এমন প্রাণীর ঝুটাও পাক তা হারাম হোক বা হালাল হোক। পানির জীবের ঝুটাও পাক, তা হালাল হোক বা হারাম হোক। তবে নাজাসাত খাওয়ার পর পরই পানি ঝুটা করলে তা নাপাক হবে। তার দ্বারা তাহারাত জায়েয হবে না।

৪. হারাম প্রাণী যা সাধারণত ঘরে বাস করে যেমন ইঁদুর, বিড়াল এবং ঐসব পাখী যা হারাম অথবা ঐসব ছোট্ট প্রাণী যা ছুটাছুটি করে এবং ইচ্ছা করে খায়, যেমন মুরগী, হাঁস প্রভৃতি তাদের ঝুটা মাকরুহ। মুরগী বাঁধা থাকলে তার ঝুটা পাক। বিড়াল ইঁদুর খাওয়ার পর পরই পানি ঝুটা করলে তা নাপাক হবে।

৫. শূকর, কুকুর এবং সকল প্রকার হিংস্র জীবের ঝুটা নাপাক। যেমন বাঘ, ভালুক, বাঁদর, শকুন প্রৃতির ঝুটা নাপাক

৬. বনে বাসকারী হারাম পশু, যেমন হাতী, গণ্ডার প্রভৃতির ঝুটাও নাপাক।

৭. দুধ, দৈ, ছালন প্রভৃতিতে বিড়াল মুখ দিলে তা খাওয়া জায়েয।

৮. গাধা ও খচ্চরের ঝুটা সন্দেহযুক্ত। তার দ্বারা অযু গোসলও সন্দেহযুক্ত হবে। এমন পানিতে অযু করার পর তায়াম্মুম করতে হবে।

৯. শিকারী পাখীর ঝুটা মাকরুহ। যেমন শ্যেন, বাজপাখী ইত্যাদি।

১০. ইঁদুর রুটি, বিস্কুট খানিকটা কেটে ফেলেছে। ঐ অংশটুকু কেটে ফেলে দিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

১১. যেসব জীবের ঝুটা নাপাক তাদের ঘামও নাপাক। যাদের ঝুটা মাকরুহ তাদের ঘামও মাকরুহ।

১২. পর পুরুষের ঝুটা খানাপিনা নারীদের জন্যে মাকরুহ।

কূপের মাসয়ালা ও হুকুম

কূপের পানি পাক করার বিস্তারিত হুকুম

কূপের মাসয়ালা এবং তা পাক করার নিয়ম-পদ্ধতি ও হুকুম-আহকাম বুঝতে হলে নিম্নের সাতটি বিস্তারিত হুকুম মনে রাখতে হবে ঃ

১. কূপের সমস্ত পানি নাপাক হলে তা পাক করার জন্যে সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। সমস্ত পানি তুলে ফেলার অর্থ এই যে, তাতে বালতি ফেললে যেন আধ বালতি পানিও না উঠে। এত পানি তুলে ফেলার পর কূপের সিঁড়ি, রশি, বালতি সবই পাক হয়ে যায়। আর যে কূপের সব পানি উঠানো সম্ভব নয়, তার থেকে তিনশো বালতি পানি উঠাতে হবে এবং তাতে কূপের পানি পাক হয়ে যাবে।

২. যে অবস্থায় কূপ পাক থাকে এবং অল্প পানিও তুলে ফেলার প্রয়োজন হয় না এমন অবস্থায় যদি কেউ তার মনে আশ্বস্তির জন্যে কোন সময়ে কূপ থেকে বিশ বাইশ বালতি পানি তুলে ফেলতে চায় তো তা শরীয়তের খেলাপ হবে না এবং এতে কোন দোষ নেই।

৩. কূপ নাপাক হওয়ার সময় নিশ্চিত করে যদি জানা না যায় এবং জানার কোন সূত্রও পাওয়া না যায় তাহলে যখনই নাজাসাত দেখা যাবে তখন থেকেই নাপাক বলতে হবে। আর যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়, যেমন কোন একটি জীব মরে ফুলে পচে উঠেছে তাহলে নিশ্চিত ধারণা এই করা হবে যে, কদিন পূর্বেই কুয়াতে পড়ে মরেছে। তার জন্যে তিন দিন তিন রাতের নামায পুনরায় আদায় করতে হবে এবং যেসব থালা ঘটিবাটি এবং কাপড় চোপড় ঐ পানিতে ধোয়া হয়েছে তা পুনরায় পাক করতে হবে। আর যা সংশোধন করা যাবে না তার জন্যে দুঃখ করার দরকার নেই।

৪. যে কূপে যে বালতি বা ডোল ব্যবহার করা হয় সে কূপ পাক করার জন্যে সেই বালতির হিসাবই ধরতে হবে। যদি যথা সময়ে কোন বেশী বড়ো অথবা বেশী ছোট বালতি দিয়ে পানি তোলা হয় তাহলে মাঝারি ধরনের

বালতির হিসাব ধরতে হবে। যত পানি তুলে ফেলার হুকুম, তা যদি কোন পাইপ দিয়ে বা অন্য উপায়ে উঠানো হয় তাতেও কূপ পাক হয়ে যাবে।

৫. কূপ পাক করার জন্যে সমস্ত পানি একেবারে উঠানো হোক অথবা থেমে থেমে উঠানো হোক, উভয় অবস্থাতেই কূপ পাক হবে।

৬. যে জিনিস কূপে পড়ার জন্যে পানি নাপাক হয়েছে তা যদি স্বয়ং নাপাক হয়, যেমন মরা ইঁদুর, বিড়াল প্রভৃতি। তাহলে প্রথমে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং পরে হুকুম মুতাবিক পানি উঠাতে হবে। আর সে মৃত প্রাণী না উঠিয়ে কূপের যতো পানিই উঠানো হোক তাতে কূপ পাক হবে না। আর যদি এ বিশ্বাস হয় যে, প্রাণীটি মরে পঁচে একেবারে মাটি হয়ে গেছে তাহলে তা উঠাবার দরকার নেই, হুকুম মুতাবিক পানি উঠালেই কূপ পাক হবে।

৭. যদি কূপের মধ্যে এমন জিনিস পড়ে যা স্বয়ং পাক, কিন্তু তাতে নাজাসাত ছিল, যেমন ফুটবল, জুতা, কাপড় ইত্যাদি, তাহলে তা উঠিয়ে ফেলা কূপ পাক হওয়ার শর্ত নয় শুধু হুকুম মুতাবিক পানি উঠালেই চলবে।

যে নাপাকির জন্যে সমুদয় পানি তুলে ফেলতে হবে

১. কূপের মধ্যে যে কোন নাজাসাত পড়ুক, তা খফিফা হোক বা গালিযা অল্প হোক অথবা বেশী, সমস্ত পানি নাপাক হয়ে যাবে এবং সমস্ত পানি তুলে ফেলা জরুরী হবে। যেমন মানুষের পেশাব পায়খানা পড়লে অথবা গরু–মহিষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির পেশাব পায়খানা অথবা রক্ত এবং মদের ফোটা যদি পড়ে তাহলে এর যে কোন অবস্থাতে কূপ নাপাক হয়ে যাবে।

২. কূপে যদি শূকর পড়ে–তা জীবিত হোক বা মৃত–সমস্ত পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ জন্যে যে শূকরের শরীর পেশাব পায়খানার মত নাপাক।

৩. যদি মানুষ কূপে পড়ে মরে যায় সে মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান, সব পানি নাপাক হয়ে যাবে। ঠিক এমনি মরার পরে যদি কূপে পড়ে যায় তা সে বাচ্চা হোক বা বয়স্ক হোক সব পানি নাপাক হবে।

৪. কুকুর, ছাগল অথবা তার চেয়ে বড় পশু, যেমন গরু, মহিষ, উট, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি কূপে পড়ে মরলে সমস্ত পানি নাপাক হবে।

৫. রক্ত চলাচল করে এমন কোন প্রাণী আহত হয়ে কূপে পড়লে, মরে যাক বা জীবিত থাক সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে।

৬. কোন নাপাক জিনিস, যথা কাপড়, ঘটিবাটি, জুতা প্রভৃতি পড়লে সব পানি নাপাক হবে।

৭. রক্ত চলাচল করে এমন কোন প্রাণী যতো ছোট হোক না কেন, কূপে পড়ে মরলে এবং পচে ফুলে গেলে, অথবা মরা-পচা-ফুলা অবস্থায় কুয়ায় পড়ে গেলে সব পানি নাপাক হবে। যেমন ইঁদুর, টিকটিকি, রক্ত চোষা প্রভৃতি পড়ে মরে ফুলে গেলে সমস্ত পানি উঠাতে হবে।

৮. হাঁস-মুরগীর মল কূপে পড়লে সব পানি তুলতে হবে।

৯. যদি দুটি বিড়াল অথবা এতটা ওজনের অন্য কয়েকটি প্রাণী কূপে পড়ে মরে যায় তাহলে সব পানি নাপাক হয়ে যাবে।

১০. যদি ইঁদুর অথবা গিরগিটি জাতীয় বহুরূপী লেজ কেটে গিয়ে কূপে পড়ে তাহলে সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে।

১১. রক্ত চলাচল করে না এমন কোন প্রাণী, যেমন বিচ্ছু, ভোমর, বোলতা, বহুরূপী অথবা ডাঙ্গার ব্যাঙ প্রভৃতি যদি কূপে পড়ে মরে যায় এবং ফুলে ফেটে যায়, তাহলে সমুদয় পানি নাপাক হয়ে যাবে এবং সমস্ত পানি উঠাতে হবে।

যে নাপাকির জন্যে সমুদয় পানি তুলে ফেলা জরুরী নয়

১. বিড়াল, মুরগী, কবুতর অথবা তার সমান কোন প্রাণী যদি কূপে পড়ে মরে যায় কিন্তু ফুলে ফেটে না যায়, তাহলে ৪০ ডোল বা বালতি পানি তুলে ফেললে কূপ পাক হয়। তবে ৬০ বালতি তুলে ফেলা ভালো।

২. যদি ইঁদুর, চিড়িয়া অথবা তার সমান কোন প্রাণী কূপে পড়ে মরে যায় কিন্তু ফুলে ফেটে না যায়, তাহলে ২০ বালতি পানি উঠালেই কূপ পাক হয়। তবে ৩০ বালতি তুলে ফেলা ভালো।

বিঃদ্রঃ কূপে কোন প্রাণী পড়ে যাওয়ার কারণে কূপের নাপাকীর আন্দাজ করার জন্যে ফেকাহশাস্ত্রে কষ্টিপাথর হিসাবে তিন প্রাণী ধরা হয়েছে, ছাগল, বিড়াল এবং ইঁদুর।

* ছাগলের সমান অথবা তার বড়ো প্রাণীর হুকুম ছাগলের ন্যায়।
* বিড়ালের সমান অথবা ছাগলের ছোটো প্রাণীর হুকুম বিড়ালের ন্যায়।
* ইঁদুরের সমান অথবা তার বড়ো এবং বিড়ালের ছোটো প্রাণীর হুকুম ইঁদুরের ন্যায়।

৩. বড় গিরগিটি, যার মধ্যে প্রবহমান রক্ত থাকে, যদি কুয়ায় পড়ে মরে কিন্তু ফুলে ফেটে না যায়, তাহলে ২০ বালতি তুলতে হবে। তবে ৩০ বালতি তুলে ফেলা ভালো।

৪. কোন কূপে মুরগী পড়ে মরে গেল। একজন পানি উঠাবার সময় বলা হলো যে কূপ নাপাক। সে পানি ফেলে দিল বটে কিন্তু সেই ভিজা বালতি অন্য পাক কূপে পানি নেয়ার জন্যে ফেলল। তাহলে সে পাক কূপও নাপাক হয়ে গেল। তা পাক করার জন্যে নাপাক কূপের সমানই অর্থাৎ ৪০ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।

যে অবস্থায় কূপ নাপাক হয় না

১. রক্ত চলাচল করে না এমন প্রাণী যেমন বিচ্ছু, বোলতা, ডাঙ্গার ব্যাঙ প্রভৃতি কূপে পড়ে মরলে অথবা মরার পর পড়লে কূপ নাপাক হয় না।

২. পানির জীব, যেমন মাছ, কাঁকড়া, কুমীর প্রভৃতি কূপে পড়ে মরলে অথবা মরার পর পড়লে কূপ নাপাক হয় না।

৩. জীবিত মানুষ কূপে পড়লে এবং ডুবার পর জীবিত বের হয়ে আসলে কূপ নাপাক হবে না। তবে তার শরীরে কোন নাপাক লেগে থাকলে কূপ নাপাক হবে।

৪. শূকর ব্যতীত যে কোন হালাল বা হারাম প্রাণীর চুল, ক্ষুর অথবা শুকনো হাড় কূপে পড়লে কূপ পাক থাকবে।

৫. যে সব প্রাণীর ঝুটা পাক তা কূপে পড়ে যদি জীবিত বের হয়ে আসে তাহলে কূপ পাক থাকবে।

৬. যে সব প্রাণীর ঝুটা নাপাক[১] অথবা সন্দেহ যুক্ত তারা যদি কূপে পড়ে জীবিত বের হয়ে আসে তাহলে কূপ নাপাক হবে না। শর্ত এই যে, তাদের মুখ পানিতে না ডুবে অথবা লালা পানিতে না পড়ে। তবে সাবধানতার জন্যে ২০/৩০ বালতি পানি তুলে ফেলা ভালো।

৭. হাঁস-মুরগী ব্যতীত অন্য কোন পাখীর মল কূপে পড়ে গেলে কূপ নাপাক হয় না।

---

১. শূকর যদি কূপে পড়ে জীবিত বের হয়ে আসে তথাপি কূপ নাপাক হবে। তার শরীরের কোন অংশ পড়লেও নাপাক হবে।

৮. ছাগলের কিছুটা মল কূপে পড়লে নাপাক হবে না।

৯. যারা গরু মহিষ বাড়িতে রাখে তাদের কূপকে গোবর থেকে রক্ষা করা কঠিন তাদের থালা বাটিও গোবর থেকে রক্ষা করা যায় না। যেহেতু গোবর থেকে পুরাপুরি সাবধান হওয়া তাদের জন্যে মুশকিল সে জন্যে অল্প অল্প গোবর কূপে পড়লে তা নাপাক হবে না।

১০. কোন অমুসলিম যদি কূপে পড়ে যায় অথবা যার গোসলের প্রয়োজন সে যদি কূপে নামে তাহলে কূপের পানি নাপাক হবে না। শর্ত এই যে তার শরীরে কোন নাপাক লেগে না থাকে। তবে ২০/৩০ বালতি পানি তুলে ফেলা ভালো।

১১. এমন কোন জিনিস যদি কূপে পড়ে, যার নাপাক হওয়াটা নিশ্চিত নয়, যেমন বিলাতি ঔষুধ, যার সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, তাতে মদ রয়েছে, তাহলে কূপ নাপাক হবে না।

১২. শহরে টাংকি থেকে পাইপের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয়। এ হলো প্রবহমান পানি। এতে নাজাসাত পড়লে তখনই নাপাক মনে করা হবে যখন পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদ নষ্ট হবে।

এস্তেঞ্জার বিবরণ

পেশাব পায়খানার পর শৌচ করাকে এস্তেঞ্জা বলে। শরীয়তে এস্তেঞ্জার জন্যে বিশেষ তাকিদ করা হয়েছে। এস্তেঞ্জায় অবহেলা করা বড়ো গুনাহ। নবী পাক (সঃ) একে কবর আযাবের কারণ বলেছেন। একবার তিনি দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বলেন, এ দু'জন মুর্দার উপর আযাব হচ্ছে। কোন বড়ো কারণের জন্যে নয় বরং এমন কাজের জন্যে যা খুব সাধারণ মনে করা হয়। এদের মধ্যে একজন এমন ছিল যে পেশাবের পর ভালোভাবে পাক হতো না আর দ্বিতীয় ব্যক্তি চোগলখুরি করতো (বুখারী)।

পেশাব পায়খানা করার আদব ও হুকুম

১. পেশাব পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসা নিষেধ। বাচ্চাদেরকে পেশাব পায়খানা করাবার সময় এমনভাবে বসানো উচিত নয় যাতে মুখ অথবা পিঠ কেবলার দিকে হয়। চাঁদ সূর্যের দিকে মুখ পিঠ করে পেশাব পায়খানা করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

২. কোন ছিদ্রে বা শক্ত মাটির উপর পেশাব করা নিষেধ। ছিদ্রে নিষেধ এ জন্যে যে তাতে কোন ক্ষতিকারক প্রাণী থাকতে পারে যে বের হয়ে দংশন করতে পারে। শক্ত মাটির উপর পেশাব করলে গায়ে পেশাবের ছিটা লাগবে।

৩. ছায়াদানকারী গাছের নীচে নদী ও পুকুরের তীরে যে দিক দিয়ে মানুষ পানি নেয়, ফলবান বৃক্ষের নীচে, যেখানে মানুষ অযু-গোসল করে সেখানে, কবরস্থানে, মসজিদ ও ঈদগাহের এতোটা নিকটে যে, সেখান থেকে দুর্গন্ধে নামাযীদের কষ্ট হয়, জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায়, রাস্তার পাশে, কোন বৈঠকাদির নিকটে, মোট কথা এমন সকল স্থানে পেশাব পায়খানা করা নিষেধ যেখানে মানুষ উঠা বসা করে বিশ্রাম নেয় অথবা অন্যান্য কাজকর্ম করে। এসব স্থানে পেশাব পায়খানায় মানুষের কষ্ট হয়।

৪. দাঁড়িয়ে পেশাব পায়খানা করা নিষেধ। তবে বিশেষ কারণে কোন সময়ে করলে দোষ নেই।

৫. যদি আংটিতে আল্লাহর নাম, কালেমা, কোন আয়াত বা হাদীস লেখা থাকে, তাহলে পেশাব পায়খানায় যাবার সময় তা খুলে রাখতে হবে, নতুবা বেআদবি হবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন -

নবী পাক (সঃ) একটা আংটি ব্যবহার করতেন যাতে মুহাম্মাদুর রসূল-ল্লাহ কুন্দানো ছিল। তিনি পেশাব পায়খানার সময় তা খুলে রেখে যেতেন (মুসলিম, তিরমিযী)।

৬. পেশাব পায়খানা করার সময় বিনা কারণে কথা বলা, কাশি দেয়া, হাদীস, কুরআনের আয়াত বা কোন ভালো জিনিস পড়া, হাঁচি এলে আলহামদু-লিল্লাহ্ বলা দুরস্ত নয়। মনে মনে পড়লে দোষ নেই।

৭. পায়খানা বিলকুল উলংগ হয়ে অথবা বিনা কারণে শুয়ে বা দাঁড়িয়ে পেশাব পায়খানা করা ঠিক নয়।

৮. মাঠে পায়খানা করতে হলে বসার পূর্বে এবং টয়লেট বা পায়খানায় প্রবেশ করার আগে নিম্নের দোয়া পড়া উচিতঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ - (بخارى)

হে আল্লাহ্! দুষ্কৃতিকারী নারী-পুরুষ ও জ্বিন থেকে তোমার পানাহ (আশ্রয়) চাই-(বোখারী)।

পায়খানা শেষ করার পর বাইরে এসে এ দোয়া পড়তে হয়-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَذْهَبَ عَنِّى وَعَافَانِى (نسائى - ابى ماجه)

আল্লাহ্‌র শোকর যিনি আমার মলমূত্রের কষ্ট দূর করে দিয়ে আমাকে শান্তি দান করেছেন-(নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)। পায়খানা থেকে বেরুবার পর উপরের দোয়া মনে না থাকলে শুধু এতটুকু পড়লেও চলবে غُفْرَانَكَ হে আল্লাহ। আমি তোমার মাগফেরাত চাই।

৯. আবদ্ধ পানিতে বা স্রোতে পেশাব না করা উচিত। হযরত জাবের (রা) বলেন, নবী (সা) স্রোতের পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেন, নবী (সা) আবদ্ধ পানিতেও পেশাব করতে নিষেধ করেছেন-(মুসলিম, নাসায়ী)।

এস্তেঞ্জার আদব ও হুকুম

১. পেশাব পায়খানার পর আবশ্যক মতো মাটির ঢিলা দিয়ে মলদ্বার ভালো করে পরিষ্কার করে তারপর পানি দিয়ে তাহারাত হাসিল করা মসনূন। ঢিলা পাওয়া না গেলেও শুধু পানি দিয়েও পাক সাফ করা যায়। শুধু পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা করতে হলে পেশাবের পর এতোটা সময় কাটাতে হবে যেন পরে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব না বেরয়। তারপর পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা করবে।

২. পেশাবের পর ঢিলা দিয়ে এতক্ষণ ধরে এস্তেঞ্জা করতে হবে যেন ঢিলা একেবারে শুকিয়ে যায়–হাঁটাহাটি করে তা করা হোক অথবা অন্য কোন পন্থায়।

৩. ঢিলা দিয়ে এস্তেঞ্জা করার সময় সভ্যতা, ভদ্রতা, সুরুচি, দ্বীনি মর্যাদা এবং লজ্জা শরমের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেখানে নারী, শিশু, পুরুষ সাধারণত চলাফেরা করে সেখানে বিনা দ্বিধায় পায়খানা বা তহবন্দের মধ্যে হাত দিয়ে হাঁটাহাটি করা, কথাবার্তা বলা এক উরু দিয়ে অন্যটাকে চাপ দেয়ার বিচিত্র ভঙ্গি চরম নির্লজ্জতা ও অসভ্যতার পরিচায়ক। এতে ইসলামী তাহযীব ও রুচিবোধের প্রতি ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ কাজ পায়খানার মধ্যেই করা উচিত অথবা মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে।

৪. পানি, মাটির ঢিল, পাথর, মামুলি পুরানো কাপড়, চুষে নিতে পারে এমন অন্যান্য জিনিস দিয়ে এস্তেঞ্জা করা যায় যা পাক হয় এবং যার দ্বারা নাজাসাত দূর হয়। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যা দিয়ে এস্তেঞ্জা করা হবে তা যেন কোন মূল্যবান এবং সম্মানের বস্তু না হয়।

৫. গোবর, মল বা এমন ঢিল যা দিয়ে একবার এস্তেঞ্জা করা হয়েছে অথবা এমন বস্তু যা দিয়ে নাজাসাত দূর হবে না, যেমন সির্কা, শরবত প্রভৃতি,- এসব দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ।

৬. হাড়, কয়লা, কাঁচ অথবা এমন কঠিন বস্তু যা দিয়ে এস্তেঞ্জা করলে কষ্ট হতে পারে এসব দিয়ে এস্তেঞ্জা নিষেধ।

৭. লোহা, তামা, পিতল, সোনা–চাঁদি এবং অন্যান্য ধাতব দ্রব্য দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ।

৮. যেসব বস্তু পশুর খাদ্য, যেমন ঘাস, পাতা, খড় ইত্যাদি। মূল্যবান বস্তু যেমন কাপড়, মানবদেহের অংশ বিশেষ, যেমন চুল, গোশত ইত্যাদি। মসজিদের বিছানার টুকরা, ঝারণ প্রভৃতি। লেখার কাগজ যার উপর লেখা

যাবে, যমযম পানি, ফলের ছাল মোট কথা মানুষ এবং পশু যেসব বস্তু থেকে উপকার লাভ করে এবং যার সম্মান করা জরুরী সে সব দ্বারা এস্তেঞ্জা নিষেধ।

৯. যদি মল মলদ্বারের বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে এস্তেঞ্জা করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। আর ছড়িয়ে পড়লে ফরয।

১০. পেশাব পায়খানার দ্বার দিয়ে অন্য কোন বস্তু যেমন রক্ত, পুঁজ প্রভৃতি বের হলে এস্তেঞ্জা করতে হবে।

১১. এস্তেঞ্জা বাম হাতে করতে হবে। এস্তেঞ্জার পর মাটি বা সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুতে হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সঃ) যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি একটি পিতলের পাত্রে তাঁকে পানি দিতাম। তিনি এস্তেঞ্জা করে মাটিতে হাত ঘষে সাফ করতেন-(আবু দাউদ, নাসায়ী)।

অযুর বিবরণ

অযুর ফযীলত ও বরকত

অযুর মহত্ব ও গুরুত্ব এর চেয়ে অধিক আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং কুরআনে তার শুধু হুকুমই নেই, বরঞ্চ তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অযুতে দেহের কোন্ কোন্ অংগ ধুতে হবে। আর এ কথাও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, অযু নামাযের অপরিহার্য শর্ত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ - (المائده ٦)

যারা তোমরা ঈমান এনেছো জেনে রাখো, যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াবে তার আগে নিজেদের মুখ-মন্ডল ধুয়ে নেবে এবং তোমাদের দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে এবং মাথা মুসেহ করবে এবং তারপর দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেলবে-(মায়েদাহ ঃ ৬)।

নবী (সঃ) অযুর ফযীলত ও বরকত বয়ান করতে গিয়ে বলেন -

আমি কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের লোকদেরকে চিনে ফেলবো। কোন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে, হে আল্লাহ্র রসূল? নবী (সঃ) বলেন, এ জন্যে তাদেরকে চিনতে পারব যে, অযুর বদৌলতে আমার উম্মতের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বলতায় ঝক্ঝক্ করবে।

অন্য এক সময়ে নবী পাক (সঃ) অযুর মহত্ব বয়ান করতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি আমার বলে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী ভালোভাবে অযু করবে এবং অযুর পর এ কালেমা শাহাদাত পড়বে-

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর সে যে দরজা দিয়ে খুশী জান্নাতে প্রবেশ করবে (মুসলিম)।

উপরন্তু তিনি আরও বলেন,

অযু করার কারণে ছোটো খাটো গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং অযুকারীকে আখেরাতে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয় এবং অযুর দ্বারা শরীরের সমস্ত গুনাহ ঝরে পড়ে (বুখারী, মুসলিম)।

আর একবার নবী (সঃ) অযুকে ঈমানের আলামত বলে অভিহিত করে বলেন, হকের রাস্তায় ঠিকভাবে কায়েম থাক, আর তোমরা কখনো সত্য পথে অটল থাকার হক আদায় করতে পারবে না। (সে জন্যে নিজেদের ভুলত্রুটি ও অক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ থাক) এবং ভাল করে বুঝে রাখ যে, তোমাদের সকল আমলের মধ্যে নামায উৎকৃষ্টতম এবং অযুর পুরোপুরি রক্ষণাবেক্ষণ তো শুধু মু'মেনই করতে পারে-(মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ইবনে মাজাহ)।

অযুর মসনূন তরিকা

অযুকারী প্রথমে মনে মনে এ নিয়ত করবে, আমি শুধু আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্যে এবং তাঁর কাছ থেকে আমলের প্রতিদান পাবার জন্যে অযু করছি। তারপর بسم الله الرحمن الرحيم বলে অযু শুরু করবে এবং নিম্নের দোয়া পড়বে (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী)।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ ووسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِى رِزْقِىْ

হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ মাফ কর, আমার বাসস্থান আমার জন্যে প্রশস্ত করে দাও এবং রুযীতে বরকত দাও। -(নাসায়ী)।

হযরত আবু মুসা আশয়ারী বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর জন্যে অযুর পানি আনলাম। তিনি অযু করা শুরু করলেন। আমি শুনলাম যে, তিনি অযুতে এ দোয়া পড়ছিলেন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এ দোয়া পড়ছিলেন? তিনি বললেন, আমি দ্বীন ও দুনিয়ার কোন্ জিনিস তাঁর কাছে চাওয়া ছেড়ে দিয়েছি?

অযূর জন্যে প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত খুব ভাল করে তিনবার ঘষে ধুতে হবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুল্লি করতে হবে। মিসওয়াকও করতে হবে।[১]

কোন সময়ে মিসওয়াক না থাকলে শাহাদাৎ অঙ্গুলি দিয়ে ভালো করে ঘষে দাঁত সাফ করতে হবে। রোযা না থাকলে তিনবারই গড়গড়া করে কুল্লি করতে হবে। তার উদ্দেশ্য গলদেশের ভেতর পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। তারপর তিনবার এমনভাবে নাকে পানি দিতে হবে যেন নাসিকার ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে। অবশ্য রোযার সময় সাবধানে কাজ করতে হবে। তারপর বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক সাফ করতে হবে। প্রত্যেকবার নাকে নতুন পানি দিতে হবে। তারপর দু'হাতের তালু ভরে পানি নিয়ে তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল (চেহারা) এমনভাবে ধুতে হবে যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুকনো না থাকে। দাঁড়ি ঘন হলে তার মধ্যে খেলাল করতে হবে যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। চেহারা ধুবার সময় এ দোয়া পড়তে হবে

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ –

হে আল্লাহ্। আমার চেহারা সেদিন উজ্জ্বল করে দিও যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু লোকের মলিন হবে।

তারপর দু'হাত কনুই পর্যন্ত ভালো করে ঘষে ঘষে ধুবে। প্রথম ডান হাত এবং পরে বাম হাত তিন তিনবার করে ধুতে হবে। হাতে আংটি থাকলে এবং মেয়েদের হাতে চুড়ি-গয়না থাকলে তা নাড়াচাড়া করতে হবে যেন ভালোভাবে পানি সবখানে পৌঁছে। হাতের আঙ্গুলগুলিতে আঙ্গুল দিয়ে খেলাল করতে হবে। তারপর দু'হাত ভিজিয়ে মাথা এবং কান মুসেহ করতে হবে।

---

১. নবী (সঃ) মিসওয়াককে অসাধারণ গুরুত্ব দিতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সঃ) দিনে বা রাতে যখনই ঘুম থেকে উঠতেন, তাঁর অভ্যাস ছিল, অযূর পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন (আবু দাউদ)। হুযায়ফা (রা) বলেন, নবী (সঃ) যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্যে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তাঁর অভ্যাস এই ছিল যে, মিসওয়াক দিয়ে ভাল করে মুখ দাঁত পরিষ্কার করতেন তারপর অযূ করে তাহাজ্জুদ নামাযে মশগুল হতেন।

নবী (সঃ) উম্মতকে মিসওয়াকের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে বলতেন, মিসওয়াক মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে এবং আল্লাহকে অত্যন্ত খুশী করে (বুখারী, নাসায়ী)।

নবী (সঃ) আরও বলেন, আমার উম্মতের কষ্টের প্রতি যদি খেয়াল না করতাম, তাহলে প্রত্যেক অযূতে মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম। (বুখারী, মুসলিম)।

মুসেহ করার পদ্ধতি

মুসেহ করার পদ্ধতি এই যে, বুড়ো এবং শাহাদাত অঙ্গুলি আলাদা রেখে বাকী দু'হাতের তিন তিন অংগুলি মিলিয়ে অংগুলিগুলোর ভেতর দিক দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে পেছন দিকে মাথার এক চতুর্থাংশ মুসেহ করতে হবে। তারপর দু'হাতের হাতুলির পেছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে মাথার তিন চতুর্থাংশ মুসেহ করতে হবে। তারপর শাহাদাত অংগুলি দিয়ে কানের ভেতরের অংশ এবং বুড়ো অংগুলি দিয়ে কানের বাইরের অংশ মুসেহ করতে হবে। তারপর দু'হাতের অংগুলিগুলোর পিঠ দিয়ে ঘাড় মুসেহ করতে হবে। গলা মুসেহ করতে হবে না। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এভাবে কোন অংশ মুসেহ করতে হাতের ঐ অংশ দ্বিতীয় বার ব্যবহার করতে হয় না যা একবার ব্যবহার করা হয়েছে।

মুসেহ করার পর দু'পা টাখনু পর্যন্ত তিন তিনবার এমনভাবে ধুতে হবে যে, ডান হাত দিয়ে পানি ঢালতে হবে এবং বাম হাত দিয়ে ঘষতে হবে। বাম হাতের ছোট আংগুল দিয়ে পায়ের আংগুলগুলোর মধ্যে খেলাল করতে হবে। ডান পায়ে খেলাল ছোট আংগুল থেকে শুরু করে বুড়ো আংগুলে শেষ করতে হবে। বাম পায়ে খেলাল বুড়ো আংগুল থেকে ছোট আংগুল পর্যন্ত করতে হবে। অযুর কাজগুলো পর পর করে যেতে হবে। অর্থাৎ একটার পর সংগে সংগে অন্যটি ধুতে হবে। খানিকক্ষণ থেমে থেমে করা যেন না হয়।

অযু শেষ করে আসমানের দিকে মুখ করে তিন বার এ দোয়া পড়তে হয়।

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ ও রসূল। হে আল্লাহ্, আমাকে ঐসব লোকের মধ্যে শামিল কর যারা বেশী বেশী তওবাকারী এবং আমাকে ঐসব লোকের মধ্যে শামিল কর যারা বেশী বেশী পাক সাফ থাকে।

অযুর হুকুম

যে যে অবস্থায় অযু ফরয হয়

১. প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযু ফরয, সে নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজেব। সুন্নাত বা নফল হোক।

২. জানাযার নামাযের জন্যে অযু ফরয।

৩. সিজদায়ে তেলাওয়াতের জন্যে অযু ফরয।

যে সব অবস্থায় অযু ওয়াজেব

১. বায়তুল্লাহ তাওয়াফের জন্যে।

২. কুরআন পাক স্পর্শ করার জন্যে।

যে সব কারণে অযু সুন্নাত

১. শোবার পূর্বে অযু সুন্নাত।

২. গোসলের পূর্বে অযু সুন্নাত।

যে যে অবস্থায় অযু মুস্তাহাব

১. আযান ও তাকবীরের জন্যে অযু মুস্তাহাব

২. খুতবা পড়ার সময়–জুমার খুতবা হোক বা নেকাহর খুতবা।

৩. দ্বীনি তালিম দেয়ার সময়

৪. যিকরে এলাহীর সময়

৫. ঘুম থেকে উঠার পর

৬. মাইয়েতে গোসল দেবার পর।

৭. নবী (সঃ)–এর রওযা মুবারক যিয়ারতের সময়

৮. আরফার ময়দানে অবস্থানের সময়

৯. সাফা ও মারওয়া সায়ী করার সময়

১০. জানাবাত অবস্থায় খাবার পূর্বে

১১. হায়েয নেফাসের সময়ে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে

১২. সব সময় অযু থাকা মুস্তাহাব।

অযুর ফরযসমূহ

অযুর চারটি ফরয এবং প্রকৃতপক্ষে এ চারটির নামই অযু। এ চারের মধ্যে কোন একটি বাদ গেলে অথবা চুল পরিমাণ কোন স্থান শুকনো থাকলে অযু হবে না।

১. একবার গোটা মুখমণ্ডল ধোয়া। অর্থাৎ কপালের উপর মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনির নীচ এবং এক কানের গোড়া থেকে অপর কানের গোড়া পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডল ধোয়া ফরয।

২. দু'হাত অন্ততঃ একবার কুনুই পর্যন্ত ধোয়া।

৩. একবার মাথার এক চতুর্থাংশ মুসেহ করা।

৪. একবার দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধোয়া।

অযুর সুন্নাতসমূহ

অযুর কিছু সুন্নাত আছে। অযু করার সময় তা রক্ষা করা দরকার। অবশ্য যদিও তা ছেড়ে দিলে কিংবা তার বিপরীত কিছু করলেও অযু হয়ে যায়, তথাপি ইচ্ছা করে এমন করা এবং বার বার করা মারাত্মক ভুল। আশংকা হয় এমন ব্যক্তি গুনাহগার হয়ে যেতে পারে।

অযুর সুন্নাত পনেরটি

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে প্রতিদানের নিয়ত করা।

২. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে অযু শুরু করা।

৩. মুখ ধোয়ার আগে কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ধোয়া।

৪. তিন বার কুল্লি করা।

৫. মিসওয়াক করা।

৬. নাকে তিনবার পানি দেয়া।

৭. তিনবার দাড়ি খেলাল করা।[১]

৮. হাত পায়ের আংগুলে খেলাল করা।

৯. গোটা মাথা মুসেহ করা।

১০. দু'কান মুসেহ করা।[২]

১১. ক্রমানুসারে করা।

১২. প্রথমে ডান দিকের অংগ ধোয়া তারপর বাম দিকের।

১৩. একটি অংগ ধোয়ার পর পর দ্বিতীয়টি ধোয়া। একটির পর একটি ধুতে এত বিলম্ব না করা যে, প্রথমটি শুকিয়ে যায়।

১৪. প্রত্যেক অংগ তিন তিনবার ধোয়া।

১৫. অযুর শেষে মসনূন দোয়া পড়া (পূর্বে দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে)।

অযুর মুস্তাহাব

অর্থাৎ এমন কিছু খুটিনাটি যা পালন করা অযুর মুস্তাহাব।

১. এমন উঁচু স্থানে বসে অযু করা যাতে পানি গড়িয়ে অন্য দিকে যায় এবং ছিটা গায়ে না পড়ে।

২. কেবলার দিকে মুখ করে অযু করা।

৩. অযুর সময় অপরের সাহায্য না নেয়া। অর্থাৎ নিজেই পানি নেয়া এবং নিজে নিজেই অংগাদি ধোয়া।[৩]

---

১. ইহরাম অবস্থায় দাড়ি খেলাল করা ঠিক হবে না যদি হঠাৎ কোন দাড়ি উপড়ে যায়। ইহরামকারীর জন্যে চুল উপড়ানো নিষেধ।

২. কান মুসেহ করার জন্যে নতুন পানিতে হাত ভেজাবার দরকার নেই। তবে, টুপি, পাগড়ি, রুমাল প্রভৃতি স্পর্শ করার কারণে হাত শুকিয়ে গেলে দ্বিতীয় বার হাত ভিজিয়ে নিতে হবে।

৩. যদি কেউ অযাচিতভাবে এগিয়ে এসে পাত্র ভরে পানি দিয়ে দেয় তাতে কোন দোষ নেই। কারো কাছে সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকা ঠিক নয়। রোগী বা অক্ষম ব্যক্তির অপরের দ্বারা অংগপ্রত্যংগাদি ধুয়ে নেয়া মোটেই দূষণীয় নয়।

৪. ডান হাতে পানি নিয়ে কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেয়া।

৫. বাম হাত দিয়ে নাক সাফ করা।

৬. পা ধুবার সময় ডান হাতে পানি ঢালা এবং বাম হাতে ঘষে ধোয়া।

৭. অঙ্গ ধোবার সময় মসনূন দোয়া পড়া।

৮. অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঘষে ঘষে ধোয়া যেন কোন স্থানে শুকনো না থাকে এবং ময়লা থেকে না যায়।

অযুর মাকরুহ কাজগুলো

১. অযুর শিষ্টাচার ও মুস্তাহাব ছেড়ে দেয়া অথবা তার বিপরীত করা।

২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা।

৩. এতো কম পরিমাণ পানি ব্যবহার করা যে, অঙ্গাদি ধুতে কিছু শুকনো থেকে যায়।

৪. অযুর সময় আজে বাজে কথা বলা।

৫. জোরে জোরে পানি মেরে অঙ্গাদি ধোয়া

৬. তিন তিনবারের বেশী ধোয়া।

৭. নতুন পানি নিয়ে তিনবার মুসেহ করা।

৮. অযুর পরে হাতের পানি ছিটানো।

৯. বিনা কারণে অযুর মধ্যে ঐসব অঙ্গ ধোয়া যা জরুরী নয়।

ব্যাণ্ডেজ এবং ক্ষত প্রভৃতির উপর মুসেহ

১. ভাঙ্গা হাড়ের উপর কাঠ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বা প্লাষ্টার করা আছে। অথচ সে স্থান ধোয়া অযুর জন্যে জরুরী। এখন তার উপর মুসেহ করলেই চলবে।

২. ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বা প্লাষ্টার করা আছে। তাতে পানি লাগলে ক্ষতির আশংকা। এ অবস্থায় মুসেহ করলেই চলবে এবং তাতেও ক্ষতির আশংকা হলে তাও মাফ করা হয়েছে।

৩. যদি যখমের অবস্থা এমন হয় যে, ব্যাণ্ডেজ করতে দেহের কিছু সুস্থ অংশও তার মধ্যে আছে। এখন ব্যাণ্ডেজ খুললে বা খুলে ভালো অংশ ধুতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাহলে মুসেহ করলেই চলবে।

৪. ব্যাণ্ডেজ খুলে দেহের ঐ অংশ ধুলে কোন ক্ষতির আশংকা নেই কিন্তু খুললে আবার বাঁধবার কেউ নেই। এমন অবস্থায় মুসেহ করার অনুমতি আছে।

৫. ব্যাণ্ডেজের উপর আর এক ব্যাণ্ডেজ করা হলে তার উপরও মুসহে করা যায়।

৬. কোন অঙ্গে আঘাত বা যখম হয়েছে। পানি লাগালে ক্ষতির সম্ভাবনা। তখন মুসেহ করলেই যথেষ্ট হবে।

৭. যদি চেহারা বা হাত–পা কেটে গিয়ে থাকে কিংবা কোন অংগে ব্যাথা হলে এবং পানি লাগালে ক্ষতির আশংকা, তাহলে মুসেহ করলেই হবে। আর যদি মুসেহ করলেও ক্ষতি হয় তাহলে মুসেহ না করলেও চলবে।

৮. হাত–পা ফাটার কারণে তার উপর মোম অথবা ভেসলিন অথবা অন্য কোন ওষুধ লাগানো হয়েছে, তাহলে উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলেই হবে। ভেসেলিন প্রভৃতি দূর করা জরুরী নয়। পানি দেয়াও যদি ক্ষতিকারক হয় তাহলে মুসেহ করলেই হবে।

৯. যখম অথবা আঘাতের উপর ওষুধ লাগানো হলো অথবা পট্টির উপর পানি দেয়া হলো অথবা মুসেহ করা হলো। তারপর পট্টি খুলে গেল অথবা যখম ভালো হয়ে গেল, তখন ধুতেই হবে মুসেহ আর চলবে না।

যে সব জিনিসের উপর মুসেহ জায়েয নয়

১. দস্তানার উপর।

২. টুপির উপর।

৩. মাথার পাগড়ি অথবা মাফলারের উপর।

৪. দুপাট্টা অথবা বোরকার উপর।

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয়

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় তা দু'প্রকার ঃ

এক–যা দেহের ভেতর থেকে বের হয়।

দুই–যা বাইর থেকে মানুষের উপর এসে পড়ে।

প্রথম প্রকার

১. পেশাব পায়খানা বের হওয়া।

২. পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণ হওয়া।

৩. পেশাব পায়খানার দ্বার দিয়ে অন্য কিছু বের হওয়া, যেমন ক্রিমি, পাথর, রক্ত, মুযী প্রভৃতি।

৪. দেহের কোন অংশ থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে যাওয়া।

৫. থুথু কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত, পুঁজ, খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখ ভরে বমি হলে।

৬. মুখ ভরে বমি না হলেও বার বার হলে এবং তার পরিমাণ মুখ ভরে হওয়ার সমান হলে অযু নষ্ট হবে।

৭. থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ বেশী হলে।

৮. কামভাব ছাড়া বীর্যপাত হলে, যেমন ভারী বোঝা উঠালে, উঁচু স্থান থেকে নীচে নামতে, অথবা ভীষণ দুঃখ পেলে যদি বীর্য বের হয় অযু নষ্ট হবে।

৯. চোখে কোন কষ্টের কারণে ময়লা বা পানি বের হয়ে যদি গড়িয়ে পড়ে তাহলে অযু নষ্ট হবে। কিন্তু যার চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ে তার জন্যে মাফ।

১০. কোন মেয়েলোকের স্তনে ব্যথার কারণে দুধ ছাড়া কিছু পানি যদি বের হয় তাহলে অযু নষ্ট হবে।

১১. এস্তেহাযার রক্ত এলে।

১২. মুযি বের হলে।

১৩. যে যে কারণে গোসল ওয়াজেব হয় তার কারণে অযুও অবশ্যই নষ্ট হবে, যেমন হায়েয, নেফাস, বীর্যপাত প্রভৃতি।

দ্বিতীয় প্রকার

১. চিত হয়ে কাত হয়ে, অথবা ঠেস দিয়ে ঘুমালে।

২. যে যে অবস্থায় জ্ঞান ও অনুভূতি থাকে না।

৩. রোগ অথবা শোকের কারণে জ্ঞান হারালে।

৪. কোন মাদকদ্রব্য সেবনে অথবা ঘ্রাণ নেয়ার কারণে নেশাগ্রস্ত হলে।

৫. জানাযা নামায ব্যতীত অন্য যে কোন নামাযে অট্যহাস্য করলে।

৬. দুজনের গুপ্তাংগ একত্র মিলিত হলে এবং দু অংগের মাঝে কোন কাপড় বা কোন প্রতিবন্ধক না থাকলে বীর্যপাত ছাড়াও অযু নষ্ট হবে।

৭. রোগী শুয়ে শুয়ে নামায পড়তে যদি ঘুমিয়ে পড়ে।

৮. নামাযের বাইরে যদি কেউ দু'জানু হয়ে বসে বা অন্য উপায়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার দু'পাঁজর মাটি থেকে আলাদা থাকে, অযু নষ্ট হবে।

যে সব কারণে অযু নষ্ট হয় না

১. নামাযের মধ্যে এমনকি সিজদাতে ঘুমালে।

২. বসে বসে ঝিমুলে।

৩. নাবালকের অট্ট হাসিতে।

৪. জানাযায় অট্ট হাসিতে।

৫. নামাযে অস্ফুট শব্দে হাসলে এবং মৃদু হাস্য করলে।

৬. মেয়েলোকের স্তন থেকে দুধ বের হলে।

৭. সতর উলংগ হলে, সতরে হাত দিলে, অন্যের সতর দেখলে।

৮. যখম থেকে রক্ত বের হয়ে যদি গড়িয়ে না যায়, যখমের মধ্যেই থাকে।

৯. অযুর পর মাথা বা দাড়ি কামালে অথবা নেড়ে করলে।

১০. কাশি ও থুথু বের হলে।

১১. নারী পুরুষ একে অপরকে চুমা দিলে।

১২. মুখ, কান অথবা নাক দিয়ে কোন পোকা বেরুলে।

১৩. শরীর থেকে কোন পোকা বেরুলে।

১৪. ঢেকুর উঠলে এমনকি দুর্গন্ধ ঢেকুর হলেও।

১৫. মিথ্যা কথা বললে, গীবত করলে এবং কোন গুনাহের কাজ করলে (মাআযাল্লাহ)।

হাদাসে আসগারের হুকুমাবলী

১. হাদাসে আসগার অবস্থায় নামায হারাম যে কোন নামায হোক।

২. সিজদা করা হারাম, তেলাওয়াতের সিজদা হোক, শোকরানার হোক অথবা এমনিই কেউ সিজদা করুক।

৩. কুরআন পাক স্পর্শ করা মাকরুহ তাহরীমি, কুরআন পাক জড়ানো কাপড় ও ফিতা হোক না কেন।

৪. কা'বার তাওয়াফ মাকরুহ তাহরীমি।

৫. কোন কাগজ, কাপড়, প্লাষ্টিক, রেক্সিন প্রভৃতি টুকরায় কোন আয়াত লেখা থাকলে তা স্পর্শ করাও মাকরুহ তাহরীমি।

৬. কুরআন পাক যদি জুযদান অথবা রুমাল প্রভৃতিতে অর্থাৎ আলাদা কাপড়ে জড়ানো থাকে তাহলে স্পর্শ করা মাকরুহ হবে না।

৭. নাবালক বাচ্চা, কিতাবাতকারী, মুদ্রাকর ও জিলদ তৈয়ারকারীর জন্যে হাদাসে আসগার অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা মাকরুহ নয়। কারণ তাদের জন্যে সর্বদা হাদাসে আসগার থেকে পাক থাকা কঠিন।

৮. হাদাসে আসগার অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া, পড়ানো, দেখে হোক না দেখে হোক, মুখস্ত হোক সর্বাবস্থায় জায়েয।

৯. তাফসীরের এমন কেতাব যার মধ্যে কুরআনের মূল বচন আছে, বেঅযুতে স্পর্শ করা মাকরুহ।

১০. হাদাসে আসগার (বেঅযু) অবস্থায় কুরআন পাক লেখা যায় যদি যাতে লেখা হচ্ছে তা স্পর্শ করা না হয়।

১১. কুরআন পাকের তরজমা অন্য কোন ভাষায় হলে অযু করে তা স্পর্শ করা ভালো।

রোগীর জন্যে অযুর হুকুম

অযুর ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম মনে করা হবে যে এমন রোগে আক্রান্ত যার শরীর থেকে সব সময় অযু ভংগকারী বস্তু বের হতে থাকে এবং রোগীর এতটা অবকাশ নেই যে, তাহারাতের সাথে নামায পড়তে পারে। যেমন ঃ

১. কেউ চোখের রোগী সব সময় তার চোখ দিয়ে পিচুটি ময়লা অথবা সব সময় পানি বেরুতে থাকে।

২. কারো পেশাবের রোগ আছে এবং সব সময় ফোঁটা ফোঁটা পেশাব বেরয়।

৩. কারো বায়ু নিঃসরণের রোগ আছে। সব সময় বায়ু নিঃসরণ হতে থাকে।

৪. কারো পেটের রোগ এবং সর্বদা পায়খানা হতে থাকে।

৫. এমন রোগী যার সর্বদা রক্ত বা পুঁজ বেরয়।

৬. কারো নাকশিরা রোগ আছে এবং সর্বদা নাক দিয়ে রক্ত পড়ে।

৭. কারো প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে সর্বদা মনি বা মুযি বের হতে থাকে।

৮. কোন মেয়েলোকের সব সময় এস্তেহাযার রক্ত আসে।

এ ধরনের সকল অবস্থায় হুকুম এই যে, এ ধরনের লোক প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন অযু করবে এবং অযু ততোক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতোক্ষণ না অন্য দ্বিতীয় কোন কারণ হয়েছে যার দ্বারা অযু নষ্ট হয়। যেমন কারো নাকশিরা ব্যারাম আছে। সে যোহর নামাযের অযু করলো। এখন তার অযু আসর পর্যন্ত বাকী থাকবে। তবে নাকশিরার রক্ত ছাড়া যদি পেশাব করে, অথবা বায়ু নিঃসরণ হয় তাহলে অযু নষ্ট হবে।

রোগীর মাসয়ালা

১. অক্ষম রোগী ব্যক্তি নয়া অযু করার পর ওয়াক্ত থাকা পর্যন্ত সে অযুতে ফরয, সুন্নাত, নফল সব নামায পড়তে পারে।

২. কেউ ফজর নামাযের জন্যে অযু করলো। তারপর সূর্য উঠার পর তার অযু শেষ হয়ে গেল। এখন কোন নামায পড়তে হলে নতুন অযু করতে হবে।

৩. সূর্য উঠার পর অযু করলে যে, অযুতে যোহর নামায পড়া যায়। যোহরের জন্যে দ্বিতীয়বার অযু করার দরকার নেই তবে আসরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে এ অযু শেষ হয়ে যাবে।

৪. এ ধরনের কোন রোগীর কোন নামাযের পুরা ওয়াক্ত এমন গেল যে, এ সময়ের মধ্যে তার সে রোগ বিলকুল ঠিক হয়ে গেল। যেমন, কারো সব সময়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়তো। এখন তার যোহর থেকে আসর পর্যন্ত এক ফোঁটাও পড়লো না। তাহলে তার রোগের অবস্থা খতম হয়ে গেল। এরপর যতবার পেশাবের ফোঁটা পড়বে ততবার অযু করতে হবে।

মুজার উপর মুসেহ

যথাযোগ্য লাঘবতার লক্ষ্যে শরীয়ত মুজার উপর মুসেহ করার অনুমতি দিয়েছে। কোন কোন কঠিন আবহাওয়ায় বিশেষ করে ঐসব দেশে যেখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়ে, শরীয়তের এ সুযোগ দানের জন্যে আপনা আপনি কৃতজ্ঞতার আবেগ-উচ্ছ্বাসে মন-প্রাণ ভরে যায় এবং আল্লাহ্‌র অশেষ রহম ও করমের অনুভূতি পয়দা হয়। তারপর এ একীন বাড়তে থাকে যে, 'দ্বীন' আমাদের কোন প্রয়োজন এবং অসুবিধা উপেক্ষা করেনি।

কোন্ কোন্ মুজার উপর মুসেহ্ জায়েয

চামড়ার মুজার উপর মুসেহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত। তবে পশমী, সূতী, রেশমী ও নাইলন মুজার উপর মুসেহ জায়েয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ ফেকাহবিদ পশমী, সূতী প্রভৃতি মুজার উপর মুসেহ জায়েয হওয়ার জন্যে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। আবার কতিপয় আহলে এলম বলেন যে, কোন শর্ত ব্যতিরেকেই সকল প্রকার মুজার উপর মুসেহ্ জায়েয। সাধারণত ফেকাহের কেতাবগুলোতে শুধু ঐসব মুজার উপর মুসেহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যেগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি শর্ত পাওয়া যাবে।

১. এমন মোটা হবে যা কোন কিছু দিয়ে না বাঁধলেও পায়ের উপর লেগে থাকবে।

২. এমন মজবুত হবে যে, তা পায়ে দিয়ে তিন মাইল পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে।

৩. এতখানি মোটা হবে যে, ভেতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা যাবে না।

৪. ওয়াটার প্রুফ হতে হবে যেন উপরে পানি দিলে পানি চুষতে না পারে এবং পানি নীচ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে।

যেসব মুজায় এ চারটি শর্ত পাওয়া যাবে না, তার উপর মুসেহ জায়েয হবে না।[১]

---

১. কতিপয় দূরদর্শী আলেম এ শর্তগুলো স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, সুন্নাত থেকে যা কিছু প্রমাণিত আছে তা শুধু এই যে, নবী (সঃ) মুজা এবং জুতার উপর মুসেহ করেছেন।

মুজার উপর মুসেহ করার পদ্ধতি

* দু'হাত অব্যবহৃত পানি দিয়ে ভিজিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো কিছুটা ফাঁক করে তা ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ডান পা এবং বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাম পা মুসেহ করতে হবে।

* পায়ের আঙ্গুলের দিক থেকে উপরের টাখনুর দিকে আঙ্গুল বুলিয়ে আনতে হবে।

* আঙ্গুলগুলো একটু চাপ সহকারে টেনে আনতে হবে যেন মুজার উপর ভেজা হাতের স্পর্শ অনুভূত হয়।

* মুসেহ পায়ের উপরিভাগে, নীচের দিকে নয়।

* মুসেহ দু'পায়ের উপর মাত্র একবার করে করতে হবে।

অতএব সকল প্রকার মুজার উপর কোন শর্ত ব্যতিরেকেই মুসেহ করা জায়েয। বর্তমান যুগের একজন প্রখ্যাত ও সর্বজন পরিচিত চিন্তাশীল ও দূরদর্শী আলেমে দ্বীন মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী স্কটল্যাণ্ডে বসবাসকারী একজন ছাত্রের প্রশ্নের জবাবে যে বিশদ ব্যাখ্যা দান করেন তার দ্বারা বিষয়টির উপর বিশেষ আলোকপাত করেন। নিম্নে সে প্রশ্ন ও তার জবাব উধৃত করা হলো :

প্রশ্নঃ মুজার উপর মুসেহ করার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আমি শিক্ষালাভের জন্যে স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে বাস করি। এখানে শীতকালে ভয়ানক ঠান্ডা পড়ে। সব সময়ে পশমী মুজা পরিধান করা অপরিহার্য হয়। এ ধরনের মুজার উপর মুসেহ করা যায় কি? শরীয়তের তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার আলোকে মেহেরবানী করে বিস্তারিত লিখে জানাবেন।

উত্তর : চামড়ার মুজার উপর মুসেহ করার ব্যাপারে প্রায় সব আহলে সুন্নাতের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু পশমী ও সূতী মুজার ব্যাপারে সাধারণত আমাদের ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ এ শর্ত লাগিয়েছেন যে, তা মোটা হতে হবে, এমন পাতলা না হয় যেন নীচ থেকে পায়ের চামড়া দেখা যায়। আর সে মুজা কোন প্রকার বন্ধন ব্যতিরেকেই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি আমার সাধ্যমত তালাশ করার চেষ্টা করেছি যে, এসব শর্তের উৎস কি? কিন্তু সুন্নাতের ভেতর এমন কোন জিনিস খুঁজে পাইনি। সুন্নাত থেকে যা কিছু প্রমাণিত আছে তা এই যে, নবী (সঃ) জুতা এবং মুজার উপরে মুসেহ করেছেন। নাসায়ী ব্যতীত হাদীসের কেতাবগুলোতে এবং মুসনাদে আহমদে মুগীরাহ বিন শু'বার রেওয়ায়েত রয়েছে যে, নবী (সঃ) অযু করলেন (وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ) এবং আপন মুজা এবং জুতার উপর মুসেহ করলেন। আবু দাউদের বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী (রা), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), বারা বিন আযেব (রা), আনাস বিন মালেক (রা), আবু উসামা (রা), সাহল বিন

মুসেহের মুদ্দত

মুসাফিরের জন্যে মুসেহ করার মুদ্দত তিন দিন তিন রাত। মুকীমের জন্যে একদিন এক রাত। এ মুদ্দতের সময় অযু নষ্ট হওয়ার পর থেকে ধরা হবে। মুজা পরিধান করার সময় থেকে ধরা হবে না। যেমন ধরুন, কেউ যোহরের সময় অযু করে মুজা পরলো। তারপর সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় অযু নষ্ট হলো। তাহলে মুকীমের জন্যে পরের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পর্যন্ত মুসেহ দুরস্ত হবে। অর্থাৎ যখনই অযু নষ্ট হবে তখন অযুর সাথে মুসেহ করবে। আর যদি সে মুসাফির হয় তাহলে তৃতীয় দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পর্যন্ত তার মুসেহ করা দুরস্ত হবে। অর্থাৎ নষ্ট হওয়ার সময় থেকে তিন দিন তিনরাত পুরা করার পর মুসেহ করার মুদ্দত খতম হবে। যেমন ধরুন, জুমার দিন সূর্য ডুবার সময় অযু নষ্ট হলো। তাহলে সোমবার সূর্য ডুবার সময় পর্যন্ত মুসেহ করার মুদ্দত থাকবে আর যদি সোমবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সে মাগরেবের জন্যে অযু করে তাহলে পা ধুতে হবে।

সা'দ (রা) এবং আমর বিন হারেস (রা) মুজার উপর মুসেহ করেন। উপরন্তু হযরত ওমর (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) এ কাজ করেছেন বলে বর্ণিত আছে। বরঞ্চ বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রা) এবং আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে এবং তাহাবী আউস্ ইবনে আবি আউস (রা) থেকে এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী (সঃ) শুধু জুতার উপর মুসেহ করেছেন। এতে মুজার উল্লেখ নেই। হযরত আলী (রা)ও এরূপ করতেন বলে বর্ণিত আছে। এসব বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শুধু মুজা এবং শুধু জুতা এবং মুজা পরা অবস্থায় জুতার উপর মুসেহ করাও ঐরূপ জায়েয যেমন চামড়ার মুজার উপর। এসব বর্ণনায় কোথাও এমন পাওয়া যায় না যে, নবী (সঃ) ফকীহগণের আরোপিত শর্তগুলোর মধ্যে কোন একটি শর্তের কথা বলেছেন। আর কোথাও এ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, নবী (সঃ) এবং উপরোক্ত সাহাবীগণ যে মুজার উপর মুসেহ করেছেন তা কোন্ ধরনের ছিল। এ জন্যে আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে, ফকীহগণের আরোপিত শর্তগুলোর কোনই উৎস নেই, যার উপর ভিত্তি করে তারা এসব আরোপ করেছেন। আর ফকীহগণ যেহেতু শরীয়ত প্রণেতা নন, সে জন্যে তাঁদের আরোপিত শর্তের উপর যদি কেউ আমল না করে তাহলে সে গুনাহগার হবে না।

ইমাম শাফী (রহ) এবং ইমাম আহমদের (রহ) অভিমত এই যে, মুজার উপর এ অবস্থায় মুসেহ করা যদি কেউ জুতা পায়ের উপর থেকে পরিধান করে থাকে। কিন্তু উপরে যেসব সাহাবী (রা)-এর আমল বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা কেউই এ শর্তের অনুসরণ করেননি।

মুজার উপর মুসেহ করার বিষয়টির উপর চিন্তা-ভাবনা করে আমি যা বুঝতে পেরেছি তা এই যে, প্রকৃতপক্ষে এটা তায়াম্মুমের ন্যায় একটি সুবিধা দান (Concesion) যা

যে যে কারণে মুসেহ নষ্ট হয়ে যায়

১. যে যে কারণে অযু নষ্ট হয়, সেই সেই কারণে মুসেহ বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ অযু করার পর পুনরায় মুসেহ করতে হবে।

২. কোন কারণে মুজা খুলে ফেলে, অথবা মুজা আপনা আপনি খুলে গেলে অথবা পায়ের অধিকাংশ খুলে গেল বা বাহির হয়ে পড়লে।

৩. মুজা পরা অবস্থায় যদি পা পানিতে ভিজে যায়, সমস্ত পা অথবা পায়ের অধিকাংশ যদি ভিজে যায়।

৪. মুসহে করার মুদ্দত খতম হয়ে গেলে। অর্থাৎ মুকীমের জন্যে একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্যে তিন দিন তিন রাত পার হয়ে গেলে।

শেষোক্ত তিন অবস্থায় পুনরায় অযু করার দরকার নেই, শুধু পা ধুয়ে নিলেই হবে।

আহলে ঈমানকে এমন অবস্থায় দেয়া হয়েছে যখন যেমন করেই হোক পা ঢেকে রাখতে তারা বাধ্য হয় এবং বার বার পা ধোয়া ক্ষতিকর অথবা কষ্টকর হয়। এ সুবিধাদানের ভিত্তি এ ধারণার উপর রাখা হয়নি যে, তাহারাতের পর মুজা পরিধান করলে পা নাজাসাত থেকে রক্ষা পাবে এবং তা আর ধোয়ার প্রয়োজন হবে না। বরঞ্চ তার ভিত্তি হলো আল্লাহ্র রহমত যা বান্দাহকে সুবিধা দানের দাবী জানায়। অতএব ঠাণ্ডা থেকে এবং পথের ধুলিবালি থেকে পা-কে রক্ষা করার জন্যে, পায়ের কোন যখমের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে মানুষ যা কিছুই পরিধান করে এবং যা বার বার খুলে পরিধান করতে কষ্ট হয়, এমন সব কিছুর উপরেই মুসেহ করা যেতে পারে। সেটা পশমী মুজা হোক অথবা সূতী, চামড়ার জুতা হোক অথবা স্ক্রীচ অথবা কোন কাপড়ই হোক যা পায়ের সাথে জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে।

আমি যখন কাউকে দেখি যে, সে অযুর পর মুসেহ করার জন্যে পায়ের দিকে তার হাত বাড়াচ্ছে তখন আমার মনে হয় যেন সে বান্দাহ আল্লাহ্কে বলছে, "হুকুম হলে এক্ষুণি এ মুজা খুলে ফেলে পা ধুয়ে ফেলবো। কিন্তু সকল কর্তৃত্ব প্রভূত্বের মালিক যিনি তিনিই যেহেতু অনুমতি দিয়ে রেখেছেন সে জন্যে মুসেহ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।" আমার কাছে প্রকৃতপক্ষে এই অর্থই মুজার উপর মুসেহ করার সত্যিকার তাৎপর্য। আর এ তাৎপর্যের দিক দিয়ে ঐ সকল জিনিসই একরূপ যা প্রয়োজন অনুসারে মানুষ পরিধান করে, যার সুবিধা দানের লক্ষ্যে মুসেহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (রাসায়েল ও মাসায়েল দ্বিতীয় খণ্ড-পৃঃ ২৫৮)।

এ তথ্যানুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত সার এই যে, সকল প্রকার মুজার উপর নিশ্চিন্ত মনে মুসেহ করা যেতে পারে, তা সে মুজা পশমী হোক অথবা সূতী, রেশমী হোক অথবা চামড়ার, অথবা অয়েল ক্লথ এবং রেক্সিনের হোক না কেন। এমন কি পায়ের উপর কাপড় জড়িয়ে যদি বাঁধা হয় তাহলে তার উপরে মুসেহ করাও জায়েয হবে।

মুসেহ করার কতিপয় মাসয়ালা

১. যদি মুসেহ না করার কারণে ওয়াজেব ছুটে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে মুসেহ করা ওয়াজেব হয়ে পড়বে। যেমন মনে করুন কেউ আশংকা করলো যে, পা ধুয়ে সময় নষ্ট করতে গেলে আরফাতে অবস্থান করার সুযোগ পাওয়া যাবে না, অথবা জামায়াত চলে যাবে অথবা নামাজের ওয়াক্ত চলে যাবে এসব অবস্থায় মুসেহ করা ওয়াজেব হবে।

২. কারো নিকটে এতটুকু পানি আছে যে, তাতে শুধু পা ব্যতীত অন্য অংগসমূহ ধোয়া যায়, তাহলে মুসেহ ওয়াজেব হবে।

৩. মুজা এতো ছোট যে, টাখনু খুলে যায়। তখন চামড়া অথবা কাপড় প্রভৃতি দিয়ে মুজা যদি বাড়ানো যায়, তাহলে তার উপর মুসেহ করা জায়েয হবে।

৪. এমন জুতার উপর মুসেহ করা জায়েয যা টাখনু সমেত গোটা পা ঢেকে রাখে এবং যার দ্বারা পায়ের কোন স্থানের চামড়া দেখা যায় না। তা সে জুতা চামড়ার হোক, রাবার, প্লাষ্টিক অথবা নাইলনের হোক।

৫. যদি কেউ মুজার উপর মুজা পরে থাকে তাহলে উপরের মুজার উপর মুসেহ করলেই যথেষ্ট হবে।

৬. তায়াম্মুমকারীদের জন্যে মুসেহ করার দরকার নেই। গোসলের সাথেও মুজার উপর মুসেহ দুরস্ত হবে না, পা ধোয়া জরুরী।

আল্লামা মওদুদী ছাড়াও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাঁর ফতোয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অনুরূপ ফতোয়াই দিয়েছেন।

হাফেয ইবনে কাইয়েম এবং আল্লামা ইবনে হাযেমের অভিমতও এই যে, বিনা শর্তে সকল প্রকার মুজার উপর মুসেহ করা যেতে পারে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে "তরজুমানুল কুরআন" ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮, রাসায়েল ও মাসায়েল শীর্ষ নিবন্ধ–পৃঃ ৫৩ দ্রষ্টব্য)।

গোসলের বিবরণ

গোসলের পারিভাষিক অর্থ

অভিধানে গোসলের অর্থ হলো সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলা এবং ফেকাহর পরিভাষায় তার অর্থ হলো শরীয়তের বলে দেয়া বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী নাপাকী দূর করার উদ্দেশ্যে অথবা সওয়াবের আশায় সমস্ত শরীর ধোয়া।

গোসল সম্পর্কে সাতটি হেদায়েত

১. গোসলখানায় অথবা খোলা জায়গায় গোসল করতে হলে তহবন্দ, নেকাব অথবা অন্য কাপড় পরে গোসল করতে হবে।

২. হামেশা পর্দা করা স্থানে গোসল করতে হয় যাতে করে পর পুরুষ বা পর স্ত্রীর নজরে না পড়ে।

   এরূপ স্থান না হলে লুংগি প্রভৃতি বেঁধে গোসল করবে। যদি বাঁধবারও কিছু না থাকে তাহলে আঙ্গুল দিয়ে চারদিকে আঁক টেনে বিসমিল্লাহ বলে বসে বসে গোসল করবে।

৩. মেয়েদের উচিত সর্বদা বসে গোসল করা। পুরুষ যদি উলংগ হয় তাহলে বসে বসেই গোসল করবে। তবে লুংগি প্রভৃতি পরে দাঁড়িয়ে গোসল করতে দোষ নেই।

৪. গোসলের সময় কথাবার্তা না বলা উচিত। বিশেষ প্রয়োজন হলে অন্য কথা।

৫. উলংগ হয়ে গোসল করতে কেবলামুখী হওয়া চলবে না।

৬. সর্বদা পাক-সাফ জায়গায় গোসল করবে। গোসলের জায়গায় পেশাব প্রভৃতি করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

৭. যেসব জিনিস অযুতে মাকরুহ তা সবই গোসলে মাকরুহ। এসব থেকে বিরত থাকতে হবে। গোসলের সময় অযুর দোয়া পড়া মাকরুহ।

গোসলের মসনূন তরীকা

সুন্নাত মুতাবিক গোসলের পদ্ধতি এই যে, ডান হাতে পানি নিয়ে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধুবে। তারপর এস্তেঞ্জা করবে তা এস্তেঞ্জার স্থানে কোন নাজাসাত থাক বা না থাক। তারপর শরীরে কোথাও নাজাসাত লেগে থাকলে তা সাফ করতে হবে। তারপর সাবান দিয়ে দু'হাত ভালো করে ধুয়ে অযু করবে। কুল্লি করার সময় কণ্ঠদেশে এবং নাকের ভেতর ভালো করে পানি পৌছাতে হবে। গোসলের স্থানে পানি জমা হয়ে থাকলে গোসলের পর পা ধুবে। গোসল যদি ফরয হয় তাহলে অযুতে বিসমিল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন দোয়া পড়বে না। অযুর পর মাথায় পানি ঢালবে, তারপর ডান কাঁধের উপর, তারপর বাম কাঁধের উপর। সমস্ত শরীর ভালোভাবে ঘষতে হবে। সাবান দিয়ে হোক বা খালি হাতে হোক, যেন কোন স্থান শুকনো না থাকে এবং শরীর ভালভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়।

তারপর দু'বার এভাবে সমস্ত শরীরে ভালভাবে পানি ঢালতে হবে যেন কোন স্থান শুকনো থাকার আশংকা না থাকে। অযুর সময় পা ধোয়া হয়ে না থাকলে, এখন পা ধুতে হবে। তারপর সমস্ত শরীর কোন কাপড় বা গামছা তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মুছে ফেলতে হবে।

গোসলের ফরয

গোসলের মাত্র তিন ফরয

১. কুল্লি করা। কুল্লি করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কণ্ঠদেশ পর্যন্ত সমস্ত মুখে পানি পৌছে।

২. নাকে পানি দেয়া।

৩. সমস্ত শরীরে পানি দেয়া যেন চুল পরিমাণ কোন স্থানে শুকনো না থাকে। চুলের গোড়ায় এবং নখের ভেতর পানি পৌছতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে এ তিনের নামই গোসল। এ তিনটির কোন একটি ছুটে গেলে গোসল হয় না।

চুলের খোঁপা এবং অলংকারের হুকুম

১. খোঁপা খোলা ব্যতীত চুলের গোড়ায় পানি পৌছলে, মেয়েদের জন্যে খোঁপা অথবা বেনী খোলার দরকার হবে না। তবে চুল যদি খুব ঘন হয় অথবা খোঁপা এমন শক্ত করে বাঁধা আছে যে, তা না খুললে পানি পৌছবে না, তাহলে খুলতেই হবে।

২. চুল যদি খোলা হয় তাহলে সব চুল ভিজানো এবং গোড়া পর্যন্ত ভালো করে পানি পৌছাতে হবে যেন একটিও শুকনো না থাকে।

৩. পুরুষ যদি লম্বা চুল রাখে এবং মেয়েদের মতো খোঁপা বাঁধে অথবা এমনি একত্রে বেঁধে রাখে, তাহলে খুলে প্রত্যেক চুল এবং তার গোড়ায় পানি পৌছাতে হবে।

৪. আঁট সাঁট অলংকার যেমন আংটি, গলাবন্দ প্রভৃতি এবং ঐসব অলংকার যা ছিদ্র করে পরা হয়, যেমন নাকের বালি, কানের রিং বা দুল প্রভৃতি, তাহলে সেসব নড়ায়ে চাড়ায়ে তার নীচে পানি পৌছাতে হবে।

গোসলের সুন্নাত

১. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং সওয়াবের নিয়তে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. সুন্নাতের ক্রমানুসারে গোসল করা এবং প্রথমে অযু করা।

৩. দু'হাত কব্জা পর্যন্ত ধোয়া।

৪. শরীর থেকে নাপাক দূর করা এবং ঘষে ঘষে ধোয়া।

৫. মিসওয়াক করা।

৬. সারা শরীরে তিনবার পানি দেয়া।

গোসলের মুস্তাহাব

অর্থাৎ যেসব কাজ করা গোসলে মুস্তাহাব

১. এমন স্থানে গোসল করা যেন মানুষের নজরে না আসে। দাঁড়িয়ে গোসল করলে কাপড় পরা অবস্থায় করতে হবে।

২. ডান দিকে প্রথমে এবং বাম দিকে পরে ধোয়া।

৩. পাক জায়গায় গোসল করা।

৪. অপব্যয় হয় এমন বেশী পানি ব্যবহার না করা এবং এত কম পানি ব্যবহার না করা যাতে শরীর ভালোভাবে না ভিজে।

৫. বসে গোসল করা।

গোসলের হুকুম

গোসলের প্রকার

গোসল তিন উদ্দেশ্যে করা হয়।

১. হাদাসে আকবার থেকে পাক হওয়ার জন্যে। এ গোসল ফরয।

২. সওয়াবের নিয়তে। এ গোসল সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব।

৩. শরীরকে ধুলাবালি ও ময়লা থেকে পরিষ্কার করা। গরমের সময় আরাম লাভ করার জন্যে। এ গোসল মুবাহ।

গোসল ফরয হওয়ার অবস্থা

চার অবস্থায় গোসল ফরয হয়।

১. বীর্যপাত হলে।

২. পুরুষাংগের মাথা স্ত্রীর অংগে প্রবেশ করালে।

৩. হায়েয হলে।

৪. নেফাসের রক্ত বেরুলে।

গোসল ফরয হওয়ার প্রথম অবস্থা

কামভাবসহ পুরুষ বা নারীর বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়। বীর্যপাত অনেক ভাবে হতে পারে, যেমন–

* রাতে বা দিনে স্বপ্নদোষ হলে–স্বপ্নে কিছু দেখে হোক না দেখে হোক।

* কোন পুরুষ, নারী অথবা কোন প্রাণীর সাথে সহবাসে বীর্যপাত হলে।

* চিন্তা ধারণার মাধ্যমে অথবা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী গল্প উপন্যাস পাঠ করে।

* হস্ত মৈথুন বা অন্য কোন উপায়ে বীর্যপাত হলে।

মোটকথা যেমন করেই হোক কামভাব ও কামেচ্ছাসহ বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হবে।*

বীর্যপাত সম্পর্কে কিছু মাসয়ালা

১. কোন উপায়ে কিছুটা বীর্য বের হলো এবং সে ব্যক্তি গোসল করলো। তারপর আবার কিছুটা বীর্য বের হলো তার প্রথম গোসল বাতিল হবে, দ্বিতীয় বার গোসল করতে হবে।

২. এক ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নদোষে যৌন আস্বাদ উপভোগ করলো। কিন্তু ঘুম থেকে জাগার পর কাপড়ে বীর্যের কোন চিহ্ন দেখতে পেলো না। তার গোসল ফরয হবে না।

৩. ঘুম থেকে উঠার পর কেউ দেখলো তার কাপড়ে বীর্য লেগে আছে কিন্তু স্বপ্নদোষের (ইহতেলাম) কথা মনে পড়ে না। তার গোসল ওয়াজেব হবে।

৪. ঘুমের মধ্যে যৌন আস্বাদ পাওয়া গেছে কিন্তু কাপড়ে যে চিহ্ন বা আদ্রতা সে সম্পর্কে নিশ্চিত যে তা বীর্য নয়, মুযী বা অদী। তাহলে সকল অবস্থায় গোসল ফরয হবে।

৫. কারো খাতনা হয়নি এবং বীর্য বের হয়ে চামড়ার মধ্যে রয়ে গেছে যা কেটে ফেলা হয়। তাহলেও গোসল ফরয হবে।

৬. কারো যে কোন উপায়ে যৌন আস্বাদ উপভোগ হয়েছে কিন্তু ঠিক বীর্যপাতের সময় লিংগ চেপে ধরে বীর্য বাইরে আসতে দেয়নি। তারপর চরম আনন্দ শেষ হওয়ার পর বীর্য বের হলো। (গোসল ফরয হবে)।

গোসল ফরয হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

পুরুষের পুংলিঙ্গ যদি কোন জীবিত মানুষের দেহে প্রবেশ করে তাহলে গোসল ফরয হবে এ জীবিত মানুষ নারী হোক, পুরুষ হোক, মুখান্নাস বা হিজড়া হোক, দেহের প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে হোক, বাহ্যদ্বার দিয়ে হোক, বীর্য বেরুক অথবা না বেরুক সকল অবস্থায় গোসল ফরয হবে।

---

* প্রকাশ থাকে যে এখানে যেহেতু গোসল ফরয হওয়ার ফেকাহর হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে সে জন্যে বীর্যপাতের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। নতুবা আপন বিবির সাথে সহবাস এবং স্বপ্নদোষ (ইহতেলাম) ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বীর্যপাত করা চরম অজ্ঞতা এবং গুনাহের কাজ।

কর্মকারী এবং যার উপর কর্ম করা হলো উভয়ে বালেগ ও সজ্ঞান হলে উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। নতুবা দু'জনের মধ্যে যে বালেগ সজ্ঞান হবে শুধু তার উপর ফরয হবে।*

গোসল ফরয হওয়ার কতিপয় মাসয়ালা

১. কোন পুরুষ যদি তার পুরুষাংগ কোন অল্প বয়স্ক বালিকার অংগে প্রবেশ করায় এবং এ আশংকা না হয় যে, তার অগ্র পশ্চাৎ অংগ সে কারণে ফেটে একাকার হয়ে গেছে, তাহলে পুরুষের উপর গোসল ফরয হবে।

২. কোন মেয়ে লোক যদি কামরিপুর তাড়নায় অধীর হয়ে কোন কামহীন পুরুষের অথবা কোন পশুর বিশেষ অংগ অথবা কোন বস্তু প্রভৃতি তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয় তাহলে তার বীর্যপাত হোক বা না হোক গোসল ফরয হবে।

৩. খাসি করা পুরুষের পুরুষাংগ যদি কোন নারী বা পুরুষের দেহে প্রবেশ করে তথাপি গোসল ফরয হবে। উভয়ে আকেল ও বালেগ হলে উভয়ের উপর, নতুবা যে আকেল ও বালেগ হবে তার উপর।

৪. কোন পুরুষ তার পুংলিঙ্গে কাপড়, রবার অথবা অন্য কিছু জড়িয়ে কারো দেহে প্রবেশ করালে গোসল ফরয হবে।

গোসল ফরয হওয়ার তৃতীয় কারণ

গোসল ফরয হওয়ার তৃতীয় কারণ বা অবস্থা হলো হায়েযের রক্ত। হায়েযের মুদ্দত কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত। উর্ধপক্ষে ১০ দিন ১০ রাত। দু'হায়েযের মধ্যে পাক থাকার মুদ্দত কমপক্ষে ১৫ দিন। অর্থাৎ তিন দিনের কম যদি রক্ত আসে তাহলে গোসল ফরয হবে না। এক হায়েয বন্ধ হওয়ার পর ১৫ দিনের পূর্বে রক্ত এলে তাও হায়েয হবে না। সে জন্যে গোসল ফরয হবেনা।

---

* এখানে যা কিছু বলা হচ্ছে গোসল ফরয হওয়ার হুকুম বলা হচ্ছে। নতুবা নিজের বিবির সামনের দ্বার ব্যতীত পেছন দ্বার (বাহ্যদ্বার) এবং অন্য মানুষের যে কোন দ্বারে নিজের লিংগ প্রবেশ করানো ভয়ানক গুনাহ।

গোসল ফরয হওয়ার চতুর্থ কারণ

চতুর্থ কারণ হলো নেফাসের রক্ত। ঐ রক্তের উপর নেফাসের হুকুম হবে যা অর্ধেক বাচ্চা বের হওয়ার পর আসে। তার পূর্বে যে রক্ত আসবে তা নেফাসের নয়। তার জন্যে গোসল ফরয হবে না। নেফাসের মুদ্দত উর্ধপক্ষে ৪০ দিন ৪০ রাত। তারপর যে রক্ত আসবে তাতে গোসল ফরয হবে না। বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর কোন মেয়েলোকের যদি মোটেই কোন রক্ত না আসে তাহলে গোসল ফরয হবে না। অবশ্য সাবধানতার জন্যে গোসল করা ভালো।

যে যে অবস্থায় গোসল ফরয হয় না

১. মুযী এবং অদী বের হলে এবং এস্তেহাযার রক্ত বেরুলে গোসল ফরয হবে না।

২. পুংলিঙ্গ তার মাথার কম পরিমাণ ভেতরে প্রবেশ করলে গোসল ফরয হবে না।

৩. স্ত্রী লিঙ্গে পুরুষের বীর্য সহবাস ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রবেশ করলে গোসল ফরয হবে না।

৪. কারো নাভিতে পুরুষাংগ প্রবেশ করলে গোসল ফরয হবে না।

যে যে অবস্থায় গোসল সুন্নাত

১. জুমার দিন জুমার নামাযের জন্যে গোসল সুন্নাত।

২. দুই ঈদের নামাযের জন্যে গোসল সুন্নাত।

৩. হজ্ব অথবা ওমরার ইহরামের জন্যে গোসল সুন্নাত।

৪. হাজীদের জন্যে আরফাতের দিনে বেলা পড়ার পর গোসল সুন্নাত।

যে যে অবস্থায় গোসল মুস্তাহাব

১. ইসলাম গ্রহণের জন্যে গোসল করা মুস্তাহাব।

২. মুর্দা গোসল দেয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।

৩. মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সংজ্ঞাহীনতা দূর হওয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।

৪. শাবানের ১৫ই রাতে গোসল মুস্তাহাব।

৫. মক্কা মুয়ায্যামা ও মদীনা শরীফে প্রবেশের আগে গোসল মুস্তাহাব।

৬. সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্যে গোসল মুস্তাহাব।

৭. মুযদালফায় অবস্থানের জন্যে ১০ তারিখের ফজর বাদে গোসল।

৮. পাথর মারার সময় গোসল।

৯. কোন গুনাহ থেকে তওবা করার জন্যে গোসল।

১০. কোন দ্বীনি মাহফিল বা অনুষ্ঠানে যোগদানের পূর্বে এবং নতুন পোশাক পরার পূর্বে গোসল।

১১. সফর থেকে বাড়ী পৌঁছার পর গোসল।

যে যে অবস্থায় গোসল মুবাহ

ধূলাবালি ময়লা থেকে শরীর রক্ষা করার জন্যে, গরমের তাপ থেকে শরীর রক্ষা করে ঠাণ্ডা করার জন্যে শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর করার জন্যে গোসল করা মুবাহ।

গোসলের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. কেউ যদি হাদাসে আকবারের অবস্থায় নদী–নালা বা পুকুরে ডুব দেয় অথবা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার সমস্ত শরীরে যদি পানি প্রবাহিত হয়ে যায় সে কুল্লিও করে, নাকে পানিও দেয় তাহলে তার গোসল আদায় হয়ে যাবে এবং হাদাসে আকবার থেকে পাক হয়ে যাবে।

২. কেউ যদি গোসলের পূর্বে অযু না করে তাহলে গোসলের পর আলাদা করে অযু করার দরকার নেই। কেননা, গোসলে ঐসব অংগই ধোয়া হয়েছে যা অযুতে ধোয়া ফরয ছিল। সে জন্যে গোসলের সাথে অযুও হয়ে গেছে।

৩. গোসল করার সময় কুল্লি করা হয়নি তবে খুব মুখ ভরে পানি খেয়ে নিয়েছে যাতে সমস্ত মুখে পানি পৌঁছে গেছে। এমন অবস্থায় গোসল দুরস্ত হবে। কেননা, কুল্লি করার উদ্দেশ্যই হলো মুখের সব স্থানে পানি পৌঁছানো এবং তা হয়ে গেছে।

৪. মাথায় খুব ভাল করে তেল মালিশ করা হয়েছে অথবা শরীরেও মালিশ করা হয়েছে। তারপর শরীরে পানি পড়ার পর পানি পিছলে পড়লো শরীরের লোম কূপে ঢুকলো না। তাতে কোন ক্ষতি নেই। গোসল দুরস্ত হবে।

৫. নখের মধ্যে আটা লেগে শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে অথবা অন্য কোন সৌন্দর্য সামগ্রী লাগানো হয়েছে। তা উঠিয়ে না ফেললে নীচ পর্যন্ত পানি পৌঁছে না। এমন অবস্থায় তা উঠিয়ে না ফেললে গোসল দুরস্ত হবে না।

৬. রোগের কারণে মাথায় পানি দেয়া ক্ষতিকর হলে মাথা ব্যতীত সমস্ত শরীরে পানি দিলে গোসল হয়ে যাবে। ক্ষতির আশংকা না থাকলে মাথায় পানি দিতে হবে।

হাদাসে আকবারের হুকুমাবলী

১. হাদাসে আকবার অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। তবে অনিবার্য কারণে প্রবেশ করতে হলে তায়াম্মুম করে যাওয়ার অনুমতি আছে। যেমন কারো বাসস্থানের পথ মসজিদের ভেতর দিয়ে এবং বাইরে বেরুবার অন্য কোন পথ নেই এবং পানির ব্যবস্থাও মসজিদে। বাইরে কোন পানির কল, কুয়া বা পুকুর নেই। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম করে মসজিদে যাওয়া যায়। কিন্তু কাজ সেরে তৎক্ষণাৎ বাইরে আসতে হবে।

২. হাদাসে আকবার অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা হারাম।

৩. কুরআন পাক তেলাওয়াতও হারাম, এক আয়াতই হোক না কেন।

৪. কুরআন পাক স্পর্শ করাও হারাম। অবশ্যি যেসব শর্তে হাদাসে আসগার অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয, সেসব শর্তে জায়েয হবে।

৫. যেসব কাজ হাদাসে আসগার অবস্থায় নিষিদ্ধ তা হাদাসে আকবারেও নিষিদ্ধ। যেমন নামায পড়া, সিজদায়ে তেলাওয়াত, সিজদায়ে শোকর প্রভৃতি।

৬. হাদাসে আকবার অবস্থায় ঈদগায় যাওয়া দুরস্ত এবং দ্বীনি তালীমের স্থানে যাওয়াও জায়েয।

৭. কুরআন পাকের ঐসব আয়াত তেলাওয়াত করা জায়েয যার মধ্যে হামদ, তাসবীহ এবং দোআ আছে, যেমন –

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ –

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ –

৮. দোয়ার নিয়তে সূরায়ে ফাতেহা এবং দোয়া কুনুত পড়া জায়েয।

৯. হায়েয ও নেফাস অবস্থায় রোযা রাখা হারাম।

১০. হায়েয ও নেফাসের সময় বিবির সাথে সহবাস হারাম। অবশ্য সহবাস ব্যতীত চুমো দেয়া, আদর করা, একত্রে শয়ন করা প্রভৃতি জায়েয, বরঞ্চ এ অবস্থায় বিবির সাথে মেলামেশা বন্ধ করা মাকরুহ।

তায়াম্মুমের বয়ান

তাহারাত হাসিল করার আসল মাধ্যম পানি যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ মেহেরবানীতে বান্দাদের জন্যে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে রেখেছেন। তথাপি এমন অবস্থার সৃষ্টিও হতে পারে যে, কোন স্থানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা পাওয়া গেলেও পানি দিয়ে তাহারাত হাসিল করা মানুষের সাধ্যের বাইরে, অথবা পানি ব্যবহারে ভীষণ ক্ষতির আশংকা রয়েছে। এসব অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালা অতিরিক্ত মেহেরবানী এই করেছেন যে, তিনি মাটি দিয়ে তাহারাত হাসিল করার অনুমতি দিয়েছেন। তার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন যাতে করে বান্দাহ দ্বীনের উপর আমল করতে কোন অসুবিধা বা সংকীর্ণতার সম্মুখীন না হয়।

কুরআনে আছে–

فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(المائده ٦)

"আর তোমরা যদি পানি না পাও, তাহলে পাক মাটি দিয়ে কাজ সেরে নাও। তাতে হাত মেরে চেহারা এবং হাত দুটির উপর মুসেহ কর। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সংকীর্ণতার মধ্যে ফেলতে চাননা। বরঞ্চ তিনি তোমাদেরকে পাক করতে চান এবং চান যে তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিবেন যাতে তোমরা শোকরগোযার হতে পার"। (মায়েদাহ ঃ ৬)।

তায়াম্মুমের অর্থ

অভিধানে তায়াম্মুম শব্দের অর্থ হচ্ছে ধারণা ও ইচ্ছা করা। ফেকাহের পরিভাষায় এর অর্থ হলো মাটির দ্বারা নাজাসাতে হুকমী থেকে পাক হওয়ার এরাদা করা। তায়াম্মুম অযু এবং গোসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। অর্থাৎ তার দ্বারা হাদাসে আসগার এবং হাদাসে আকবার উভয় থেকেই পাক হওয়া যায়। তায়াম্মুমের এ অনুমতি নবী পাক (সঃ)–এর উম্মতের উপর এক বিশিষ্ট দান। যে উম্মতের কাজের পরিধি ও পরিসর গোটা দুনিয়ার মানবতা এবং যার সময়কাল কেয়ামত পর্যন্ত, তার এ সুবিধা (Concession) লাভ করার অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবেই রয়েছে যাতে করে যে কোন যুগে যে কোন অবস্থায় এবং দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে দ্বীনি আহকামের উপর আমল করার ব্যাপারে উম্মাকে কোন সংকীর্ণতা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।

কি কি অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয

১. এমন এক স্থানে অবস্থান যেখানে পানি পাওয়ার কোন আশা নেই। কারো কাছে জানারও উপায় নেই এবং এমন কোন নিদর্শনও পাওয়া যায়না যে, এখানে পানি পাওয়া যেতে পারে। অথবা পানি এক মাইল অথবা আরও দূরবর্তী স্থানে আছে এবং সেখানে যেতে বা সেখান থেকে পানি আনতে ভয়ানক কষ্ট হবার কথা। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

২. পানি আছে তবে তার পাশে শত্রু আছে অথবা হিংস্র পশু বা প্রাণী আছে, অথবা ঘরের বাইরে পানি আছে কিন্তু চোর–ডাকাতের ভয় আছে, অথবা কুয়া আছে কিন্তু পানি উঠাবার কিছু নেই, অথবা কোন মেয়ে মানুষের জন্যে বাইর থেকে পানি আনা তার ইযযাত আবরুর জন্যে ক্ষতিকারক। এমন সব অবস্থাতে তায়াম্মুম জায়েয।

৩. পানি নিজের কাছেই রয়েছে। কিন্তু পরিমাণে এতো কম যে, যদি তা দিয়ে অযু বা গোসল করা হয় তাহলে পিপাসায় কষ্ট হবে অথবা খানা পাকানো যাবেনা, তাহলে তায়াম্মুম জায়েয হবে।

৪. পানি আছে কিন্তু ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা আছে, অথবা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে অবশ্য কোন কুসংস্কারবশে নয়, যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তি শীতের দিনে গরম পানি দিয়ে অযু গোসল করতে অভ্যস্ত, তার অযু বা গোসলের প্রয়োজন হলে এবং পানিও আছে কিন্তু তা ঠাণ্ডা পানি। তার অভিজ্ঞতা আছে যে, ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করলে তার

অসুখ হয় অথবা স্বাস্থ্যের হানি হয়। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয। গরম পানির অপেক্ষায় নাপাক থাকা অথবা নামায কাযা করা ঠিক নয়, বরঞ্চ তায়াম্মুম করে পাক হবে এবং নামায ইত্যাদি আদায় করবে।

৫. পানি পাওয়া যায় কিন্তু পানিওয়ালা ভয়ানক চড়া দাম চায়, অথবা পানির দাম ন্যায়সংগত কিন্তু অভাবগ্রস্ত লোকের সে দাম দেয়ার সংগতি নেই, অথবা দাম দেয়ার মতো পয়সা আছে কিন্তু পথ খরচের অতিরিক্ত নেই এবং তা দিয়ে পানি কিনলে অসুবিধায় পড়ার আশংকা আছে এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

৬. পানি আছে কিন্তু এতো শীত যে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে প্রাণ যেতে পারে অথবা পক্ষাঘাত রোগ হতে পারে অথবা কোন রোগ যেমন নিউমুনিয়া প্রভৃতির আশংকা আছে, পানি গরম করার সুযোগও নেই এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

৭. অযু বা গোসল করলে এমন নামায চলে যাওয়ার আশংকা আছে যার কাযা নেই, যেমন জানাযা, ঈদের নামায, কসুফ ও খসুফের নামায, তাহলে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে।

৮. পানি ঘরেই আছে কিন্তু এতো দুর্বল যে উঠে পানি নেয়ার ক্ষমতা নেই, অথবা টিউবওয়েল চালাতে পারবে না। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

৯. কেউ রেল, জাহায অথবা বাসে সফর করছে। যানবাহন ক্রমাগত চলতেই আছে এবং যানবাহনে পানি নেই, অথবা পানি আছে কিন্তু এতো ভিড় যে, তাতে অযু করা সম্ভব নয়, অথবা যানবাহন কোথাও থামলো এবং নীচে নামলে তা ছেড়ে দেয়ার আশংকা রয়েছে, অথবা কোন কারণে নীচে নামাই গেল না এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

১০. শরীরের অধিকাংশ স্থানে যখম অথবা বসন্ত হয়েছে তাহলে তায়াম্মুম জায়েয।

১১. সফরে পানি সংগে আছে। কিন্তু সামনে কোথাও পানি পাওয়া না যেতে পারে যার ফলে পিপাসায় কষ্ট হবে। অথবা প্রাণ যাওয়ারই আশংকা আছে এমন অবস্থায় পানি সংরক্ষণ করে তায়াম্মুম করা জায়েয।

তায়াম্মুমের মসনূন তরীকা

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে তারপর দু'হাতের তালু একটু প্রসারিত করে ধীরে পাক মাটির উপর মারবে। বেশী

ধূলাবালি হাতে লেগে গেলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা মুখ দিয়ে ফুঁক দিয়ে তা ফেলে দেবে। তারপর দু'হাত এভাবে সমস্ত মুখমণ্ডলের উপরে মৃদু মর্দন করবে যাতে চুল পরিমাণ স্থান বাদ পড়ে না যায়। দাঁড়িতে খেলালও করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় বার এভাবে মাটির উপর হাত মেরে এবং হাত ঝেড়ে নিয়ে প্রথমে বাম হাতের চার আংগুলের মাথার নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আংগুলের উপর থেকে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর বাম হাতের তালু কনুইয়ের উপরের অংশের উপর মর্দন করে হাতের পিঠের উপর দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং আঙ্গুলগুলোর খেলালও করবে। এভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মর্দন করবে। হাতে কোন ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নীচেও মর্দন করা জরুরী।

তায়াম্মুমের ফরযগুলো

তায়াম্মুমের তিন ফরয ঃ

১. আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে পাক হওয়ার নিয়ত করা।

২. দু'হাত মাটির উপর মৃদু আঘাত করে সমস্ত চেহারার উপর মর্দন করা।

৩. তারপর দু'হাত মাটির উপর মৃদু আঘাত করে বা মেরে নিয়ে কনুই পর্যন্ত দু'হাত মর্দন করা।

তায়াম্মুমের সুন্নাত

১. তায়াম্মুমের প্রথমে বিসমিল্লাহ বলা।

২. মসনূন তরীকায় তায়াম্মুম করা। অর্থাৎ প্রথমে চেহারা মুসেহ করা এবং তারপর দুহাত কনুই পর্যন্ত মুসেহ করা।

৩. পাক মাটির উপর হাতের ভেতর দিক মারতে হবে, পিঠের দিক নয়।

৪. হাত মাটিতে মারার পর মাটি ঝেড়ে ফেলা।

৫. মাটিতে হাত মারার সময় আংগুলগুলো প্রসারিত রাখা যাতে ভেতরে ধূলা পৌঁছে যায়।

৬. অন্ততপক্ষে তিন আঙ্গুল দিয়ে চেহারা ও হাত মুসেহ করা।

৭. প্রথম ডান হাত পরে বাম হাত মুসেহ করা।

৮. চেহারা মুসেহ করার পর দাড়ি খেলাল করা।

যেসব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয বা নাজায়েয হয়

১. পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয তো বটে, উপরন্তু মাটির ধরনের সকল বস্তু দিয়েই জায়েয। যে সব বস্তু আগুনে জ্বালালে ছাই হয়ে যায়না নরম হয়ে যায়না, মাটির মতই, যেমন সুরমা, চুন, ইট, পাথর, বালু কংকর মরমর পাথর অথবা আকীক, ফিরোজা প্রভৃতি এ সব দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয।

২. ঐ সব জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম নাজায়েয যা মাটির ধরনের নয়, যা আগুনে দিলে জ্বলে ছাই হয়ে যায় অথবা গলে যায়। যেমন, কাঠ, লোহা, সোনা, চাঁদি, তামা, পিতল, কাঁচ, রং এবং সকল প্রকার ধাতব দ্রব্যাদি, কয়লা, খাদ্য শস্য, কাপড়, কাগজ, নাইলন, প্লাষ্টিক, ছাই এ সব দিয়ে তায়াম্মুম নাজায়েয।

৩. যেসব জিনিসে তায়াম্মুম নাজায়েয তার উপর যদি এতোটা ধূলোবালি জমে যায় যে, হাত মারলে উড়ে যায়, অথবা হাত রেখে টানলে দাগ পড়ে, তাহলে তা দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয হবে। যেমন কাপড়ের থানের উপর ধূলা পড়েছে চেয়ার টেবিলে ধূলা পড়েছে, অথবা কোন মানুষের গায়ে ধূলা পড়েছে।

৪. যেসব জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয, যেমন মাটি, ইট, পাথর, মাটির পাত্র প্রভৃতি, এসব যদি একেবারে ধোয়া হয় এবং তার উপর কোনরূপ ধূলাবালি না থাকে, তথাপি তা দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয হবে।

যেসব জিনিসে তায়াম্মুম নষ্ট হয়

১. যেসব জিনিসে অযু নষ্ট হয় ঐসব দিয়ে তায়াম্মুম নষ্ট হবে। যেসব কারণে গোসল ওয়াজেব হয়, সে কারণে অযুর বদলে তায়াম্মুম এবং গোসলের বদলে তায়াম্মুম উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়।

২. অযু এবং গোসল উভয়ের জন্যে একই তায়াম্মুম করলে যদি অযু নষ্ট হয় তাহলে অযুর তায়াম্মুম নষ্ট হবে কিন্তু গোসলের তায়াম্মুম নষ্ট হবেনা। তবে গোসল ওয়াজেব হয় এমন কোন কারণ ঘটলে গোসলের তায়াম্মুমও নষ্ট হবে।

৩. যদি নিছক পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে তাহলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম নষ্ট হবে।

৪. কোন ওযর অথবা রোগের কারণে যদি তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে তারপর ওযর অথবা রোগ রইলো না, তখন তায়াম্মুম নষ্ট হবে। যেমন কেউ ভয়ানক ঠান্ডার জন্যে অযু না করে তায়াম্মুম করলো, তারপর গরম পানির ব্যবস্থা হলো, তখনই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে।

৫. পানির নিকটে কোন সিংস্র জন্তু, সাপ অথবা শত্রু থাকার কারণে অযুর বদলে তায়াম্মুম করা হয়েছে। এখন যেই মাত্র এ আশংকা দূরীভূত হবে, তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে।

৬. কেউ যদি রেল, জাহায অথবা বাসে ভ্রমণকালে পানির অভাবে তায়াম্মুম করে, অতপর পথ অতিক্রম করার সময় পথে নদীনালা, পুকুর, ঝর্ণা প্রভৃতি দেখতে পায়। কিন্তু যেহেতু চলন্ত গাড়ী বা জাহাযে পানির ব্যবহার করার কোনই সুযোগ নেই, সে জন্যে তার তায়াম্মুম নষ্ট হবেনা।

৭. কোন ব্যক্তি কোন একটি ওযরের কারণে তায়াম্মুম করলো, শেষে ওযর শেষ হলো কিন্তু দ্বিতীয় একটি ওযর সৃষ্টি হলো। তথাপি প্রথম ওযর শেষ হওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে গেল। যেমন ধরুন, পানি না পাওয়ার জন্যে কেউ তায়াম্মুম করলো। কিন্তু পরে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই সে এমন অসুস্থ হয়ে পড়লো যে পানি ব্যবহার তার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি তার প্রথম তায়াম্মুম শেষ হয়ে যাবে যা পানি না পাওয়ার কারণে হয়েছিল।

৮. কেউ অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করেছিল। তারপর অযু করার পরিমাণ পানি পেয়ে গেল। তখন তার তায়াম্মুম চলে গেল। কেউ যদি গোসলের পরিবর্তে অর্থাৎ হাদাসে আকবার থেকে পাক হওয়ার জন্যে তায়াম্মুম করলো তারপর এতটুকু পানি পেলো যে তার দ্বারা শুধু অযু হতে পারে কিন্তু গোসল হবেনা। তাহলে গোসলের তায়াম্মুম নষ্ট হবেনা।

তায়াম্মুমের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. কেউ পানির অভাবে তায়াম্মুম করলো এবং নামায পড়লো। নামায শেষে পানি পেয়ে গেল। এ পানি ওয়াক্তের মধ্যে পেয়ে গেলেও নামায দ্বিতীয় বার পড়তে হবেনা।

২. পানির অভাবে অথবা কোন রোগ বা অক্ষমতার কারণে যখন মানুষ তায়াম্মুমের প্রয়োজন বোধ করে, তখন নিশ্চিত মনে তায়াম্মুম করে

দ্বীনি ফারায়েয আদায় করবে। এ ধরনের কোন প্ররোচণা যেন তাকে পেরেশান না করে যে, শুধু পানির দ্বারাইতো পাক হওয়া যায়, তায়াম্মুমের দ্বারা কি হবে। পাক নাপাকের ব্যাপার পানি বা মাটির উপর নির্ভর করেনা, আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর নির্ভর করে। আর আল্লাহ্‌র শরীয়ত যখন মাটি দ্বারা পাক হয়ে নামাযের অনুমতি দিয়েছে, তখন বুঝতে হবে যে, তায়াম্মুমের দ্বারাও তেমন তাহারাত হাসিল করা যায় যেমন অযু গোসলের দ্বারাও করা যায়।

৩. কেউ যদি মাঠে ময়দানে পানির তালাশ করে তায়াম্মুম করে নামায পড়লো। তারপর জানা গেল যে, নিকটেই পানি ছিল। তথাপি তায়াম্মুম এবং নামায উভয়ই দুরস্ত হবে। অযু করে নামায দুহরাবার দরকার নেই।

৪. সফরে যদি অন্য কারো নিকটে পানি থাকে এবং মনে হয় যে, চাইলে পাওয়া যাবে, তাহলে চেয়ে নিয়ে অযুই করা উচিত। আর যদি মনে হয় যে, চাইলে পাওয়া যাবেনা, তাহলে তায়াম্মুম করাই ঠিক হবে।

৫. অযু এবং গোসল উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম দুরস্ত আছে। অর্থাৎ হাদাসে আসগার এবং হাদাসে আকবার উভয় থেকে পাক হওয়ার জন্যে তায়াম্মুম করা দুরস্ত আছে এবং তায়াম্মুমের পদ্ধতি ঐ যা উপরে বয়ান করা হয়েছে। দুইয়ের জন্যে আলাদা আলাদা তায়াম্মুমেরও দরকার নেই। একই তায়াম্মুম উভয়ের জন্যে যথেষ্ট। যেমন, এক ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে। সে তায়াম্মুম করলো। এখন এ তায়াম্মুমে সে নামাযও পড়তে পারবে। অযুর জন্যে আলাদা তায়াম্মুমের দরকার নেই।

৬. তায়াম্মুমে এ বাধ্যবাধকতা নেই যে, এক তায়াম্মুমে একই ওয়াক্তের নামায পড়তে হবে। বরঞ্চ যতোক্ষণ তা নষ্ট না হয়, ততোক্ষণ কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়তে পারবে। এভাবে ফরয নামাযের জন্যে যে তায়াম্মুম করা হবে তা দিয়ে ফরয, সুন্নাত, নফল, জানাযা, সিজদায়ে তেলাওয়াত। কিন্তু শুধু কুরআন পাক স্পর্শ করার জন্যে, মসজিদে প্রবেশ করার জন্যে, কুরআন তেলাওয়াতের জন্যে অথবা কবরস্থানে যাওয়ার জন্যে যে তায়াম্মুম করা হয় তার দ্বারা নামায প্রভৃতি পড়া দুরস্ত হবেনা।

৭. পানি আছে কিন্তু অযু বা গোসল করতে গেলে নামাযে জানাযা, ঈদের নামায, কুসুফ ও খসুফের নামায প্রভৃতি পাওয়া যাবেনা তাহলে এ অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামাযে শরীক হওয়া জায়েয। কারণ অন্য সময়ে এ সব নামাযের কাযা হয়না।

৮. কেউ যদি অক্ষম হয় এবং নিজ হাতে তায়াম্মুম করতে না পারে তাহলে অন্য কেউ তাকে মাসনূন তরীকায় তায়াম্মুম করিয়ে দেবে। অর্থাৎ তার হাত মাটিতে মেরে প্রথমে চেহারা পরে হাত ঠিকমতো মুছে দেবে।

৯. কারো নিকটে দুটি পাত্রে পানি আছে, একটিতে পাক পানি অন্যটিতে নাপাক পানি। এখন তার জানা নেই কোনটিতে পাক আর কোনটিতে নাপাক পানি। এ অবস্থায় তার তায়াম্মুম করা উচিত।

১০. মাটির একটা ঢিলে একই জন কয়েকবার তায়াম্মুম করতে পারে। ঐ একটি ঢিলে কয়েক জনের তায়াম্মুমও জায়েয। যে মাটিতে তায়াম্মুম করা হয় তার হুকুম মায়ে মুস্তা'মালের (ব্যবহৃত পানির) মতো নয়।

كِتَابُ الصَّلٰوة

সালাত অধ্যায়

নামাযের অধ্যায়

নামাযের বয়ান

ঈমানের পর ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামায। উচিত তো এই ছিল যে, আকায়েদের অধ্যায়ের পরেই নামাযের হুকুম ও মাসয়ালা বয়ান করা। কিন্তু যেহেতু নামায আদায় করার জন্যে সকল প্রকার নাজাসাত থেকে পাক হওয়া অপরিহার্য, সে জন্যে তাহারাতের বিশদ বিবরণের পর নামাযের হুকুম ও মাসয়ালা বয়ান করা হচ্ছে।

নামাযের অর্থ

নামায আমাদের একটি সুপরিচিত শব্দ। কুরআনের পরিভাষায় 'সালাতের' স্থলে নামায ব্যবহৃত হয়। সালাত (صلٰوة) এর আভিধানিক অর্থ কারো দিকে মুখ করা, অগ্রসর হওয়া, দোআ করা এবং নিকটবর্তী হওয়া। কুরআনের পরিভাষায় নামাযের অর্থ হলো আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ দেয়া, তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া, তাঁর কাছেই চাওয়া এবং তাঁর একেবারে নিকট হওয়া। এ এবাদত পদ্ধতির আরকানের শিক্ষা কুরআন দিয়েছে এবং তার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি পদ্ধতি নবী পাক (সঃ) শিখিয়ে দিয়েছেন।

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

(الاعراف : ٢٩)

"এবং প্রত্যেক নামাযে নিজের দৃষ্টি ঠিক আল্লাহ্‌র দিকে রাখ এবং আন্তরিক আনুগত্যের সাথে তাঁকে ডাকো।" (আ'রাফ ঃ ২৯)

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ – (العلق ١٩)

এবং সিজদা কর এবং আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হও" (আলাক ঃ ১৯)

হাদীসে আছে ঃ

-বান্দাহ ঐ সময়ে তার আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, যখন সে আল্লাহ্‌র সামনে সিজাদায় থাকে (মুসলিম)।

-তোমাদের মধ্যে যখন কেউ নামাযে রত হয়, তখন সে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করে (বুখারী)।

কিন্তু আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ দেয়া, তাঁর নিকটবর্তী হওয়া ও তাঁর কাছে চাওয়ার তরীকা কি? তার একটি মাত্র উত্তরই সঠিক। তা ছাড়া আর যতো উত্তর তা সব ভুল এবং পথভ্রষ্টকারী। নবী (সঃ) যে তরীকা বলে দিয়েছেন তাই হচ্ছে সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং গৃহীত। নামাযের আরকান, নামাযের আযকার, সময়, রাকয়াতাদি এবং বিস্তারিত পদ্ধতি নবী (সঃ) শুধু মুখ দিয়েই শিক্ষা দেননি, বরঞ্চ সারা জীবন তার উপর আমল করে দেখিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর কথা ও আমল হাদীসের অতি নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে সংরক্ষিত আছে। এ নিয়ম পদ্ধতিতে হরহামেশা গোটা উম্মত নামায আদায় করে সকল রকম সন্দেহ থেকে একে পবিত্র রেখেছেন।

নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব

ঈমান আনার পরে একজন মুসলমানের কাছে সবচেয়ে প্রথম দাবী এই যে, সে নামায কায়েম করবে। আল্লাহ্‌ তায়ালার এরশাদ হচ্ছে ঃ-

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ - (طٰهٰ ١٤)

"নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব শুধু আমারই বন্দেগী কর এবং আমার ইয়াদের জন্যে নামায কায়েম কর।"

(তাহা ঃ ১৪)

আকায়েদের ব্যাপারে যেমন আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান গোটা দ্বীনের উৎস, তেমনি আমলের ব্যাপারে নামায হচ্ছে গোটা দ্বীনের আমলের ভিত্তি। এটাই কারণ যে, কুরআন পাকে সকল এবাদতের মধ্যে নামাযের সব চেয়ে বেশী তাকীদ করা হয়েছে। এবং তা কায়েম করার উপরে এত জোর দেয়া হয়েছে যে, তার উপরেই যেন গোটা দ্বীন নির্ভরশীল।

নামায ব্যতীত অন্য এবাদতগুলো বিশেষ বিশেষ লোকের উপর বিশেষ বিশেষ সময়ে ফরয হয়। যেমন হজ্জ এবং যাকাত শুধু ঐসব মুসলমানের উপর ফরয যারা মালদার। রোযা বছরে শুধু একমাস ফরয। কিন্তু নামায এমন এক আমল যার জন্যে ঈমান ছাড়া আর কোন শর্ত নেই। ঈমান আনার সাথে সাথেই প্রত্যেক বালেগ ও আকেল লোকের উপর নামায ফরয হয় সে নারী হোক বা পুরুষ হোক আমীর হোক বা ফকীর হোক, স্বাস্থ্যবান হোক অথবা রোগী এবং মুকীম হোক বা মুসাফির। দিনে পাঁচবার নামায ফরযে আইন। এমন কি সশস্ত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন দুশমনের মুকাবিলার প্রতি মুহূর্তে আশংকা হয়, ঠিক তখনও নামায শুধু ফরযই নয়, বরঞ্চ জামায়াতে পড়ার তাকীদ আছে। সালাতে খওফের নামাযও জামায়াতে আদায় করার পদ্ধতি স্বয়ং কুরআনে বয়ান করা হয়েছে।

নামাযের তাকীদ ও প্রেরণার সাথে সাথে তার গুরুত্ব মনে বদ্ধমূল করার জন্যে কুরআনে ভয়ানক পরিণাম[১] এবং বিরাট লাঞ্ছনার[২] এমন ভয় দেখানো হয়েছে, যা নামায পরিত্যাগকারীগণ ভোগ করবে।

নবী (সঃ) নামাযের অসাধারণ গুরুত্ব ও ফযীলত এবং তা ত্যাগ করার ভয়ানক শাস্তির উপর বিভিন্নভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

–মুমেন এবং কুফরের মধ্যে নামাযই পার্থক্যকারী– (মুসলিম)।

–যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে নামায পড়বে, কেয়ামতের দিন সে নামায তার জন্যে নূর এবং ঈমানের প্রমাণ হবে এবং নাজাতের কারণ প্রমাণিত হবে।

যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করবে না, তাহলে সে নামায না তার জন্যে নূর এবং ঈমানের প্রমাণ হবে, আর না সে নামায তাকে

---

১. দক্ষিণ হস্তের অধিকারী লোক ব্যতীত প্রত্যেক লোক তার আমলের পরিণামে জাহান্নামে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। দক্ষিণ হস্তধারী লোকেরা বেহেশতের বাগানে অবস্থান করবে এবং পাপীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এলো? তারা জবাব দেবে, আমরা নামায পড়তাম না (মুদ্দাসসের ৩৮)।

২. যে দিন ভয়ানক কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হবে (কেয়ামতের দিন), তখন তাদেরকে (বেনামাযী পাপীদেরকে) সিজদার জন্যে ডাকা হবে। তখন তারা সিজদা করতে পারবেনা। তাদের দৃষ্টি নিম্ন দিকে হবে এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে। এরা ঐসব লোক যাদেরকে (দুনিয়ায়) সিজদা করার জন্যে (নামাযের জন্যে) ডাকা হতো তখন তারা সুস্থ থাকা সত্ত্বেও সিজদা করতো না (কলম ঃ ৪২-৪৩)।

আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাবে। এমন লোক কেয়ামতের দিন ফেরাউন, কারুণ, হামান, উবাই বিন খালফের সাহচর্য লাভ করবে–(মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)।

হযরত আবুযর (রা) বয়ান করেন, একবার শীতের সময় যখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল, নবী (সঃ) বাইরে তশরীফ আনলেন এবং একটি গাছের দুটি ডাল ধরে ঝাঁকি দেয়া শুরু করলেন এবং ঝরঝর করে (শুকনো) পাতা পড়তে লাগলো। তখন নবী (সঃ) বললেন, হে আবু যর যখন কোন মুসলমান একনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিকতার সাথে নামায পড়ে, তার গুনাহ ঠিক এভাবে ঝরে পড়ে যেমন এ গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ছে– (মুসনাদে আহমদ)।

একবার নবী পাক (সঃ) সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কারো ঘরের পাশ দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয় যার মধ্যে সে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে, তাহলে বল, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবীগণ (রা) আরয করলেন, না তার শরীরে কোন ময়লাই থাকবে না। নবী (সঃ) বললেন, এ অবস্থা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। আল্লাহ্ তায়ালা এসব নামাযের বদৌলতে তার গুনাগুলো মিটিয়ে দেবেন–(বুখারী, মুসলিম)।

হযরত আলী (রা) বলেন, নবী পাক–(সঃ)এর জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বেরয়–নামায, নামায– (আল–আদাবুল মুফরেদ)।

দ্বীনের মধ্যে নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত জানার জন্যে কুরআন ও সুন্নাতের এসব সুস্পষ্ট এবং তাকীদসহ হেদায়েতের সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, স্বয়ং নবী পাক (সঃ)–এর নামাযের সাথে কত গভীর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি নামাযে চোখের শীতলতা অনুভব করতেন। যেমন তেমন কারণে তিনি মসজিদে গিয়ে এতো বেশী নফল নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত।

যা হোক, কুরআন ও সুন্নাতের এসব বিশদ বিবরণের পর এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, নামায ঈমানের এক অপরিহার্য নিদর্শন। ঈমান হলে সেখানে অবশ্যই নামায হবে এবং যেখানে নামায হবে সেখানে গোটা দ্বীন আছে বুঝতে হবে। যদি নামায না থাকে তাহলে সেখানে দ্বীনের অস্তিত্ব ধারণা করা যায়না। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর সরকারের দায়িত্বশীলদের লিখিত হেদায়েত দিতে গিয়ে এ সত্যের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ব্যাপার এই যে, আমার কাছে তোমাদের সকল সমস্যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো নামায। যে ব্যক্তি তার নামাযের পুরাপুরি

রক্ষণাবেক্ষণ করলো, সে তার দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ করলো। আর যে তার নামায নষ্ট করলো, সে অবশিষ্ট দ্বীনকে আরও বেশী করে নষ্ট করবে। (মিশকাত)।

একামাতে সালাতের শর্ত ও আদব

উপরে যে ফযীলত ও গুরুত্ব বয়ান করা হলো তা কিন্তু ঐ নামাযের যা সত্যিকার অর্থে নামায, যে নামায় সকল বাহ্যিক আদব লেহায ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে পূর্ণ অনুভূতির সাথে আদায় করা হয়। এ জন্যে কুরআন নামায আদায় করার জন্যে আদায় করার মতো সাদাসিধে প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করার পরিবর্তে একামাত[১] (প্রতিষ্ঠা করণ) এবং মুহাফেযাত[২] (সংরক্ষণ) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। একামাত ও মুহাফেযাতের অর্থ এই যে, নামায আদায় করতে গিয়ে ঐ সব যাহেরী আদব লেহাযের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যার সম্পর্ক নামাযের বাহ্যিক দিক ঠিক করার সাথে। সাথে সাথে ঐসব বাতেনী গুণাবলীরও পুরাপুরি ব্যবস্থা করতে হবে যার সম্পর্ক নামাযীর অন্তর ও তার আবেগ অনুভূতির সাথে।

নিম্নে সংক্ষেপে এসব আদব (শিষ্টাচার) ও গুণাবলী বয়ান করা হচ্ছে ঃ

১. তাহারাত বা পবিত্রতা

শরিয়ত পবিত্রতার যে পদ্ধতি ও হুকুমাবলী শিক্ষা দিয়েছে। তদনুযায়ী শরীর ও কাপড় ভালভাবে পাক সাফ করে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযেরি দিতে হবে–

يَـاَيُّـهَا الَّذِيْـنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَـى الصَّلٰـوةِ فَاغْـسِلُـوْا وُجُـوْهَكُـمْ وَاَيْـدِيَكُـمْ اِلَـى الْمَـرَافِـقِ وَامْـسَـحُـوْا بِـرُءُوْسِـكُـمْ وَاَرْجُلَـكُـمْ اِلَـى الْكَعْبَيْـنِ وَاِنْ كُنْـتُـمْ جُنُـبًا فَـاطَّـهَّرُوْا (المـائـده ٦)

---

১. وَاَقِـيْـمُـوا الصَّلٰـوةَ (البـقـرة : ٤٣) –এবং নামায কায়েম কর (বাকারাহ–৪৩)।

২. وَالَّذِيْـنَ هُـمْ عَلٰـى صَـلَـوٰتِـهِـمْ يُـحَـافِـظُـوْنَ (المومنون :٩)

এবং যারা তাদের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করে (মুমেনূন ৯)।

ঈমানদারগণ, জেনে রাখ যে, যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দুটি হাত ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবে, মাথা মুসেহ করবে এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেলবে। আর যদি জানাবাতের অবস্থায় থাক, তাহলে খুব ভালো করে পাক সাফ হয়ে যাবে। (মায়েদাহঃ ৬)।

অন্য স্থানে এরশাদ হয়েছে وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (المدثر ٤)

"এবং তোমার লেবাস-পোষাক ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাক করে নাও।-(মুদ্দাসসির ঃ ৪)।

২. সময়ের নিয়মানুবর্তিতা

অর্থাৎ ঠিক সময়ে নামায আদায় করতে হবে। এ জন্যে নামায সময় নিষ্ঠার সাথে ফরয করা হয়েছে

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

"অতএব নামায কায়েম কর। বস্তুতঃ নামায মুমেনদের উপর সময় নিষ্ঠার সাথে ফরয করা হয়েছে"।-(নিসাঃ ১০৩)।

নবী (সঃ) বলেনঃ সর্বোৎকৃষ্ট বান্দাহ তারাই যারা সূর্যের রোদ এবং চাঁদ ও তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে যাতে করে নামাযের সময় বয়ে না যায়।-(মুস্তাদরাকে হাকেম)।

৩. নামাযের সময় নিষ্ঠা

অর্থাৎ কোন নামায নষ্ট না করে ক্রমাগত হরহামেশা নামায পড়তে হবে। প্রকৃতপক্ষে নামাযী তাদেরকে বলা যেতে পারে যারা সময় নিষ্ঠার সাথে এবং কোন নামায বাদ না দিয়ে নামায আদায় করে।

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ

(المعارج ٢٢ - ٢٣)

"কিন্তু ঐসব নামায আদায়কারী যারা সময় নিষ্ঠার সাথে সর্বদা নামায আদায় করে।" (মাআরিজ ঃ ২২-২৩)।

৪. কাতার বন্দীর ব্যবস্থাপনা

নামাযের কাতার সোজা রাখার রীতিমত ব্যবস্থা করতে হবে। নামাযের কাতার দুরস্ত করা ভালভাবে নামায পড়ার অংশ।

হযরত নু'মান বিন বশীর বলেন, নবী (সঃ) আমাদের কাতার সোজা রাখার এমন ব্যবস্থা করতেন যেন তার দ্বারা তিনি তীরের লক্ষ্য সোজা করবেন। অতপর তিনি অনুভব করতেন যে, আমরা কাতার সোজা করার গুরুত্ব বুঝে ফেলেছি। আর একদিন তিনি বাইরে তশরীফ আনলেন এবং নামায পড়াবার জন্যে দাঁড়ালেন। তিনি তাকবীর বলতে যাবেন এমন সময় তাঁর নজর এমন এক ব্যক্তির উপর পড়লো যার বুক কাতার থেকে একটুখানি সামনে বেড়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দাহ, কাতার সোজা এবং বরাবর রাখ। নতুবা আল্লাহ্‌ তোমাদের মুখ একে অপরের বিরুদ্ধে করে দেবেন।

(মুসলিম)

–নামাযের মধ্যে কাতার সোজা এবং বরাবর কর। কারণ কাতার সোজা করা একামাতে সালাতের অংশ বিশেষ–(বুখারী)।

অর্থাৎ কাতার দুরস্ত না করলে নামায পড়ার হক ভালভাবে আদায় হয় না।

কাতার সোজা ও বরাবর রাখার সাথে সাথে কাতারবন্দীর ব্যবস্থাও করতে হবে। অর্থাৎ বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইমামের নিকটবর্তী থাকবেন। এটা তখনই সম্ভব যখন আহলে এল্‌ম লোকদের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধাবোধ জাগবে এবং তাঁদের নিজেদেরও বিশিষ্ট মর্যাদার অনুভূতি থাকতে হবে এবং আগেভাগেই মসজিদে হাযির হয়ে ইমামের নিকট স্থান করে নেবেন।

হযরত আবু মসউদ (রা) বলেন, নবী (সঃ) নামাযে এসে আমাদের কাতার সোজা ও বরাবর করার জন্যে আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন, সোজা হও, কাতার বরাবর কর, আগে পিছে হয়ো না। তা না হলে তোমরা একে অপরের প্রতি নারাজ হয়ে পড়বে। তিনি আরও বলতেন, যারা জ্ঞান–বুদ্ধি রাখে তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে, তারপর তারা যারা মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের নিকটে, তারপর তারা যারা জ্ঞানবুদ্ধির দিক দিয়ে দ্বিতীয় দলের নিকটবর্তী।

–(বুখারী)।

৫. মনের প্রশান্তি ও মধ্যবর্তীতা

অর্থাৎ নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে থেমে থেমে নামায আদায় করা দরকার যাতে করে কেরায়াত, কেয়াম, রুকু, সিজদা ও নামাযের যাবতীয় রুকন প্রভৃতির হক আদায় করা যায়।

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

নামায না বেশী আওয়ায করে আর না একেবারে অল্প আওয়াযে পড়বে। বরঞ্চ মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করবে -(বনী ইসরাঈল ঃ ১১০)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, একবার নবী পাক (সঃ) মসজিদের একধারে বসেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে এলো এবং নামায পড়লো। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে এলো এবং সালাম করলো। নবী (সঃ) সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে নামায পড়, তুমি ঠিকমত নামায পড়নি। সে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়ে এসে নবীকে সালাম করলো। নবী (সঃ) বললেন, আবার গিয়ে নামায পড়, তোমার নামায ঠিক হয়নি। সে ব্যক্তি তৃতীয়বার নামায পড়ে অথবা তারপর আরয করলো, হে আল্লাহ্র রসূল, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন কিভাবে নামায পড়বো। নবী (সঃ) বললেন, যখন তুমি নামায পড়ার ইরাদা কর তখন প্রথমে খুব ভালো করে অযু কর। তারপর কেবলার দিকে মুখ কর। তারপর তাকবীর তাহরীমা বলে নামায শুরু কর এবং কুরআনের যে অংশ সহজে পড়তে পার তা পড়। (কোন বর্ণনায় আছে, সুরায়ে ফাতেহা পড় এবং তারপর যা চাও পড়)। তারপর তুমি নিশ্চিন্ত মনে রুকুতে যাও। তারপর রুকু থেকে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর নিশ্চিন্ত মনে সিজদা কর এবং সিজদা থেকে নিশ্চিন্ত মনে সোজা হয়ে বস। পুরা নামায এভাবে নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে আদায় কর।

(বুখারী ও মুসলিম)

নবী পাক (সঃ)-এর উপরোক্ত হেদায়াতের মর্ম এই যে, নামায মাথার কোন বোঝা নয় যে, মাথা থেকে কোন রকমে নামিয়ে ফেললেই হলো এবং তাড়াহুড়া করে নামায শেষ করলো। বরঞ্চ এ হচ্ছে আল্লাহ্র সর্বোৎকৃষ্ট এবাদত। তার হক এই যে, পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে তার সকল আরকান আদায় করবে, ধীরে ধীরে থেমে থেমে মনোযোগ দিয়ে পড়বে। যে নামায নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে পড়া হয় না, নবী পাক (সঃ)-এর নিকটে তা নামাযই নয়।

হযরত আয়েশা (রা) নবী (সঃ)–এর নামাযের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী (সঃ) তাকবীর তাহরীমা বলে নামায শুরু করতেন এবং 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' থেকে কুরআন পড়া শুরু করতেন। যখন তিনি রুকূতে যেতেন তখন মাথা না উপরে উঠিয়ে রাখতেন আর না নীচের দিকে ঝুকিয়ে রাখতেন, বরঞ্চ মধ্যম অবস্থায় অর্থাৎ কোমর বরাবর সোজা রাখতেন, তারপর যখন রুকূ' থেকে উঠতেন তখন যতোক্ষণ না সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, ততোক্ষণ সিজদায় যেতেন না। তারপর প্রথমে সিজদা থেকে যখন মাথা উঠাতেন তখন যতোক্ষণ না একেবারে সোজা হয়ে বসতেন, দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। প্রতি দু'রাক্য়াত পর 'আত্তাহিয়্যাত' পড়তেন। 'আত্তাহিয়্যাত' পড়ার সময় বাম পা বিছিয়ে রাখতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন এবং শয়তানের মতো বসতে নিষেধ করতেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, কুকুরের মতো বসতে নিষেধ করতেন। তিনি এভাবে সিজদা করতেও নিষেধ করেন যেভাবে হিংস্র পশু সামনের দু'পা বিছিয়ে বসে। তারপর তিনি السلام عليكم ورحمة الله বলে নামায শেষ করতেন –(মুসলিম)।

৬. জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থাপনা

ফরয নামায অবশ্যই জামায়াতে পড়তে হবে। অবশ্যি যদি জান–মালের ক্ষতির আশংকা না থাকে।

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (البقرة : ٤٣)

–রুকূ'কারীদের সাথে মিলে রুকূ' কর–(বাকারাহ ঃ ৪৩)

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ (النساء : ١٠٢)

এবং (হে নবী,) যখন আপনি মুসলমানদের সাথে থাকবেন তখন তাদের নামায পড়িয়ে দিবেন (নিসা ঃ ১০২)।

এ হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে নামায আদায় করা সম্পর্কে নির্দেশ। এ নাযুক পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের সৈনিকগণ আলাদা আলাদা নামায পড়বে না। বরং নবী (সঃ) নামায পড়িয়ে দেবেন। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা নবী (স ঃ)–এর পেছনে জামায়াতে নামায পড়বেন।

নবী (সঃ) বলেন ঃ

যে ব্যক্তি জামায়াতে নামাযের জন্যে মুয়ায্যিনের আযান শুনলো এবং তার আহবানে সাড়া দিতে তার কোন ওযরও নেই, তথাপি সে জামায়াতে নামাযের জন্যে গেলো না, একাকী নামায পড়লো, তাহলে সে নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন 'ওযরের' অর্থ কি? তিনি বললেন, জান মালের আশংকা অথবা রোগ (আবু দাউদ)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বরাবর ৪০ দিন প্রত্যেক নামায এভাবে জামায়াতে আদায় করলো যে, প্রথম তাকবীরে শরীক হলো, তাহলে দুটি জিনিস থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে। এক-দোযখের আগুন থেকে অব্যাহতি, দুই-মুনাফেকী থেকে অব্যাহতি -(জামে' তিরমিযী)

৭. কুরআন তেলাওয়াতে তারতীল ও চিন্তাভাবনা

নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের হক আদায় হয় যদি তা পড়া হয় একটু থেমে থেমে, আন্তরিকতা এবং মনোযোগ বা মনের উপস্থিতি সহকারে এবং অতি আগ্রহের স্যাথে। তারপর এক এক আয়াতের উপর চিন্তাভাবনা করতে হবে। নবী পাক (সঃ) এক একটি অক্ষর সুস্পষ্ট করে এবং এক এক আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন।

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً (المزمل ٤)

এবং কুরআন একটু থেমে থেমে পড়ুন-(মুজ্জাম্মিল ঃ ৪)

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

(ص ٢٩)

এ কিতাব আপনার উপর নাযিল করেছি এবং তা বরকতপূর্ণ এ জন্যে যে, মানুষ যেন তার আয়াতগুলোর উপর চিন্তাভাবনা করে এবং জ্ঞানবান তার থেকে শিক্ষা লাভ করে। (সোয়াদ ঃ ২৯)।

৮. আগ্রহ ও মনোযোগ

প্রকৃত নামায তাকেই বলে যার ধ্যে লোক মন-মস্তিষ্ক, আবেগ-অনুভূতি এবং চিন্তা-ভাবনার সাথে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ

দেয় এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর কাছে চাওয়ার আগ্রহ এমন বেশী হয় যে, এক নামায আদায় করার পর দ্বিতীয় নামাযের প্রতীক্ষায় অন্তর অধীর হয়ে থাকে।

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (الاعراف ٢٩)

"প্রত্যেক নামাযের জন্যে নিজের কেবলা ঠিক রাখ এবং তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) ডাক এবং আনুগত্য-দাসত্ব তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করে দাও" (আরাফ : ২৯)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ - (الجمعه ٩)

"হে মুমেনগণ! যখন জুমার দিনে নামাযের জন্যে ডাকা হয়, তখন সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে যিকিরের দিকে দৌড়াও-(জুমা : ৯)।

৯. শিষ্টাচার ও আত্মসমর্পণ

অর্থাৎ একজন অনুগত গোলামের মত নামাযী লোক অতিশয় বিনয় ও আত্মসমর্পনের প্রতীক হিসাবে আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড়াবে. যেন অন্তর আল্লাহ্‌র মহত্ব ও পরাক্রমে প্রকম্পিত হতে থাকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও যেন বিনয় নম্রতার ছাপ পরিস্ফুট হয়।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

"নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষ করে সর্বোৎকৃষ্ট নামাযের এবং আল্লাহ্‌র সামনে শিষ্টাচার ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াও।" (বাকারা : ২৩৮)

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ (الحج :٣٤-٣٥)

"এবং (হে নবী) সুসংবাদ দিন ঐসব লোকদেরকে যারা বিনয় ও শিষ্টাচার অবলম্বন করে এবং যাদের অবস্থা এই যে, যখন তারা আল্লাহ্‌র যিকির

শুনে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, বিপদ আপদ অটল-অচল হয়ে বরদাশত করে এবং নামায কায়েম করে-(হজ্জ ঃ ৩৪-৩৫)।

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ (الاعراف ٢٠٥)

"এবং আপনার রবকে সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ করুন মনে মনে বিনয় গদগদ হয়ে এবং তাঁর ভয়ে এবং অনুচ্চস্বরে এবং গাফেলদের মধ্যে শামিল যেন না হন।-(আ'রাফ ঃ ২০৫)।

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (র) যখন নামাযের জন্যে অযু করতেন তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। ঘরের লোকজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, অযুর সময় আপনার একি অবস্থা হয়? তিনি বলতেন, তোমরা জাননা, আমি কোন্ সত্তার সামনে দাঁড়াতে চাই? (এহইয়াউল উলুম)।

১০. বিনয় নম্রতা

বিনয় নম্রতা নামাযের প্রাণ। যে নামাযে বিনয় নম্রতা নেই সে নামায নামায নয়। কুরআনে 'খুশু' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে-তার অর্থ ছোট হওয়া, দমিত হওয়া, নম্রতার সাথে ঝুঁকে পড়া। নামাযে এ 'খুশু' অবলম্বন করার অর্থ এই যে, শুধু শরীরই নয়, বরঞ্চ মন-মস্তিষ্ক সব কিছুই আল্লাহ্‌র সামনে হীন ও দীন হয়ে ঝুঁকে যাওয়া বা অবনত হওয়া। মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহত্ব ও বড়ত্ব এমন ভয় সঞ্চার করে যে, মন্দ আবেগ, অনুরাগ ও অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা মনে আসতে পারে না। শরীরের উপরেও তার ছাপ পড়ে। এমন এক অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ হবে যা হবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র মহত্ব ও পরাক্রমের উপযোগী।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

ঐ সব মুমেন কল্যাণ লাভ করেছে যারা তাদের নামাযে বিনয় নম্র।
(আল মুমেনূন ঃ ১-২)।

১১. আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অনুভূতি

নামায মানুষকে আল্লাহ্‌র এতোটা নিকটবর্তী করে দেয় যে, অন্য কোন আমল দ্বারা এতোটা নিকট হওয়ার ধারণা করা যেতে পারে না। নবী (সঃ)

বলেন, বান্দাহ ঐ সময় তার আল্লাহ্‌র অতি নিকট হয়ে যায় যখন সে সিজদায় থাকে (মুসলিম)।

একামাতে সালাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত এই যে, নামাযীর মনে যেন এ নৈকট্যের অনুভূতি হয়। তার অন্তরে এ নৈকট্যের কামনা বাসনাও থাকে এবং সে এমনভাবে নামায পড়ে যেন আল্লাহ্‌কে দেখছে অথবা নিদেন পক্ষে এ অনুভূতি হয় যে, আল্লাহ্ তার দিকে দেখছেন।

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (العلق ١٩)

এবং সিজদা কর ও তাঁর নিকট হয়ে যাও– (আলাক ঃ ১৯)

১২. আল্লাহ্‌র স্মরণ

নামাযের সত্যিকার গুণই হলো আল্লাহ্‌র স্মরণ। আর আল্লাহ্‌র ইয়াদের সার্বিক এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নামায। এ জন্যে যে, এ হচ্ছে তাঁরই শিখানো পদ্ধতি যাঁর স্মরণ কাম্য। যে নামায আল্লাহ্‌র স্মরণের গুণ থেকে খালি তা মুমেনের নামায নয়, মুনাফেকের নামায। নামায কায়েমের উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে আল্লাহ্‌কে ইয়াদ করা।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ - (طـه ١٤)

এবং নামায কায়েম করুন আমাকে ইয়াদ করার জন্যে (তাহা ঃ ১৪)।

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (السجده ١٥)

(মনে রাখতে হবে এ আয়াত সিজদার আয়াত)।

আমাদের আয়াতের উপরে তো প্রকৃতপক্ষে তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে এ সব আয়াতের দ্বারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে সিজদায় পড়ে যায় এবং নিজেদের প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বয়ান করতে থাকে এবং তারা গর্ব অহংকার করে না –(আস–সিজদাহ ঃ ১৫)।

অর্থাৎ তাদের রুকূ সিজদা অনুভূতির রুকূ সিজদা হয়। তারা বেপরোয়া হয়ে শুধু মুখে তসবীহ পাঠ করে না; বরঞ্চ যেসব কালেমাই উচ্চারণ করে তা আল্লাহ্‌র ইয়াদেই করে এবং তাদের নামায সরাসরি আল্লাহ্‌র হয়।

১৩. রিয়া থেকে দূরে থাকা

নামায রক্ষণাবেক্ষণের একটি বড় শর্ত এই যে, তা রিয়া, লোক দেখানো প্রদর্শনী অথবা অন্যান্য নীচতাপূর্ণ প্রবণতা থেকে দূরে রাখা হবে। নইলে তা হবে আন্তরিকতার পরিপন্থী, রিয়ার দ্বারা শুধু নামায নষ্টই হয়ে যায়না, বরঞ্চ এ ধরনের নামাযীও ধ্বংস হয়।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ (الماعون ٤)

ধ্বংস ঐ সব নামাযীদের জন্যে যারা তাদের নামায থেকে গাফেল হয় এবং মানুষকে দেখাবার জন্যে নামায পড়ে (মাউন ঃ ৪)।

হযরত শাদ্দাদ বিন উস (রা) বয়ান করেন, নবী (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্যে নামায পড়ে, সে শির্ক করলো-(মুসনাদে আহমদ)।

১৪. পূর্ণ আত্মসমর্পণ

একামাতে সালাতের শেষ এবং সার্বিক শর্ত এই যে, মুমেন নামাযে তার নিজকে পুরাপুরি তার আল্লাহ্‌র উপর সঁপে দেবে। যতোদিন সে জীবিত থাকবে আল্লাহ্‌র অনুগত গোলাম হয়ে থাকবে এবং যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হবে তখন মৃত্যুও হবে আল্লাহ্‌র জন্যে।

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

অবশ্য অবশ্যই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং এ জন্যেই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। এবং আমি সকলের প্রথমে নিজেকে আল্লাহ্‌তে সমর্পণকারী-(আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)।

আয়াতটিতে এক বিশেষ ক্রমানুসারে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। নামায এবং কুরবানী, তারপর নামাযের সাথে জীবন এবং কুরবানীর সাথে মৃত্যু উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নামায এবং কুরবানী দু'টি সার্বিক বিষয় যা মুমেনের গোটা জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। নামায আসলে এ সত্যেরই

প্রতিফলন যে, মুমেন শুধু নামাযেই নয় বরঞ্চ নামাযের বাইরে তার গোটা জীবনেই একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ। কুরবানী এ সত্যেরই বহিঃপ্রকাশ যে, মুমেনের জান-মাল সব কিছুই আল্লাহ্‌র পথে কুরবান হবার জন্যেই তার কাছে গচ্ছিত আছে।

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সাথে যে নামায পড়া হয়, তা হবে প্রকৃত নামায। গোটা জীবনের উপর তা এমন প্রভাব বিস্তার করবে যে, একদিকে নামাযী ব্যক্তি অনাচার অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে অত্যন্ত সজাগ থাকবে- অনাচার করা তো দূরের কথা তার চিন্তা করতেও ঘৃণা আসবে এবং অপরদিকে ভালো কাজ করার জন্যে বরং সবচেয়ে ভাল কাজ করার জন্যে উৎসাহী ও তৎপর হবে।

একামাতে সালাতের হক পুরাপুরি আদায় করার এবং নামাযকে সত্যিকার নামায বানাবার জন্যে উপরের চৌদ্দটি শর্ত মেনে চলতে হবে। সেই সাথে তাহাজ্জুদ, অন্যান্য নফল নামায এবং যিকির আযকারেরও নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে যা মসনূন। উপরন্তু নিভৃত স্থানে সর্বদা আত্মসমালোচনা ও অশ্রু গদ গদ হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করার অভ্যাসও করতে হবে।

নামায ফরয হওয়ার সময়কাল

নামায তো নবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) শুরু থেকেই পড়তেন। তবে পাঁচ ওয়াক্তের নামায শবে মে'রাজে ফরয করা হয়। হিজরতের এক বছর পূর্বে নবী পাক (সঃ) মে'রাজের মর্যাদা লাভ করেন এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে হাযির হন। এ সময়ে এ নামায উপহার দেয়া হয়। তারপর হযরত জিবরাইল (আ) এসে তাঁকে নামাযের সময় এবং পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। নামায যে ফরয তা কুরআনে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে এবং সকল এবাদতের মধ্যে নামাযের জন্যে বেশী বেশী তাকীদ করা হয়েছে। নামায ফরয এ কথা যে অস্বীকার করে সে নিশ্চয়ই মুসলমান নয়।

নামাযের সময়

নামাযের সময় নিয়মানুবর্তিতার সাথে ফরয করা হয়েছে।[১] ফরয নামাযগুলোর সময় কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্লেষণ মুতাবিক পাঁচটি, যথা ফজর, যোহর, আসর, মাগরেব ও এশা।[২]

ফজরের সময়

উষার আলো প্রকাশ হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

---

১. কুরআনে আছে -

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○ (نساء ١٠٣)

-অতএব নামায কায়েম কর। বস্তুতঃ নামায মুমেনদের উপরে নিয়মানুবর্তিতার সাথে ফরয করা হয়েছে -(নিসা ঃ১০৩)

২. নামাযের সময় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۚ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○ (بنى اسرائيل : ٧٨)

নামায কায়েম কর সূর্য ঢলে যাওয়ার সময়ে, রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরে কুরআন পাঠ কর নিয়মানুবর্তিতার সাথে। নিশ্চয় ফজরের পাঠ মশহুদ হয় (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ এ নামাযের সাক্ষী থাকেন)।

-(বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮)

সূর্য ঢলে যাওয়ার অর্থ মধ্যাহ্নের পর থেকে ক্রমশঃ তার তীব্রতা কম হতে থাকা। এ পরিবর্তন দিনে চারবার হয় এবং 'দুলুক' শব্দের দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। যেমন ঃ

(১) মধ্যাহ্নের পর যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে।

(২) দিনের শেষের দিকে যখন তার রশ্মি কমে আসে এবং তার মধ্যে হলুদ আভা দেখা যায়।

(৩) যে সময়ে সূর্য অস্ত যায়

যোহরের সময়

সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর শুরু হয়। সময় তখন পর্যন্ত থাকে যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার আসল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হয়। যেমন এক হাত লম্বা, একটা লাকড়ির আসল ছায়া দুপুর বেলা চার আঙ্গুল ছিল। তারপর সে লাকড়ির ছায়া যখন দু'হাত চার আঙ্গুল হবে তখন যোহরের ওয়াক্ত চলে যাবে। কিন্তু সাবধানতার জন্যে যোহরের নামায এমন সময়ের মধ্যে পড়া উচিত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার আসল ছায়া বাদে তার সমান হয়। জুমার নামাযেরও এই সময়। তবে গরমের সময় একটু বিলম্বে পড়া ভাল। কিন্তু জুমার নামায সকল ঋতুতে প্রথম সময়ে পড়াই উত্তম।

---

(৪) এমন সময় যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর লাল আভাটুকু বিলীন হয়ে অন্ধকার নেমে আসে।

এ হচ্ছে চার সময়, যখন যোহর, আসর, মাগরেব এবং এশার নামায কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফজরে কুরআন পাঠের অর্থ 'ফজরের নামায'। কুরআনে নামাযের জন্যে 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও আবার তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে নামায মনে করা হয়েছে। এর দ্বারা নামাযের এ অংশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ফজরের পাঠ মশহুদ হয়-অর্থাৎ রাতের নিদ্রা ও বিশ্রামের পর তখন মন-মেযাজ বড় প্রশান্ত থাকে, মানুষ তখন সজীবতা লাভ করে এবং সময়টাও বড়োই মনোরম ও নীরব থাকে।

উপরোক্ত আয়াতে যে চার নামাযের দিকে সামগ্রিকভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কুরআনের অন্যত্র সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ.

–এবং নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাত কিছুটা অতীত হওয়ার পর – (হুদ ঃ১১৪)।

দিনের দুই প্রান্তে নামাযের সুস্পষ্ট মর্ম ফযর এবং মাগরেবের নামায। রাত কিছুটা অতীত হওয়ার পর যে নামায তাহলো এশার নামায।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ
اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ (طٰهٰ ۱۳۰)

এবং তোমার রবের প্রশংসার সাথে তসবীহ পাঠ কর সূর্য উদিত হওয়ার আগে এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বে এবং রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর। পুনরায় তসবীহ পাঠ কর এবং দিনের প্রান্তসমূহে। (তোয়াহাঃ ১৩০)

আসরের সময়

যোহরের ওয়াক্ত খতম হলেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পর্যন্ত থাকে। অবশ্যি সূর্যে হলুদ বর্ণ এসে যাওয়ার পূর্বে আসরের নামায পড়া উচিত। হলুদ বর্ণ আসার পর নামায মাকরুহ হয়। কোন কারণে যদি আসরের নামায বিলম্ব হয়ে যাওয়ার কারণে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে, তাহলে নামায কাযা না করে তখনই পড়ে নেয়া উচিত।

মাগরেবের সময়

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং পশ্চিমাকাশের লাল বর্ণ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে। মাগরেবের সময় হওয়ার সাথে সাথে পড়া মুস্তাহাব।

সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ফজরের নামায, অস্ত যাওয়ার আগে অর্থ এশার নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। তারপর দিনের প্রান্তসমূহ হলো তিনটি, যথা, প্রাতঃকাল দুপুরের পর এবং সূর্যাস্তের পর। অর্থাৎ ফজর, যোহর এবং মাগরেব।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ - (الروم ١٧-١٨)

–অতএব আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠ কর যখন তোমার সন্ধ্যা হয়, এবং যখন তোমার সকাল হয়। আসমান এবং যমীনের প্রশংসা শুধু তাঁরই। (এবং তাঁর তসবীহ পাঠ কর) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমার যোহরের সময় আসে–(রুম : ১৭–১৮)।

এখানে তসবীহ অর্থ নামায। কুরআন এভাবে নামাযের অংশ বর্ণনা করে নামাযই বুঝিয়েছে। উপরন্তু এখানে সময়ের নির্ধারণও করা হয়েছে। নতুবা শুধু তসবীহ পাঠের সময় নির্ধারণের কি অর্থ হতে পারে? অতপর আল্লাহ তায়ালা নামাযের সময় সম্পর্কে বিশ্লেষণের জন্যে হযরত জিবরাইল (আ)কে পাঠান। তিনি নবী (সঃ)–এর নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেক ওয়াক্তের সঠিক সময় বলে দেন।

নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেন,

জিবরাইল (আ) দুবার বায়তুল্লার নিকটে আমাকে নামায পড়িয়ে দেন। প্রথম দিন যোহরের নামায এমন সময়ে পড়ান যখন সবেমাত্র সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে এবং ছায়া জুতার তলা থেকে বড়ো ছিল না। তারপর আসরের নামায এমন সময় পড়ালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমান ছিল তারপর মাগরেবের নামায পড়ালেন যখন রোযাদার ইফতার করে। এশার নামায পশ্চিম আকাশের আভা বিলীন হওয়ার সাথে সাথে পড়ালেন তারপর ফজরের নামায এমন সময় পড়ালেন যখন

এশার সময়

পশ্চিমাকাশের লাল বর্ণের পর সাদা বর্ণ চলে যাওয়ার পর শুরু হয় এবং সুবহে সাদেক পর্যন্ত বাকী থাকে। পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ সূর্যাস্তের আনুমানিক সোয়া ঘন্টা পর অন্ধকারে ঢেকে যায়। কিন্তু এশার নামায সাবধানতার জন্যে দেড় ঘন্টা পর পড়া উচিত।

এসব ফরয নামায ছাড়াও তিন নামায ওয়াজেব। নিম্নে সে সবের ওয়াক্ত বলা হলো।

বেতরের নামাযের সময়

এশার নামাযের পরেই বেতের পড়া উচিত। অবশ্যি যারা নিয়মিতভাবে শেষ রাতে উঠতে অভ্যস্ত তাদের জন্যে শেষ রাতে পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু যদি সন্দেহ হয় যে, কি জানি যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে মুস্তাহব এই যে, এশার নামাযের পরেই তা পড়ে নিতে হবে।

দু'ঈদের নামাযের সময়

যখন সূর্যোদয়ের পর তার হলুদ বর্ণ শেষ হওয়ার পর রৌদ্র তেজ হয়ে পড়ে তখন দু'ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বেলা পড়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে সর্বদা ঈদের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।[১]

রোযাদারদের জন্যে খানাপিনা হারাম হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার যোহর নামায তিনি এমন সময়ে পড়ালেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল এবং আসর পড়ালেন এমন সময় যখন বস্তুর ছায়া দ্বিগুন ছিল। মাগরেব নামায পড়ালেন রোযাদারদের ইফতার করার সময় এবং এশা রাত এক তৃতীয়াংশ অতীত হওয়ার পর। ফজরের নামায পড়ালেন উষার আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর। অতপর তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ), নবীদের নামায পড়ার এই হলো সময়সূচী। নামাযের সঠিক সময় এ দু' সময়ের মধ্যে।

১. বেতেরের নামায ওয়াজেব। শরীয়তে শুধু তিন নামায ওয়াজেব। বেতের এবং দুই ঈদের নামায। অবশ্য মানতের নামাযও ওয়াজেব। প্রত্যেক নফল শুরু করার পর তা ওয়াজেব হয়ে যায়। কোন কারণে নামায নষ্ট হলে তা কাযা পড়া জরুরী হয়ে পড়ে।

নামাযের এ সময়গুলো সারা বিশ্বের জন্যে

নামাযের সময় নির্ধারণের যে নিয়ম উপরে বলা হলো তা দুনিয়ার সকল দেশের জন্যে। যেখানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় রাত ও দিন ছোটো হোক অথবা বড়ো হোক, নামাযের সময় সেখানে উপরোক্ত নিয়মেই নির্ধারণ করতে হবে।[১]

---

১. মেরু প্রদেশগুলোর নিকটবর্তী ভূখণ্ডে যেখানে রাত ও দিনের মধ্যে অসাধারণ দূরত্ব হয় সেখানে নামাযের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা মওদূদী একটি প্রশ্নের জবাবে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খন্ড থেকে প্রশ্ন ও উত্তর উদ্ধৃত করা হলো।

মরু অঞ্চলদ্বয়ের নিকটবর্তী দেশগুলোতে নামায রোযার সময়

প্রশ্ন ঃ আমার এক ছেলে ট্রেনিং উপলক্ষে ইংলণ্ডে আছে। সে রোযার সময় সূচীর জন্যে মৌলিক নিয়ম পদ্ধতি জানতে চায়। বৃষ্টি, বাদল, কুয়াশা প্রভৃতির কারণে সেখানে সূর্য খুব কমই দেখা যায়। দিন কখনো খুব বড়ো, কখনও খুব ছোট হয়। কখনও আবার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে বিশ ঘন্টার তফাৎ হয়। তাহলে এমন অবস্থায় বিশ ঘন্টা বা বেশী সময় রোযা রাখতে হবে?

উত্তর ঃ যেসব দেশে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্য উদয় হয় ও অস্ত যায়, তা সেখানে রাত ছোটো অথবা বড়ো হোক সেখানে নামাযের সময় ঠিক ঐ নিয়মে নির্ধারণ করতে হবে যা কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফজরের নামায সূর্যোদয়ের আগে যোহর বেলা গড়ার পর, আসর সূর্যাস্তের আগে মাগরেবের নামায সূর্যাস্তের পর এবং এশা রাত কিছুটা অতীত হওয়ার পর। এভাবে রোযা সুবহে সাদেক হওয়ার সময় থেকে শুরু হবে এবং সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করতে হবে। যেখানে যোহর এবং আসরের মধ্যে অথবা মাগরেব এবং এশার মধ্যে সময় ক্ষেপণ সম্ভব নয়, সেখানে দু'ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়বে।

আপনার ছেলে যেন তার সুবিধামতো আবহাওয়া অফিস থেকে জেনে নেয় যে, সেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত কখন হয় এবং বেলা গড়ে কখন। সে অনুযায়ী নামাযের সময় ঠিক করে নেবে।

রোযার সময়ে ওখানকার দিন বড়ো হওয়ার জন্যে ঘাবড়াবার দরকার নেই। ইবনে বতুতা রাশিয়ার বুলগেরিয়া শহর সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন গ্রীষ্মকালে সেখানে পৌঁছেন তখন রমযান মাস ছিল। সেখানে ইফতারের সময় নিয়ে সুবহে সাদেক পর্যন্ত মাত্র দু'ঘন্টা সময় পাওয়া যায়। এ অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে মুসলমানগণ ইফতারও করে, খানাও খায় এবং এশার নামাযও পড়ে। এশার নামাযের কিছুক্ষণ পরেই সুবহে সাদেক হয়ে যায়। তারপর ফজরের নামায পড়ে।

নামাযের রাক্‌য়াতসমূহ

ফজরের নামায

প্রথমে দু'রাক্‌য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।[১] তারপর দু'রাক্‌য়াত ফরয নামায। হাদীসগুলোতে ফজরের সুন্নাতের জন্যে খুব তাকীদ করা হয়েছে। যদিও নবী (সা) অন্যান্য সুন্নাতের জন্যেও তাকীদ করেছেন কিন্তু সবচেয়ে বেশী ফজরের সুন্নাতের জন্যে করেছেন। নিজেও তিনি এ ব্যাপারে খুব বেশী যত্নশীল ছিলেন। তিনি বলেন, ফজরের সুন্নাত কিছুতেই ছাড়বে না যদিও ঘোড়া তোমাদেরকে পদদলিত করে।[২]

তিনি আরও বলেন, ফজরের সুন্নাত আমার কাছে দুনিয়া ও তার যাবতীয় সম্পদ থেকে বেশী প্রিয়।[৩]

সুন্নাত নামাযগুলোর মধ্যে নবী পাক (সঃ) ফজরের সুন্নাতের যতো পাবন্দি করতেন, অন্য কোন নামাযের সুন্নাতের এতটা করতেন না।[৪] হযরত হাফসা (রা) বলেন, নবী (সঃ) ফজরের সুন্নাত আমার ঘরে পড়তেন এবং হালকা পড়তেন।[৫] ফজরের সুন্নাতে তিনি প্রথম রাক্‌য়াতে قُلْ يَآيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন।[৬]

---

১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ঐ নামাযকে বলে যার বেশী তাকীদ করা হয়েছে। কোন ওযর ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে এ নামায ত্যাগ করে তাহলে শক্ত গুনাহগার হবে। সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ (নফল) নামাযের অর্থ এই যে, এ জরুরী তো নয়, কিন্তু পড়লে খুব বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। সময় সুযোগ এবং মনের আগ্রহ থাকলে পড়া ভালো। না পড়লে গুনাহ হবে না।

২. (আহমদ আবু দাউদ) এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, জীবন গেলেও এ সুন্নাত আদায় করতে হবে। জানের ভয়ে তো ফরয নামাযও ছেড়ে দেয়া জায়েয। খুব বেশী তাকীদের জন্যে এমন বলা হয়েছে।

৩. মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী।

৪. বুখারী, মুসলিম, আহমদ।

৫. আহমদ, বুখারী, মুসলিম।

৬. আহমদ, তাহাবী, তিরমিযী।

যোহরের নামায

প্রথমে চার রাক্‌য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (এক সালামসহ), তারপর চার রাক্‌য়াত ফরয। তারপর দু'রাক্‌য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং তারপর দু'রাক্‌য়াত নফল।

জুমার নামায

প্রথমে চার রাক্‌য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (এক সালামসহ), তারপর দু'রাক্‌য়াত ফরয জামায়াতসহ, তারপর চার রাক্‌য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এক সালামসহ।[১]

আসরের নামায

প্রথমে চার রাক্‌য়াত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ অথবা মুস্তাহাব, তারপর চার রাক্‌য়াত ফরয।

মাগরেব

প্রথমে তিন রাক্‌য়াত ফরয। তারপর দু'রাক্‌য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, তারপর দু'রাক্‌য়াত নফল।

---

১. এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। তাঁর সাহেবাইন (দুজন শাগরেদ) বলেন, ফরযের পর দু'রাক্‌য়াত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। প্রথমে এক সালামে চার রাক্‌য়াত, পরে দু'রাক্‌য়াত। উভয় মতেরই সমর্থন হাদীস থেকে পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, জুমার নামাযের পর চার রাক্‌য়াত পড় (তিরমিযী)। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) জুমার নামায বাদে ঘরে এসে দু'রাক্‌য়াত সুন্নাত পড়তেন এবং বলতেন নবী (সঃ)ও এমন করতেন। হযরত ইসহাকের অভিমত এই যে, যদি নামাযে জুমার পর মসজিদে পড়া যায় তাহলে চার রাক্‌য়াত। এ জন্যে যে, নবী (সঃ) বলতেন, জুমার নামায বাদে চার রাক্‌য়াত পড়। আর যদি ঘরে পড়া হয় তাহলে দু'রাক্‌য়াত। এ জন্যে যে, নবী (সঃ) দু'রাক্‌য়াত পড়তেন।

এশা

প্রথমে চার রাক্‌য়াত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ, তারপর চার রাক্‌য়াত ফরয, তারপর দু'রাক্‌য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, তারপর তিন রাক্‌য়াত বেতের, তারপর দু'রাক্‌য়াত নফল।[১]

---

১. বেতেরের পর দু'রাক্‌য়াত নফল। নবী (সঃ) বলেন, যাদের পক্ষে রাতে উঠা কষ্টকর তাদেরকে বলে দাও যেন বেতেরের পর দু'রাক্‌য়াত পড়ে। রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ হলে ভালো কথা। নতুবা এ দু'রাক্‌য়াত তাহাজ্জুদ ধরা হবে (মিশকাত)।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সুন্নাতে মুয়াক্কাদার সংখ্যা ফজরে দুই, যোহরে ছয়, মাগরেবে দুই, এশায় দুই মোট বার (তিরমিযী)। পৃথক পৃথক হাদীসে তাদের ফযীলত বয়ান করে তাকীদ করা হয়েছে। যারা বিনা কারণে এসব ছেড়ে দেবে তারা শক্ত গুনাহগার হবে। নবী (সঃ) বলেন, যে মুসলমান ফরয ছাড়াও দৈনিক বারো রাক্‌য়াত আল্লাহর জন্যে পড়বে, তাদের জন্যে তিনি জান্নাতে ঘর তৈরী করবেন (মুসলিম)।

নামাযের মাকরুহ্ সময়

এ সময় তিন প্রকারের। এক–যে সময় প্রত্যেক নামায নিষিদ্ধ। দুই–যে সময়ে প্রত্যেক নামায মাকরুহ। তিন–যে সময়ে শুধু নফল নামায মাকরুহ।

যে যে সময়ে প্রত্যেক নামায নিষিদ্ধ

১. সূর্য যখন উঠতে থাকে এবং যতোক্ষণ না তার হলুদ রং ভালোভাবে চলে যায় এবং আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে না পড়ে।

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়–যতোক্ষণ বেলা গড়ে না যায়।

৩. সূর্য লালবর্ণ ধারণ করার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে যদি কোন কারণে ঐ দিনের আসর নামায পড়া হয়ে না থাকে, তাহলে পড়তে হবে, কাযা করা চলবে না।

উপরোক্ত তিন সময়ে প্রত্যক নামায নিষিদ্ধ তা সে ফরয হোক সুন্নাত কিংবা নফল, ওয়াজেব হোক বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এ সময়ে শুকরিয়া সিজদা এবং সিজদা তেলাওয়াতও নিষিদ্ধ। প্রথম থেকে নামায শুরু করার পর যদি এ মাকরুহ সময় এসে পড়ে তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। তবে জানাযা এলে তা বিলম্ব না করে পড়ে নিতে হবে।

যে যে সময়ে নামায পড়া মাকরুহ

১. যখন পেশাব পায়খানার চাপ পড়ে অথবা বায়ু নিঃসরণের প্রয়োজন হয়।

২. ভয়ানক ক্ষুধা লেগেছে এবং খানা সামনে হাযির। যদি মনে হয় যে, খানা না খেলে নামাযে মন বসবে না। এ অবস্থায় নামায পড়লে হয়ে যাবে কিন্তু মাকরুহ হবে। এ সব প্রয়োজন সেরে নামায পড়া উচিত, যাতে করে নিবিষ্ট মনে নামায পড়া যায়।

যে যে সময় শুধু নফল নামায মাকরুহ

১. যখন ইমাম খুতবা দেয়ার জন্যে নিজের জায়গা থেকে উঠবেন। তা জুম'আর খুতবা হোক, ঈদের হোক, বিয়ের হোক বা হজ্জের হোক।

২. ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় এবং তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সময়ে।

৩. আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৪. ফজরের সময় ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায।

৫. ফরয নামাযের সময় যখন তাকবীর বলা হয়।

৬. ঈদের নামাযের আগে ঘরে হোক বা মাঠে।

৭. ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে নফল নামায।

৮. আরাফাতে যোহর আসরের মাঝে এবং আসরের পরে।

৯. মুযদালফায় মাগরেব এশার মাঝে এবং পরে।

১০. মাগরেবের সময় মাগরেবের নামাযের প্রথমে।

এশার নামায বেশী বিলম্বে পড়া এবং অর্ধেক রাতের পরে পড়াও মাকরূহ। মাগরেব নামায বিলম্বে পড়া যখন তারকা পুঞ্জ ভালভাবে বের হয়ে আসে।

আযান ও একামাতের বয়ান

আযান ও একামাতের অর্থ

আযানের অর্থ সাবধান করা, অবহিত করা, ঘোষণা করা। শরীয়তের পরিভাষায় জামায়াতে নামাযের জন্যে–মানুষ জমায়েত করার উদ্দেশ্যে কিছু বিশিষ্ট শব্দের মাধ্যমে ডাক দেয়া এবং ঘোষণা করার নাম আযান। প্রথম প্রথম ওয়াক্ত অনুমান করে মানুষ স্বয়ং মসজিদে হাযির হতো এবং জামায়াতে নামায পড়তো। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা যখন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকা বহু সংখ্যক লোক মুসলমান হওয়া শুরু করে, তখন অনুভব করা হলো যে, নামাযের জন্যে ঘোষণা দেয়া হোক। অতএব হিজরী প্রথম বছরে নবী (সঃ) আযানের তরীকা শিক্ষা দিলেন।

একামাতের অর্থ হলো দাঁড় করানো। ইসলামের পরিভাষা হিসাবে জামায়াত শুরু হওয়ার আগে আযানের কথাগুলো পুনরায় বলা এবং এ কথা ঘোষণা করা যে, জামায়াত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এ জন্যে একামাতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর ؛ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলা হয় অর্থাৎ নামায দাঁড়িয়ে গেছে বা মানুষ নামাযের জন্যে দাঁড়িয়েছে।

আযানের ফযীলত

আযান উম্মতে মুসলেমার বিশিষ্ট আলামত। হাদীসে আযানের ফযীলত ও মহত্ব সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করা হলো।

নবী (সঃ) বলেছেন–

১. আম্বিয়া এবং শহীদানের পর আযানদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে। –(ইলমুল ফেকাহ)

২. আযান যতদূর পর্যন্ত পৌছে এবং যারাই তা শুনে (মানুষ হোক বা জ্বিন হোক), তারা কেয়ামতের দিনে আযানদানকারীর ঈমানের সাক্ষ্যদান করবে।–(বুখারী)।

৩. যে ব্যক্তি ক্রমাগত সাত বছর আযান দেবে এবং তার জন্যে আখেরাতের প্রতিদান চাইবে তার জন্যে জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লিখে দেয়া হয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

৪. কেয়ামতে আযানদানকারীদের ঘাড় উন্নত হবে। অর্থাৎ সে দিন তাদেরকে বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করা হবে।-(মুসলিম)

৫. আযানের সময় শয়তানের মনে ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং সে চরম ভগ্নোৎসাহে পলায়ন করে। যতদূর পর্যন্ত আযানের ধ্বনি পৌঁছে ততদূর পর্যন্ত সে থাকতে পারে না।-(বুখারী ও মুসলিম)।

৬. যেখানে আযান দেয়া হয় সেখানে আল্লাহ্‌র রহমত হয় এবং সে স্থান আযাব এবং বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। (তাবারানী)।

আযান ও একামাতের মসনূন তরীকা

আযানের মসনূন তরীকা হচ্ছে এই যে, মুয়াযযিন (আযানদানকারী) পাক সাফ হয়ে কোন উঁচু স্থানে কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং দুই কানের মধ্যে শাহাদত অংগুলিদ্বয় প্রবেশ করিয়ে উঁচু গলায় নিম্নের কথাগুলো বলবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়)-চার বার।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।)-দুবার।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রসূল)-দু'বার।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (এসো নামাযের দিকে)-দু'বার

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (এসো কল্যাণ ও কৃতকার্যতার দিকে)-দু'বার।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়)-দুবার

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)-একবার।

আল্লাহ আকবার দুবার বলার পর এবং অন্যান্য কালেমাগুলো বলার পর পর এতটা সময় থামতে হবে যাতে করে শ্রোতাগণ তার জবাব দিতে পারে-

অর্থাৎ তারাও তা উচ্চারণ করতে পারে। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় ডান দিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বামদিকে মুখ ফিরাবে।

একামাতের সময় ঐ কথাগুলোই ততোবার করে বলতে হবে। শুধু পার্থক্য এই যে, এ কথাগুলো নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বলতে হবে। আর حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর দুবার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে।

আযানের জবাব ও দোয়া

১. যে ব্যক্তিই আযান শুনতে পাবে তার জন্যে জবাব দেয়া ওয়াজেব। অর্থাৎ মুয়ায্যিন যা বলবে তাই বলতে হবে। তবে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর বলতে হবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ[১] নবী (সঃ) বলেন, যখন মুয়ায্যিন বলবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর মুয়ায্যিন যখন বলবে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং জবাবদানকারী বলবে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তারপর মুয়ায্যিন যখন বলবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ এবং জবাবদানকারী বলবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ তরপর মুয়ায্যিন যখন বলবে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং জবাবদানকারী বলবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ তারপর মুয়ায্যিন যখন বলবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এবং জবাবদানকারী বলবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ তারপর মুয়ায্যিন যখন বলবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং জবাবদানকারী বলবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর মুয়ায্যিন যখন বলবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং জবাবদানকারী বলবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তখন যে ব্যক্তি আযানের জবাবে এ কথাগুলো বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

২. ফজরের আযানের সময় যখন মুয়ায্যিন اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুম থেকে নামায উত্তম) বলবে তখন শ্রোতা বলবে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (তুমি সত্য কথাই বলেছ এবং মংগলের কথা বলেছ)।

৩. আযান শুনার পর দরূদ শরীফ পড়বে। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) এর বর্ণনা, নবী (স) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আযান শুনবে তখন

---

১. আল্লাহর মদদ ব্যতীত না আমরা গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি আর না কোন নেক আমল করতে পারি। حول শব্দের অর্থ গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি এবং قوة শব্দের মর্ম আল্লাহর আনুগত্য ও ফরমাবরদারি করার শক্তি।

মুয়াযযিন যা বলবে তা সে নিজেও বলবে এবং আমার উপর দরূদ পড়বে। কারণ যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ্ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। এর ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম বলেন, اشهد ان محمدا رسول الله প্রথমবার শুনে একবার صلى الله عليك يا نبى الله বলা মুস্তাহাব (ইলমুল ফেকাহ, ২য় খণ্ড)।

৪.আযান শুনার পর নিম্নের দোয়া পড়বে। হযরত জাবের (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর এ দোয়া পড়বে সে আমার শাফায়াতের হকদার হবে (বুখারী)।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ –

(بخارى)

হে আল্লাহ্ এ কামেল দাওয়াত ও আসন্ন নামাযের মালিক, মুহাম্মদ (সঃ) কে 'অসিলা' দান কর, ফযীলত দান কর এবং তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদের উপর অধিষ্ঠিত কর যার ওয়াদা তুমি করেছ।

'দাওয়াতে তাম্মাহ' এর মর্ম হলো তাওহীদের এ আহবান যা পাঁচবার প্রত্যেক মসজিদ থেকে ধ্বনিত হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। 'অসিলার' মর্ম হচ্ছে জান্নাতে আল্লাহ্র নৈকট্যের সেই মর্যাদা যা শুধু নবী (সঃ) লাভ করবেন। তিনি বলেন ঃ

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মুয়াযযিনের আযান শুনবে। তখন নিজেও তা বলবে, তারপর আমার উপর দরূদ পাঠাবে। (কারণ যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠাবে আল্লাহ তার উপর দশ বার রহমত নাযিল করবেন।) তারপর সে আল্লাহ্র কাছে আমার জন্যে 'অসিলা' চাইবে। এ হচ্ছে জান্নাতে এমন মর্যাদা যা আল্লাহ্র কোন খাস বান্দার জন্যে নির্দিষ্ট। আমি আশা করি সে বান্দাহ আমিই হবো। যে ব্যক্তি আমার 'অসিলার' জন্যে দোয়া করবে তার শাফাআত করা আমার ওয়াজেব হয়ে যাবে (মুসলিম)।

'মাকামে মাহমুদ'–এর মর্ম হলো গৃহীত হওয়ার এমন এক উচ্চ মর্যাদা যার উপর অধিষ্ঠিত ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখেরাতে 'মাহমুদে খালায়েক' বা 'সৃষ্টি–প্রশংসিত' হবেন। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন–

عَسٰـى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (بنى اسرائيل ٧٩)

অতিসত্তর তোমার রব তোমাকে 'মাকামে মাহমুদের' উপর অধিষ্ঠিত করবেন ঃ (বনী ইসরাইল–৭৯)।

৫. একামাতের জবাব দেয়া মুস্তাহাব, ওয়াজেব নয়। কোন সময় মেয়েলোক আযান দিলে তা পুনরায় দিতে হবে।

৬. কয়েকটি আযানের শব্দ কানে এলে মাত্র একটি জবাবই যথেষ্ট হবে। প্রত্যেক আযানের পৃথক পৃথক জবাবের দরকার নেই।

৭. জুমার দিনে খুতবার আযানের জবাব দেয়া ওয়াজেব নয়, মাকরুহ নয়, বরঞ্চ মুস্তাহাব–(ইলমুল ফেকাহ)।

আযান ও মুয়াযযিনের রীতি পদ্ধতি

১. আযান পুরুষকে দিতে হবে। মেয়েলোকের আযান ঠিক হবে না। কোন ওয়াক্তে মেয়েলোক আযান দিলে তা পুনরায় দিতে হবে।

২. এমন লোকের আযান দিতে হবে যে শরিয়তের জরুরী মাসয়ালা সম্পর্কে অবহিত, নেক এবং পরেহযগার হয়। আওয়াজ খুব উচ্চ হওয়া ভালো।

৩. জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকের আযান দেয়া উচিত। পাগল এবং হুশ কম এমন ব্যক্তির আযান মাকরুহ। এরূপ অবুঝ বালকের আযানও মাকরুহ।

৪. আযান মসজিদের বাইরে কোন উচ্চ স্থানে কেবলামুখী হয়ে দেয়া উচিত। অবশ্যি জুমার দ্বিতীয় আযান যা খুতবার আগে দেয়া হয়, তা মসজিদের মধ্যে দেয়া মাকরুহ নয়।

৫. আযান দাঁড়িয়ে থেকে দিতে হবে। বসে বসে আযান দেয়া মাকরুহ।

৬. আযান বলার সময় দু'হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি কানের ছিদ্রের মধ্যে দেয়া মুস্তাহাব।

৭. আযানের শব্দগুলো থেমে থেমে দেয়া এবং একামত অনর্গল বলা সুন্নাত। আযানের কথাগুলো এমনভাবে দম নিয়ে বলতে হবে যেন শ্রোতা জবাব দিতেপারে।

৮. আযানে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় ডান দিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফেরানো সুন্নাত। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, বুক এবং পায়ের পাতা কেবলার দিক থেকে ফিরে না যায়।

আযান ও একামাতের মাসয়ালা

১. 'ফরযে আইন' নামাযের জন্যে আযান সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, তা ওয়াক্তের নামায হোক বা কাযা নামায, নামায পাঠকারী মুকীম হোক অথবা মুসাফির সকল অবস্থায় আযান সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। অবশ্যি সফরের অবস্থায় যখন জামায়াতে যোগদানকারী সকল সাথী উপস্থিত থাকে তাহলে আযান মুস্তাহাব হবে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়।

২. নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দিতে হবে। পূর্বে আযান দিলে তা ঠিক হবে না। সময় হলে দ্বিতীয়বার আযান দিতে হবে তা যে কোন সময়ের আযান হোক না কেন।

৩. আযান আরবী ভাষায় এবং ঐসব শব্দমালায় বলতে হবে যা নবী (সঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় আযান জায়েয হবে না এবং নবী (সঃ)-এর শিখানো কথাগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোন শব্দাবলী দিয়ে নামাযের জন্যে ডাকা জায়েয হবে না। এসব অবস্থায় মানুষ আযান বুঝতে পেরে জমায়েত হলেও আযান ঠিক হবে না। মসনূন তারীকায় আযান একান্ত জরুরী।

৪. আযান সব সময়ে জ্ঞানবান, বালেগ এবং পুরুষকে দিতে হবে। স্ত্রীলোকের আযান মাকরুহ তাহরীমি। এমনকি পাগল ও নেশাগ্রস্ত লোকের আযানও মাকরুহ। অবুঝ বালকের আযানও মাকরুহ। কোন সময় মেয়েলোক, অথবা কোন পাগল বা কোন অবুঝ বালক আযান দিলে পুনরায় তা দিতে হবে।

৫. যে সব মসজিদে জামায়াতসহ নিয়মিত নামাযের ব্যবস্থাপনা আছে, এবং নিয়ম মাফিক আযান ও একামাতের সাথে জামায়াত হয়ে গেছে, সেখানে দ্বিতীয়বার আযান ও একামাত দিয়ে জামায়াত করা মাকরুহ। তবে যদি কোন মসজিদে নিয়ম মাফিক জামায়াতের ব্যবস্থাপনা না থাকে, না সেখানে কোন নির্দিষ্ট ইমাম আছে আর না মুয়াযযিন, তাহলে সেখানে পুনরায় আযান ও একামাত দিয়ে নামায পড়া মাকরুহ নয় বরঞ্চ ভালো।

৬. ফরযে আইন নামায ব্যতীত অন্য নামাযে, যেমন জানাযা, ঈদ, ওয়াজেব ও নফল নামাযে আযান দেয়া ঠিক নয়।

৭. আযান দেয়ার সময় কথা বলা অথবা সালামের জবাব দেয়া দুরস্ত নয়। যদি হঠাৎ কেউ সালামের জবাব দেয় তো ঠিক আছে। কিন্তু তারপর কথা বলা শুরু করলে পুনরায় আযান দিতে হবে।

৮. জুমার প্রথম আযান শুনার সাথে সাথেই সকল কাজকাম ছেড়ে মসজিদে যাওয়া ওয়াজেব। আযান শুনার পর দস্তুর মতো কাজকামে রত থাকা এবং কারবার করা হারাম।

৯. যখন কারো কানে আযান ধ্বনি পৌছবে, সে পুরুষ বা নারী, অযুসহ হোক বা বেঅযুতে হোক, তার উচিত আযানের প্রতি মনোযোগ দেয়া। যদি পথ চলা অবস্থায় হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে পড়া মুস্তাহাব। আযান হওয়াকালে তার জবাব দেয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজে রত হওয়া ঠিক নয়। না সালাম দেবে, আর না তার জবাব। কুরআন পড়তে থাকলে তা বন্ধ করতে হবে।

১০. যে ব্যক্তি আযান দেয়, একামাত দেয়ার হক তার। যদি সে আযান দিয়ে কোথাও চলে যায়, অথবা স্বয়ং চায় যে, অন্য কেউ একামাত দিক, তাহলে তার একামাত দুরস্ত হবে।

১১. মুয়াযযেনকে যে মসজিদে ফরয পড়তে হবে তাকে আযান সে মসজিদেই দিতে হবে। দুই মসজিদে এক ফরয নামাযের জন্যে আযান দেয়া মাকরুহ।

১২. কয়েক মুয়াযযেনের এক সাথে আযান দেয়াও জায়েয।

১৩. বাচ্চা পয়দা হলে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামাত দেয়া মুস্তাহাব।

আযানের জবাব দেয়া ওয়াজেব কিন্তু সাত অবস্থায় না দেয়া উচিত

১. নামায অবস্থায়।

২. খুতবা শুনার সময়, তা জুমার হোক বা অন্য কোন খুতবা।

৩. হায়েয ও নেফাসের অবস্থায়।

৪. এলমে দ্বীন পড়া এবং পড়াবার সময়।

৫. বিবির সাথে সহবাসের সময়।

৬. পেশাব পায়খানার অবস্থায়।

৭. খানা খাওয়ার অবস্থায়।

নামায ফরয হওয়ার শর্ত

নামায ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি। তার মধ্যে কোন একটি শর্ত পাওয়া না গেলে নামায ফরয হবে না।

১. ইসলাম। অর্থাৎ নামায মুসলমানদের উপর ফরয, কাফেরের উপর নয়।

২. বালেগ হওয়া যতোক্ষণ না বালক বালিকা সাবালক হবে, ততোক্ষণ তাদের উপর নামায ফরয হবে না।

৩. হুশ জ্ঞান থাকা। যদি কেউ পাগল হয় অথবা বেহুশ হয় অথবা সব সময়ে নেশাগ্রস্ত বা বেহুশ থাকে। তার উপর নামায ফরয হবে না।

৪. মেয়ে লোকদের হায়েয ও নেফাস থেকে পাক হওয়া। হায়েয ও নেফাসের সময় নামায ফরয নয়।

৫. নামাযের ওয়াক্ত হওয়া। অর্থাৎ নামাযের এতোটা সময় পেতে হবে যেন পড়া যায় অথবা অন্ততপক্ষে এতটুকু সময় পেতে হবে যে, পাক সাফ হয়ে তাকবীর তাহরীমা বলা যায়। যদি উপরের চারটি শর্ত পাওয়া যায় কিন্তু নামাযের এতটুকু সময় পাওয়া না যায়, তাহলে সে ওয়াক্তের নামায ফরয হবেনা।

নামাযের ফরযসমূহ

নামায সহীহ বা সঠিক হওয়ার জন্যে এমন চৌদ্দটি জিনিসের প্রয়োজন যার একটি ছুটে গেলে নামায হবে না। এ চৌদ্দটি জিনিসকে নামাযের ফারায়েয বা ফরযসমূহ বলে। এ সবের মধ্যে সাতটি নামাযের পূর্বে ফরয, (প্রয়োজনীয়) যাকে শর্তসমূহ বা শারায়েত বলে। বাকী সাতটি নামাযের ভেতরে ফরয বা জরুরী যাকে নামাযের আরকান বা স্তম্ভসমূহ বলে।

শারায়েতে নামায

শারায়েতে নামায সাতটি। যদি তার মধ্যে একটিও বাকী থাকে তাহলে নামায হবে না।

১. শরীর পাক হওয়া

অর্থাৎ শরীরের উপর যদি কোন হাকিকী নাজাসাত লেগে থাকে তাহলে তা শরীয়তের হেদায়েত মুতাবিক দূর করতে হবে। যদি অযুর দরকার হয়, অযু করতে হবে। গোসলের দরকার হলে গোসল করতে হবে। শরীর যদি নাসাজাতে হাকিকী ও হুকমী থেকে পাক না হয়, নামায হবে না।

২. পোশাক পাক হওয়া

অর্থাৎ যে কাপড় পরিধান করে অথবা গায়ে দিয়ে নামায পড়া হবে তা পাক হওয়া জরুরী। জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ি, কোট, শিরওয়ানি, চাদর, কম্বল, মুজা, দস্তানা, মোট কথা নামাযীর গায়ে যা কিছুই থাকবে তা পাক হওয়া জরুরী। নতুবা নামায হবে না।

৩. নামাযের স্থান পাক হওয়া

অর্থাৎ নামায পাঠকারী দু'পায়ের, হাটুর, হাত ও সিজদার স্থান পাক হওয়া জরুরী। তা খালি যমীন হোক, অথবা যমীনের উপর বিছানা, মুসাল্লা প্রভৃতি যাই হোক। নামায সহীহ হওয়ার জন্যে যদিও এতটুকু স্থান পাক হওয়া জরুরী, তথাপি এমন স্থানে নামায পড়া ঠিক নয় যার পাশেই মলমূত্র আছে এবং তার থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

৪. সতর ঢাকা

অর্থাৎ শরীরের ঐসব অংশ আবৃত রাখা, যা নারী পুরুষের জন্যে ফরয। পুরুষের জন্যে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। নারীর জন্যে হাতের তালু, পা এবং চেহারা ব্যতীত সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা ফরয।[১] পা খোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, টাখনু যেন–বের হয়ে না পড়ে। কারণ নারীদের টাখনু ঢেকে রাখা জরুরী।

৫. নামাযের ওয়াক্ত হওয়া

অর্থাৎ যে সময়ে নামাযের যে সময়, সময়ের ভেতরেই নামায পড়তে হবে। ওয়াক্ত আসার পূর্বে যে নামায পড়া হবে তা হবে না এবং ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পরে পড়লে তা কাযা নামায হবে।

৬. কেবলামুখী হওয়া

অর্থাৎ কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়া কোন সত্যিকার কারণ অথবা অসুস্থতা ব্যতিরেকে কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে যদি কেউ নামায পড়ে, তবে সে নামায হবে না।

৭. নিয়ত করা

অর্থাৎ যে ফরয নামায পড়তে হবে, সেই নির্দিষ্ট নামাযের জন্যে মনে মনে এরাদা করা। যদি কোন ওয়াক্তের কাযা নামায পড়তে হয় তাহলে এই এরাদা করতে হবে যে, অমুক দিনের অমুক ওয়াক্তের কাযা নামায পড়ছি অবশ্যি নফল ও সুন্নাতের জন্যে নফল অথবা সুন্নাত নামায পড়ছি এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে। মনের এরাদা বা ইচ্ছার প্রকাশের জন্যে মুখেও বলা ভাল কিন্তু জরুরী নয়। যদি ইমামের পেছনে নামায পড়তে হয় তাহলে তারও নিয়ত করা জরুরী।

---

১. এ এমন এক ফরয যা নামাযের ভেতরে এবং বাইরে সর্বদা মেনে চলা একান্ত জরুরী। ফরয হওয়া সত্ত্বেও নামাযের মধ্যে একে শর্তাবলীর মধ্যে এ জন্যে শামিল করা হয়েছে যে, নামাযের অংশ নয়।

নামাযের আরকান

নামাযের ভেতরে যে সব জিনিস ফরয তাকে আরকান বলে। নামাযের আরকান সাতটি।

১. তাকবীর তাহরীমা

অর্থাৎ নামায শুরু করার সময় আল্লাহু আকবার বলা যার দ্বারা আল্লাহ্‌র মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়। এ তাকবীরের পর চলাফেরা, খানাপিনা, কথাবার্তা সব কিছু হারাম হয়ে যায় বলে একে তাকবীর তাহরীমা বলা হয়।

২. কেয়াম

অর্থাৎ নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। নামাযে এতটুকু সময় দাঁড়িয়ে থাকা ফরয যে সময়ে সেই পরিমাণ কুরআন পড়া যায় যা পড়া ফরয। উল্লেখ থাকে যে, এ 'কেয়াম' শুধু ফরয এবং ওয়াজেব নামাযে ফরয। সুন্নাত-নফল নামাযে 'কেয়াম' ফরয নয়।

৩. কেরায়াত

অর্থাৎ নামাযে কমপক্ষে এক আয়াত পড়া,[১] আয়াত বড়ো হোক বা ছোটো হোক। কিন্তু সে আয়াত অন্তত দুটি শব্দে গঠিত হতে হবে। যেমন اَللّٰهُ الصَّمَدُ কিন্তু যদি আয়াতে একই শব্দ হয়, যেমন صٓ-قٓ-مُدْهَآمَّتَانِ তাহলে ফরয আদায় হবে না।[২]

ফরয নামাযগুলোতে শুধু দু'রাক্‌য়াতে কেরায়াত ফরয তা প্রথম দু'রাক্‌য়াতে হোক, শেষ দু'রাক্‌য়াতে হোক, মাঝের দু'রাক্‌য়াতে হোক অথবা প্রথম ও শেষ রাক্‌য়াতে হোক সকল অবস্থায় ফরয আদায় হয়ে যাবে। বেতের, সুন্নাত এবং নফলের সকল রাক্‌য়াতে কেরায়াত ফরয।

---

১. অর্থাৎ কেউ কোন সময়ে যদি একই আয়াত পড়ে নামায শেষ করে তাহলে নামায হয়ে যাবে নতুন করে পড়ার দরকার হবে না। কিন্তু একই আয়াত পড়ার অভ্যাস কিছুতেই সহীহ হবে না।

২. এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত এই যে, ছোটো তিন আয়াত অথবা বড়ো এক আয়াত পড়া ফরয।

৪. রুকু'

প্রত্যেক রাক্য়াতে একবার রুকু' করা ফরয। রুকু'র অর্থ হলো নামাযী এতটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন তার দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

৫. সিজদা

প্রতি রাক্য়াতে দু' সিজদা ফরয।

৬. কা'দায়ে আখেরাহ

অর্থাৎ নামাযের শেষ রাক্য়াতে এতক্ষণ পর্যন্ত বসা যাতে اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ থেকে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পর্যন্ত পড়া যায়।

৭. ইচ্ছাকৃত কাজের দ্বারা নামায শেষ করা

অর্থাৎ নামাযের যাবতীয় আরকান সমাধা করার পর এমন কোন কাজ করা যা নামাযে নিষিদ্ধ এবং যার দ্বারা নামায শেষ হয়।[১]

নামাযের ওয়াজেবসমূহ

নামাযের ওয়াজেব বলতে ঐসব জরুরী বিষয় বুঝায় যার মধ্যে কোন একটি ভুল বশত ছুটে গেলে সিজদায়ে সহু দ্বারা নামায দুরস্ত হয়। ভুলবশত কোন জিনিস ছুটে যাওয়ার পর যদি সিজদায়ে সহু করা না হয় অথবা ইচ্ছা করেই কোন জিনিস ছুটে যাওয়ার পর যদি সিজদায়ে সহু করা না হয় অথবা ইচ্ছা করে কোন জিনিস ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে পুনরায় নামায পড়া ওয়াজেব হয়ে যায়। নামাযের ওয়াজেব চৌদ্দটি।

১. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক্য়াতে কেরায়াত করা।

২. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক্য়াতে এবং বাকী নামাযগুলোর সমস্ত রাক্য়াতে সূরায়ে ফাতেহা পড়া।

৩. সূরা ফাতেহা পড়ার পর ফরয নামযের প্রথম দু'রাক্য়াতে এবং ওয়াজেব সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাকয়াতে অন্য কোন সূরা পড়া তা গোটা সূরা হোক, বড়ো এক আয়াত হোক অথবা ছোট তিন আয়াত হোক।

---

১. 'কেয়াম' ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আরকান প্রত্যেক নামাযে ফরয তা ফরয হোক ওয়াজেব হোক অথবা নফল। 'কেয়াম' শুধু ফরয এবং ওয়াজেব নামাযে ফরয।

৪. সূরা ফাতেহা দ্বিতীয় সূরার প্রথমে পড়া। যদি কেউ প্রথমে অন্য সূরা পড়ার পর সূরা ফাতেহা পড়ে তাহলে ওয়াজেব আদায় হবে না।

৫. কেরায়াত, রুকু', সিজদা এবং আয়াতগুলোর মধ্যে ক্রম ঠিক রাখা।

৬. 'কাওমা' করা। অর্থাৎ রুকু' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭. 'জলসা' করা। অর্থাৎ দু'সিজদার মাঝে নিশ্চিত মনে সোজা হয়ে বসা।

৮. তা'দীলে আরকান। অর্থাৎ রুকু' এবং সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে ভালভাবে আদায় করা।

৯. কা'দায়ে উলা। অর্থাৎ তিন এবং চার রাক্য়াত বিশিষ্ট নামাযে দু' রাক্য়াতের পর التحيات পড়ার পরিমাণ সময় বসা।

১০. উভয় কা'দায় একবার আত্তাহিয়্যাত পড়া।

১১. ফজরের উভয় রাক্য়াতে, মাগরেব এবং এশার প্রথম দু'রাক্য়াতে জুমা ও ঈদের নামাযে, তারাবীহ এবং রমযান মাসে বেতেরের নামাযে ইমামের উচ্চস্বরে কেরায়াত করা। যোহর ও আসর নামাযে এবং মাগরেব ও এশার শেষ রাক্য়াতগুলোতে আস্তে কেরায়াত করা।

১২. নামায السلام عليكم দ্বারা শেষ করা।

১৩. বেতের নামাযে দোয়া কুনূতের জন্যে তাকবীর বলা এবং দোয়া কুনূত পড়া।

১৪. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলা।

নামাযের সুন্নাতসমূহ

নবী (সঃ) নামাযের মধ্যে ফরয এবং ওয়াজেব ছাড়াও অন্য কতকগুলো জিনিসও করেছেন কিন্তু সে সবের এমন কোন তাকীদ তিনি করেছেন বলে প্রমাণিত নেই–যেমন ফরয এবং ওয়াজেবের বেলায় রয়েছে। এগুলোকে নামাযের সুন্নাত বলা হয়। যদিও এগুলো ছুটে গেলে নামায নষ্ট হয় না এবং সহ সিজদাও অপরিহার্য হয় না, তথাপি এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ নবী (সঃ) এগুলোকে মেনে চলেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে নামায তো তাই যা নবী (সঃ)–এর নামাযের সদৃশ।

নামাযের সুন্নাত একুশটি–

১. তাকবীর তাহরীমা বলার আগে পুরুষের কানের নিম্নভাগ[১] পর্যন্ত এবং নারীর কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠানো। ওজর বশতঃ পুরুষ কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠালে সহীহ হবে।

২. তাকবীর তাহরীমা বলার সময় দু'হাতের আঙ্গুলগুলো খুলে রাখা এবং দুই হাতলি এবং আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করা।

৩. তাকবীর তাহরীমা বলার পরক্ষণেই পুরুষের নাভির[২] উপরে এবং মেয়েদের বুকের উপর হাত বাঁধা। হাত বাঁধার মসনূন তরিকা এই যে, ডান হাতের হাতুলি বাম হাতের হাতুলির পিঠের উপর রাখবে এবং ডান হাতের বুড়ো আংগুল এবং ছোট আংগুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে। আর বাকী তিন আংগুল বাম হাতের উপর বিছিয়ে রাখবে। এ তরীকা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যে। অবশ্যি দুই আংগুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা নারীদের জন্যে সুন্নাত নয়।

৪. তাকবীর তাহরীমা বলার সময় মস্তক অবনত না করা।

৫. ইমামের জন্যে তাকবীর তাহরীমা এবং এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাবার সময় তাকবীর জোরে বলা।

৬. সানা পড়া। অর্থাৎ 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' শেষ পর্যন্ত পড়া।[৩]

---

১. নবী (সঃ) শীতের কারণে চাদরের ভেতরে বুক পর্যন্ত হাত তুলেছেন।

২. ইমাম শাফেয়ী (র) এবং আহলে হাদীস ওলামার অভিমত হচ্ছে পুরুষেরও বুকে হাত বাঁধা সুন্নাত। অবশ্যি এ কথা বলা ঠিক নয় যে, নাভি পর্যন্ত হাত বাঁধা হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। ইবনে আবি শায়বা আল কাযার মাধ্যমে ওয়ায়েল বিন হুজারের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি নবী (সঃ)কে নাভীর নীচে হাত বাঁধতে দেখেছেন। এ হাদীসের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য হযরত আলকামা এবং ইবনে হুজারের সাক্ষাতও প্রমাণিত। আল্লামা ফিরিংগী মহল্লী আল কাওলুল হাযেমে এ বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন।

৩. নিম্নের দোয়া পড়াও হাদীসে আছে ঃ–

(١) اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ – اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ – اَللّٰهُمَّ اَغْسِلْ خَطَايَاىَ مِنَ الْمَاءِ وَالثَّلْجِ الْبَرْدِ –

(بخارى)

৭. أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পড়া।

৮. প্রত্যেক রাক্‌য়াতে সূরা ফাতেহার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া।

৯. ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাক্‌য়াতে শুধু মাত্র সূরা ফাতেহা পড়া।

১০. আমীন বলা। ইমামও আমীন বলবে এবং একাকী নামায পাঠকারীও আমীন বলবে। যেসব নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কেরায়াত পড়বে তাতে সূরা ফাতেহা খতম হওয়ার পর সকল মুক্তাদী আমীন বলবে।

১১. সানা, আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ এবং আমীন আস্তে পড়বে।[১]

১২. কেরায়াতে মসনূন তরীকা অনুসরণ করা। যে যে নামাযে যতখানি কুরআন পড়া সুন্নাত সেই মুতাবেক পড়া। •

হে আল্লাহ্! আমার এবং আমার গুনাহগুলোর মধ্যে এমন দূরুত্ব সৃষ্টি করে দাও যেমন দূরুত্ব পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে গুনাহ থেকে এমন পাক কর, যেমন সাদা কাপড় ময়লা আবর্জনা থেকে ধুয়ে সাফ হয়ে যায়। হে আল্লাহ্, পানি ও বরফ দিয়ে আমার গুনাহগুলো ধুয়ে দাও। (বুখারী)

আবূ ইউসুফ (র)-এর নিকটে নিম্নের দোয়া পড়া মুস্তাহাব :

(٢) اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَا لِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ঠ হয়ে সেই পবিত্র সত্তার দিকে মুখ করছি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। বস্তুত আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং মৃত্যু আল্লাহরই জন্যে-যিনি সারা জাহানের রব এবং অনুগতদের মধ্যে আমি প্রথম অনুগত। (আল-আনয়াম)

১. হানাফীদের মতে 'আমীন' আস্তে পড়তে হবে। এক রেওয়ায়েতে ইমাম মালেকেরও এ উক্তি কথিত আছে। ইমাম শাফেয়ীর শেষ উক্তিও তাই অবশ্যি আস্তে এবং জোরে পড়া উভয়ই হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে। এ জন্যে এটা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এর ভিত্তিতে দলাদলি করতে হবে এবং এক দল অপর দলকে গালমন্দ করবে। যখন আওয়ায করে পড়া এবং আওয়ায না করে পড়া উভয়ই হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে, তখন যে যে পন্থাকে নিজের বুঝ মোতাবেক সুন্নাত মনে করে পালন করছে তার কদর করা উচিত, গালমন্দ করা ঠিক নয়।

১৩. রুকু এবং সিজদায় অন্ততপক্ষে তিনবার তসবীহ পড়া। অর্থাৎ রুকুতে سبحان ربى العظيم এবং সিজদায় سبحان ربى الاعلى পড়া।

১৪. রুকুতে মাথা এবং কোমর সটান সোজা রাখা এবং দু'হাতের আংগুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা

১৫. কাওমায় (রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায়) ইমামের سمع الله لمن حمده বলা এবং মুক্তাদীর ربنا لك الحمد বলা।

১৬. সিজদায় যাবার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দুহাত, তারপর নাক এবং তারপর কপাল রাখা।

১৭. জলসা এবং কা'দায় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা এমনভাবে খাড়া রাখা যেন আঙ্গুলগুলোর মাথা কেবলার দিকে থাকে। দু'হাত হাঁটুর উপর রাখা।

১৮. আত্তাহিয়্যাতে 'লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদত অংগুলি দ্বারা এশারা করা।

১৯. শেষ কা'দায় আত্তাহিয়্যাতের পর দরুদ পড়া।

২০. দরুদের পর কোন মসনূন দোয়া পড়া।

২১. প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফেরা।

নামাযের মুস্তাহাবগুলো

নামাযে পাঁচটি মুস্তাহাব। তা মেনে চলা খুবই সওয়াবের কাজ এবং ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে না।

১. পুরুষ যদি চাদর প্রভৃতি গায়ে দিয়ে থাকে, তাহলে তাকবীর তাহরীমার জন্যে হাত উঠাবার সময় চাদর থেকে বাইরে বের করা, মেয়েদের হাত বের না করে তাকবীর তাহরীমা বলা।

২. দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে, রুকু অবস্থায় দু'পায়ের উপর, জলসা ও কা'দার সময় দু'হাঁটুর উপর এবং সালাম ফেরাবার সময় দু'কাঁধের উপর নযর রাখা।

৩. নামাযী একাকী নামায পড়লে রুকু এবং সিজদায় তিনবারের বেশী তসবীহ পড়া।

৪. কাশি যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে রাখা।

৫. হাই এলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা, মুখ খুলে গেলে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত দিয়ে এবং অন্যান্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ ঢাকা।

যে সব কারণে নামায নষ্ট হয়

যে সব কারণে নামায নষ্ট হয় তা চৌদ্দটি। নামায রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তা স্মরণ রাখা জরুরী।

১. নামাযে কথা বলা। অল্প হোক বা বেশী হোক নামায নষ্ট হবে এবং পুনরায় পড়তে হবে। কথা বলার পাঁচটি অবস্থা হতে পারে ঃ-

* প্রথম অবস্থা এই যে, কোন লোকের সাথে স্বয়ং কথা বলা অথবা কারো কথার জবাব দেয়া। নিজের ভাষায় হোক, অন্য কোন ভাষায় অথবা স্বয়ং কুরআনের ভাষায় হোক সকল অবস্থায় নামায নষ্ট হবে। যেমন ধরুন ইয়াহ্ইয়া নামক কোন ব্যক্তিকে কেউ কুরআনের ভাষায় বললো يَايَحْيٰى خُذِالْكِتَاب অথবা মরিয়ম নামের কোন মেয়েকে বললো- يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ অথবা পথিককে জিজ্ঞাসা করলো- فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ অথবা কাউকে হুকুম করলো اقْرَأْ كِتَابَكَ অথবা কোন দুঃসংবাদ শুনে বললো اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ অথবা কারো হাঁচি শুনে বললো يَرْحَمُكَ اللّٰهُ অথবা কোন আজব কথা শুনে বললো سُبْحٰنَ اللّٰهِ অথবা কোন খুশীর খবর শুনে বললো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অথবা কারো উপর নযর পড়লো এবং দেখলো যে সে আজেবাজে ও বেহুদা কথা বলছে। তখন বললো- اَللّٰهُ يَهْدِيْكَ অথবা কাউকে সালাম করলো কিংবা সালামের জবাব দিল, অথবা নামাযের বাইরে কেউ দোয়া করলো এবং নামাযী আমীন বললো, অথবা 'ইয়া আল্লাহ্' শুনে جَلَّ جَلَالُهٗ বললো, অথবা নবী (সঃ)-এর নাম শুনে দরুদ পড়লো, অথবা কোন নারী বাচ্চাকে পড়ে যেতে দেখে কিছু বললো-মোট কথা কোন প্রকারেই যদি কোন লোকের সাথে কেউ কথা বলে কিংবা কোন কিছুর জবাবে কিছু বলে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

* দ্বিতীয় অবস্থা। কোন পশুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে কিছু বলা। যেমন নামায পড়ার সময় নযর পড়লো যে, মুরগী অথবা বিড়াল খাবার জিনিসের উপর মুখ

দিচ্ছে এবং তাকে তাড়াবার জন্যে কিছু কথা বলা, এ অবস্থায় নামায নষ্ট হবে।

* তৃতীয় অবস্থা। স্বগতঃ নিজের থেকে কিছু কথা বলা তা নিজ ভাষায় হোক বা আরবী ভাষায় তাতে নামায নষ্ট হবে। হাঁ যদি কোন এমন কথা হয় যা কুরআনে আছে তাহলে নামায নষ্ট হবে না। যদি সে কথা তার মুদ্রাদোষ হয় তাহলে তা কুরআনের শব্দ হলেও নামায নষ্ট হবে। যেমন 'হাঁ' (نعم) কারো মুদ্রাদোষ হয় যদিও তা কুরআনে আছে, তথাপি নামায নষ্ট হবে।

* চতুর্থ অবস্থা। দোয়া ও যিকির করা। দোয়া নিজের ভাষায় হোক অথবা আরবী ভাষায় নামায নষ্ট হবে। আর যদি কুরআন ও হাদীসের দোয়া এবং যিকিরের মধ্যে থেকে কোনটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে নামায নষ্ট হবে না। তার অর্থ এই যে, হঠাৎ ঘটনাক্রমে যদি এমন ভুল হয়ে যায়, তাহলে নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু ইচ্ছা করে যদি এমন করা হয় এবং অভ্যাস হয়ে পড়ে যে রুকু, সিজদা বা বৈঠকে যা খুশী তাই কিছুতেই বলা যাবে না। তারপর যা মানুষের কাছে চাওয়া যায় তা যদি নামাযের মধ্যে চাওয়া হয়, তা আরবী ভাষায় হোক না কেন; তাতে নামায নষ্ট হবে।

* পঞ্চম অবস্থা। কেউ নামায পড়া অবস্থায় দেখলো যে, আর একজন কুরআন ভুল পড়ছে, তখন লোকমা দিল, তা সে নামাযে ভুল পড়ুক অথবা নামাযের বাইরে পড়ুক, নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ভুল পাঠকারী যদি তার ইমাম হয় তাহলে নামায নষ্ট হবে না। আর যদি মুক্তাদী কুরআন দেখে লোকমা দেয় অথবা অন্য কারো নিকটে সহীহ কুরআন শুনে আপন ইমামকে লোকমা দেয় তাহলে তার নামায নষ্ট হবে। আর ইমাম যদি তার লোকমা গ্রহণ করে তাহলে ইমামেরও নামায নষ্ট হবে।

২. নামাযে কুরআন দেখে পড়লেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৩. নামাযের শর্তগুলোর মধ্যে কোন একটি যদি খতম হয়ে যায়, তা নামায সহীহ হওয়ার শর্ত হোক অথবা ওয়াজেব হওয়ার শর্ত উভয় অবস্থায় নামায নষ্ট হবে। যেমন, তাহারাত রইলো না, অযু নষ্ট হলো অথবা গোসলের দরকার হলো অথবা হায়েযের রক্ত এলো, কাপড় নাপাক হলো, জায়নামায নাপাক হলো, অথবা বিনা কারণে কেবলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, অথবা সতর খুলে গেল এবং এতটা সময় পর্যন্ত খোলা রাইলো যে সময়ে রুকু বা সিজদা করা যায়, অথবা অন্য কোন কারণে

জ্ঞান হারিয়ে গেল অথবা পাগল হয়ে গেল, মোট কথা কোন একটি শর্ত খতম হলে নামায নষ্ট হবে।

৪. নামাযের ফরযসমূহের মধ্যে কোন একটি যদি ছুটে যায়, ভুল বশতঃ ছুটে যাক অথবা ইচ্ছা করে কোনটা ছেড়ে দেয়া হলে নামায নষ্ট হবে। যেমন, কেয়াম কেউ করলো না। অথবা রুকু সিজদা ছেড়ে দিল, অথবা কেরায়াত মোটেই পড়লো না, ভুল বশতঃ এমন হোক বা ইচ্ছা করে, নামায নষ্ট হবে।

৫. নামাযের ওয়াজেবগুলোর মধ্যে কোনটা অথবা সবগুলো ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে।

৬. নামাযের ওয়াজেব ভুলে ছুটে গেলে এবং সিজদা সহ না দিলে নামায পান্টাতে হবে।

৭. বিনা ওযরে এবং ন্যায়সংগত প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাশি দেয়া। তবে যদি রোগের কারণে আপনা আপনি কাশি আসে অথবা গলা সাফ করার জন্যে কাশি দেয় অথবা ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্যে কাশি দেয়া হয় যাতে ইমাম বুঝতে পারে যে, সে নামায ভুল পড়ছে, তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে না। এসব কারণ ব্যতীত বিনা কারণে কাশি দিলে নামায নষ্ট হবে।

৮. কোন দুঃখ কষ্ট, শোক বা কঠিন বিপদে পড়ে আঃ উঃ করলে অথবা কোন বেদনাদায়ক আওয়ায বা আর্তনাদ করলে নামায নষ্ট হবে। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কখনো কোন শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অথবা আল্লাহর ভয়ে কেউ কেঁদে ফেলে অথবা তেলাওয়াতে অভিভূত হয়ে কাঁদে অথবা আঃ উঃ শব্দ বের হয়, তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে না।

৯. নামায অবস্থায় ইচ্ছা করে হোক কিংবা ভুলে যদি কেউ কিছু খেয়ে ফেলে অথবা পান করে, যেমন পকেটে কিছু খাবার জিনিস ছিল, বেখেয়ালে অথবা ইচ্ছা করে খেয়ে ফেললো তাহলে নামায নষ্ট হবে। হাঁ তবে যদি দাঁতের মধ্য থেকে ছোলার পরিমাণ থেকে ছোটো কোন কিছু বের হলো এবং নামাযী তা খেয়ে ফেললো, তাহলে নামায নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছা করে এমন করাও ঠিক নয়। নামাযী ভালো করে মুখ সাফ করে নামাযে দাঁড়াবে।

১০. বিনা ওযরে নামাযে কয়েক কদম চলাফেরা করা। এতেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১১ আমলে কাসীর করা। অর্থাৎ এমন কাজ করা যা দেখলে লোক মনে করবে যে, সে ব্যক্তি নামায পড়ছে না। যেমন কেউ দু' হাতে কাপড় ঠিক করছে অথবা কোন মেয়েলোক নামাযের মধ্যে চুলের ঝুঁটি বাঁধছে অথবা নামায অবস্থায় বাচ্চা দুধ খাচ্ছে তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে।

১২. কুরআন পাক তেলাওয়াতে বড় রকমের ভুল করা যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, অথবা তাকবীরের মধ্যে আল্লাহ্র আলিফকে খুব টেনে পড়লো, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।[১]

১৩. বালেগ মানুষের অট্টহাসি করা।

১৪. দেয়ালে কিছু লেখা ছিল অথবা পোষ্টার ছিল অথবা পত্রের উপর নযর পড়লো এবং তা পড়ে ফেললো তাহলে নামায নষ্ট হবে। কিন্তু না পড়ে অর্থ বুঝে ফেললে নামায নষ্ট হবে না।

১৫. পুরুষের নিকটে মেয়েলোকের দাঁড়িয়ে থাকা এমন সময় পর্যন্ত যতোক্ষণে এক সিজদা অথবা রুকু করা যায় এমন অবস্থায় নামায নষ্ট হবে। তবে যদি কোন অল্প বয়স্ক বালিকা দাঁড়ায় যার প্রতি কোন যৌন আকর্ষণ হবে না, অথবা মেয়েলোকই দাঁড়ালো কিন্তু মাঝখানে পর্দা রইলো, তাহলে নামায নষ্ট হবে না।

যে সব কারণে নামায মাকরূহ হয়

এমন কতকগুলো কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত যে সবের দ্বারা নামায নষ্ট না হলেও মাকরূহ হয়ে যায়।

নামাযের মাকরূহ কাজগুলো আটাইশটি

১. প্রচলিত নিয়মের খেলাপ কাপড় পরিধান করা। যেমন, কেউ মাথার উপর চাদর দিয়ে দু'ধারে এমনি ঝুলিয়ে রাখলো,-ঘাড়ের উপর দিল না,

---

১. আলিফ টেনে পড়লে অর্থ হয়-আল্লাহ্ কি বড়ো?

২. মসজিদের এমন স্থানে কিছু লেখা অথবা পোষ্টার লাগানো ঠিক নয় যার দিকে নামাযীর

অথবা জামা অথবা শিরওয়ানীর আস্তিনে হাত না ঢুকিয়ে কাঁধের উপরে রাখলো, অথবা মাফলার প্রভৃতি গলায় দিয়ে দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখলো।

২. কাপড় ধূলাবালি থেকে বাঁচার জন্যে গুটিয়ে নেয়া, অথবা ধূলা ঝেড়ে ফেলা, অথবা সিজদার জায়গা থেকে পাথর কুচি প্রভৃতি সরিয়ে দেয়ার জন্যে বার বার ফুঁক দেয়া অথবা হাত ব্যবহার করা।[১]

৩. পরনের কাপড়, দাড়ি, বোতাম, মাথার চুল অথবা অন্য কিছু দ্বারা খেলা করা অথবা মুখে আংগুল দেয়া অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় হাতের উপর আংগুল বাজানো অথবা বিনা কারণে গা চুলকানো।[২]

৪. এমন মামুলি পোশাক পরিধান করে নামায পড়া যা পরিধান করে লোক হাট বাজার, কোন সভা সমিতিতে যাওয়া পছন্দ করে না। যেমন, কেউ বাচ্চাদের টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়ছে। মসজিদে তালের বা অন্য কোন কিছুর আজে বাজে টুপি রেখে দেয়া হয় তাই দিয়ে অনেকে নামায পড়ে। অথচ এসব মাথায় দিয়ে কেউ কোন মাহফিলে যোগদান করা পছন্দ করে না।

৫. অলসতাবশতঃ এবং বেপরোয়া হয়ে খালি মাথায় নামায পড়া মাকরুহ। তবে নিজ বাড়ীতে দীনহীনতার সাথে বিনা টুপিতে নামায পড়লে মাকরুহ হবে না। তবে মসজিদে ভাল পোশাকে নামায পড়া উত্তম।

৬. পেশাব পায়খানা অথবা বায়ু নিঃসরণের প্রয়োজনবোধ করলে তা পূরণ না করে নামায পড়া।

৭. পুরুষদের মাথার চুল বেঁধে নামায পড়া।

৮. হাতের আংগুল ফুটানো অথবা এক হাতের আংগুলগুলো অন্য হাতের আংগুলের মধ্যে ঢুকানো।

৯. নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা।

১০. কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে অথবা টেরা চোখে বিনা কারণে এদিক ওদিক তাকানো।

---

১. যদি একবার হাত দিয়ে পাথর কুচি সরিয়ে দেয়া হয় অথবা ফুঁক দিয়ে জায়গা সাফ করা হয় তাহলে কোন দোষ নেই।

২. অধিকাংশ লোক এসব কাজ করে থাকে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে এসব কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তারপর সঠিক পন্থা এই যে, পূর্ণ অনুভূতির সাথে নামায পড়তে হবে এবং মনের মধ্যে একাগ্রতা ও বিনয় নম্রভাব সৃষ্টি করতে হবে।

১১. সিজদায় দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।[১]

১২. এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায পড়া যে নামাযীর দিকে মুখ করে আছে।

১৩. মেহরাবের বিলকুল ভেতরে ইমামের দাঁড়ানো। যদি পা মেহরাবের বাইরে হয় এবং সিজদা প্রভৃতি ভেতরে হয় তাহলে দোষ নেই।

১৪. হাইতোলা ঠেকাতে সক্ষম হলে তা না ঠেকানো এবং ইচ্ছা করে হাই তোলা।

১৫. এমন কাপড় পরে নামায পড়া যার মধ্যে কোন প্রাণীর ছবি থাকে অথবা এমন মুসাল্লায় নামায পড়া যার মধ্যে সিজদার জায়গায় কোন প্রাণীর ছবি থাকে অথবা এমন স্থানে নামায পড়া যেখানে মাথার উপর অথবা ডানে বামে ছবি থাকে।

১৬. আগের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পেছনে একাকী দাঁড়ানো।

১৭. হাত অথবা মাথার ইশারায় সালাম করা।

১৮. চোখ বন্ধ করে নামায পড়া। নামাযে মন লাগাবার জন্যে এবং বিনয় নম্রতা ও দীনহীনতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যে চোখ বন্ধ করলে নামায মাকরুহ হবে না বরঞ্চ তা করা ভালো।

১৯. শুধু কপাল অথবা শুধু নাক মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদা করা অথবা টুপির কেনারা দিয়ে অথবা পাগড়ির উপর সিজদা করা।

২০. বিনা কারণে চারজানু হয়ে বসা এবং হাঁটুর সাথে পেট ও বুক লাগিয়ে বসা।

২১. বিনা কারণে শুধু ইমামের উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো। যদি কিছু মুক্তাদিও সাথে থাকে তাহলে দোষ নেই। এমনি বিনা কারণে মুক্তাদিদেরও উঁচু স্থানে দাঁড়ানো মাকরুহ।

২২. কেয়াম অবস্থায় কেরায়াত পুরা না করে ঝুঁকে পড়া এবং ঝুঁকেপড়া অবস্থায় কেরায়াত শেষ করা।

---

১. এমন করা শুধু পুরুষের জন্যে মাকরুহ। মেয়ে লোকদের কনুই পর্যন্ত দু'হাত মাটিতে বিছিয়ে সিজদা করতে হবে।

২৩. ফরয নামাযে কুরআনের ক্রমিক ধারা বজায় না রেখে কেরায়াত করা। যেমন প্রথম রাক্‌য়াতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়া এবং দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে تَبَّتْ يَدَا পড়া। অথবা মাঝখানে কোন তিন আয়াত বিশিষ্ট সূরা বাদ দিয়ে তার পরের সূরা পড়া। যেমন প্রথম রাক্‌য়াতে সূরা মাউন পড়ে দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে সূরা 'কাফেরুন' পড়া এবং মাঝখানের সূরা কাওসার' ছেড়ে দেয়া যা তিন আয়াতের সূরা। এমনি এক সূরার কিছু আয়াত প্রথম রাক্‌য়াতে পড়া এবং তারপর দু' আয়াত বাদ দিয়ে সামনে থেকে কিছু আয়াত দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে পড়াও মাকরুহ। এভাবে এক রাক্‌য়াতে এমনভাবে দু' সূরা পড়া মাকরুহ যে, তার মাঝখানে এক সূরা অথবা একাধিক ছোট কিংবা বড়ো সূরা বাদ থাকে। অথবা প্রথম রাক্‌য়াত থেকে দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে লম্বা কেরায়াত করা অথবা নামাযে পড়ার জন্যে কোন সূরা নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং হরহামেশা তা পড়া মাকরুহ। ভুলবশত, ক্রমের খেলাপ হলে দোষ নেই। উল্লেখ থাকে যে, শুধু ফরয নামাযেই এসব মাকরুহ, তারাবীহ অথবা অন্যান্য নফল নামাযে মাকরুহ নয়।

২৪. নামাযের সুন্নাতের মধ্যে কোনটা বাদ দেয়া।

২৫. সিজদার সময় দু'পা মাটি থেকে উঠানো।

২৬. নামাযে আয়াত, সূরা অথবা তসবীহ আংগুল দিয়ে গণনা করা

২৭. নামাযের মধ্যে গা হামানো বা অলসতা প্রদর্শন করা।

২৮. মুখে কিছু রেখে নামায পড়া যাতে কেরায়াত করতে অসুবিধা হয়। অসুবিধা না হলে মাকরুহ হবে না।

যে সব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয অথবা ওয়াজেব

১. নামায পড়তে পড়তে ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেনে মালপত্র আছে, বাচ্চা কাচ্চা আছে। এমন অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয।

২. নামায পড়ার সময়ে সাপ এলো অথবা কিছু বোলতা অথবা অন্য কোন অনিষ্টকর পোকামাকড় কাপড়ের মধ্যে ঢুকলো। এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে সে অনিষ্টকর প্রাণী মারা দুরস্ত হবে।

৩. মুরগী, কবুতর অথবা অন্য কোন গৃহপালিত পাখি ধরার জন্যে বিড়াল এলো এবং যদি আশংকা হয় যে, নামায ছেড়ে দিয়ে বিড়াল না তাড়ালে

পাখীটা খেয়ে ফেলবে, তাহলে এ আশংকায় নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে।

৪. যদি নামায শেষ করতে গেলে আর্থিক ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে নামায ছেড়ে দেয়া দুরস্ত হবে। যেমন কোন মেয়েলোক নামায পড়ছে। চুলার উপর পাতিল চড়ানো আছে পাতিলের জিনিস পুড়ে যেতে পারে অথবা উথলে পড়ে যেতে পারে, অথবা মসজিদে কেউ নামায পড়ছে এবং জুতা-ছাতা প্রভৃতি এমন স্থানে রাখা আছে যে, চুরি হওয়ার ভয় হচ্ছে, অথবা কোন মেয়েলোক ঘরেই নামায পড়ছে এবং ঘরের দরযা বন্ধ করতে ভুলে গেছে যার কারণে চুরি হওয়ার আশংকা আছে, অথবা বাড়ীর মধ্যে কুকুর, বিড়াল অথবা বানর ঢুকবে এবং আশংকা হচ্ছে যে তারা কিছু ক্ষতি করবে, মোট কথা যে সব অবস্থায় আর্থিক ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় সে সব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয। আর যদি অতি সামান্য ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে নামায পুরা করা ভালো।

৫. নামাযে পেশাব পায়খানার বেগ হলে নামায ছেড়ে দিয়ে পেশাব পায়খানা সেরে পুনরায় অযু করে নামায পড়া উচিত।

৬. কোন অন্ধ পথ চলছে। সামনে কুয়া আছে অথবা নদীর তীর, পড়ে গেলে ডুবে মরতে পারে। তাকে বাঁচাবার জন্যে নামায ছেড়ে দেয়া ফরয হবে। আল্লাহ্ না করুন, যদি সে মরে যায় তাহলে নামাযী গুনাহগার হবে।

৭. নামায পড়ার সময় কোন বাচ্চার গায়ে আগুন লাগলো অথবা কোন অবুঝ শিশু ছাদের কেনারায় পৌছলো, অথবা ঘরে বানর ঢুকলো এবং আশংকা হয় যে, সে দুধের শিশুকে ধরে নিয়ে যাবে, অথবা কোন ছোটো শিশু হাতে ছুরি বা ব্লেড তুলে নিয়েছে এবং আশংকা হয় যে, নিজের বা অপর কোন শিশুর হাত পা কেটে দেয় অথবা রেলগাড়ী বা মোটর গাড়ীতে কারো চাপা পড়ার আশংকা হয়, অথবা চোর, ডাকাত বা দুশমন কাউকে আহত করছে এ সকল অবস্থায় বিপদগ্রস্তকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্যে নামায ছেড়ে দেয়া ফরয হবে। না ছাড়লে শক্ত গুনাহগার হতে হবে।

৮. যদি মা, বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী কোন বিপদে পড়ে ডাক দেয় তাহলে তাদের সাহায্যের জন্যে নামায ছেড়ে দেয়া ফরয হবে। যদি তাদের

সাহায্যের জন্যে নিকটে আর কেউ থাকে অথবা বিনা প্রয়োজনে তারা ডাকছে তাহলে নামায ছেড়ে না দেয়া ভালো। যদি নফল অথবা সুন্নাত নামায পড়াকালে তারা বিনা প্রয়োজনে ডাকে এবং তাদের জানা নেই যে, যাকে ডাকছে সে নামায পড়ছে, তথাপি নামায ছেড়ে তাদের কথার জবাব দেয়া ওয়াজেব।

নামায পড়ার বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতি

যখন কেউ নামায পড়ার এরাদা করবে তখন তাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, নামাযের শর্তগুলোর মধ্যে কোনটা বাদ যায়নি তো। তারপর একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করে ধারণা করতে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর একনিষ্ঠ হয়ে পূর্ণ অনুভূতির সাথে নিম্নের দোয়া পড়ে নেবে।

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

আমি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আমার মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি আসমান ও যমীন পয়দা করেছেন এবং আমি তাদের মধ্যে নই যারা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। বস্তুত আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্যে যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক প্রভু। তাঁর কোন শরীক নেই আমার উপরে তাঁরই হুকুম হয়েছে এবং অনুগতদের মধ্যে আমিই সকলের প্রথম অনুগত। (আল–আনয়াম)

অতপর নামাযী সোজা দাঁড়িয়ে নামাযের নিয়ত করবে। অর্থাৎ মনে এ এরাদা করবে যে, সে অমুক ওয়াক্তের এতো রাক্য়াত নামায পড়ছে। নিয়ত আসলে মনের এরাদার নাম। আর এটারই প্রয়োজন। (তবে এ এরাদাকে শব্দের দ্বারা মুখে উচ্চারণ করা ভালো)। যেমন "আমি মাগরেবের তিন রাক্য়াত ফরয নামায পড়ছি।" আর যদি ইমামের পেছনে নামায পড়া হয় তাহলে এ নিয়তও করতে হবে যে, "এ ইমামের পেছনে নামায পড়ছি।"[১]

---

১. মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে নিয়ত করা তো ভালো। কিন্তু তার জন্যে এতটুকু বলাই যথেষ্ট "আমি অমুক ওয়াক্তের এত রাক্য়াত নামায পড়ছি।" যেমন "যোহরের চার রাক্য়াত ফরয পড়ছি" সুন্নাত অথবা নফল যদি হয় তাহলে বলবে, "যোহরের দু'রাক্য়াত সুন্নাত বা নফল পড়ছি।"। এছাড়া সাধারণত নিয়তের যে লম্বা লম্বা কথাগুলো বলা হয় তা

তাকবীর

দেহকে স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান। দু' পায়ের মাঝখানে অন্ততঃ চার আংগুল ফাঁক যেন অবশ্যই থাকে। দৃষ্টি সিজদার স্থানের উপর রাখুন এবং নিয়তের সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু' হাত কানের গোড়া পর্যন্ত উঠান, যেন হাতুলি কেবলার দিকে থাকে এবং আংগুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকে। তারপর দু'হাত নাভির নীচে এমনভাবে বাঁধুন যেন ডান হাতের হাতুলি বাম হাতের পিঠের উপর থাকে। ডান হাতের বুড়ো আংগুল ও ছোটো আংগুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরুন। ডান হাতের বাকী আংগুলগুলো বাম হাতের উপর ছড়িয়ে রাখুন।[১]

তারপর নিম্নের দোয়া বা সানা পড়ুন ঃ-

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ –

তুমি পাক ও পবিত্র, হে আল্লাহ্! তুমিই প্রশংসার উপযুক্ত। তুমি বরকতদানকারী এবং মহান। তোমার নাম ও মর্যাদা বহু উচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[২]

সানার পর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পুরা পড়ুন।

অনাবশ্যক। বরঞ্চ তাতে নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যেমন কেউ শুরু থেকেই ইমামের পেছনে রয়েছে। একামাত শেষ হতেই ইমাম তাকবীর তাহরীমা বলে নামায শুরু করলেন আর এ ব্যক্তি নিয়তের লম্বা চওড়া বাক্যগুলো বলতে থাকলো। ফলে সে ইমামের সাথে তাকবীরে উলাতে শরীক হওয়া থেকে বঞ্চিত হলো। অথবা মনে করুন, ইমাম রুকুতে রয়েছে, মুক্তাদী তাকবীর তাহরীমা বলে রুকুতে শরীক হতে পারতো, কিন্তু সে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে লম্বা লম্বা নিয়তই আওড়াচ্ছে। এ দিকে ইমাম রুকু থেকে উঠে পড়েছেন। মুক্তাদীর সে রাকয়াত আর পাওয়া হলো না। এ জন্যে এটাই মুনাসেব যে, নিয়তের সংক্ষিপ্ত জরুরী কথাগুলো বললেই যথেষ্ট হবে। অযথা অপ্রয়োজনীয় কথা বাড়াতে গিয়ে নিজেকে পেরেশান করা ঠিক নয়।

১. আহলে হাদীসের নিয়ম এই যে, নারী পুরুষ উভয়েই বুকের উপর হাত বাঁধবে। তাঁরা আরও বলেন, নারী-পুরুষ উভয়ই কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে।

২. আহলে হাদীসগণ নিম্নের দোয়া পড়েন।

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ – اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ

সূরা ফাতেহা ও কুরআন পাঠ

তারপর সূরায়ে ফাতেহা পড়ে আমীন বলুন। আর যদি আপনি মুক্তাদী হন তাহলে সানা পড়ার পর চুপচাপ ইমামের কেরায়াত শুনুন।[১] ইমাম সূরায়ে ফাতেহা শেষ করলে আস্তে আমীন বলুন।[২] তারপর কুরআনের কোন সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়ুন অন্তত ছোট ছোট তিনটি আয়াত। আপনি মুক্তাদী হলে চুপ থাকতে হবে।

রুকু

কেরায়াত করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে যান।[৩] রুকুতে হাত হাঁটুর উপর রেখে আঙ্গুল দিয়ে হাঁটু ধরুন। দু'হাত সটান সোজা রাখুন। রুকুর সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, মাথা যেন কোমর থেকে বেশী নীচে নেমে না যায় অথবা উঁচু না হয়। বরঞ্চ কোমর এবং মাথা একেবারে বরাবর থাকবে। তারপর তিনবার নিম্ন তাসবীহ পড়বেন।

রুকুর তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ সমস্ত দোষত্রুটি থেকে পাক আমার মহান প্রভূ।[৪]

এ তসবীহ (سبحان ربى العظيم) তিনবারের বেশী পাঁচ, সাত নয় অথবা আরও বেশী বার বলতে পারেন। যদি আপনি ইমাম হন তাহলে মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। এতো বেশী পড়বেন না যাতে তাঁরা পেরেশানী বোধ করেন। তবে যতোবারই পড়ুন বেজোড় পড়বেন।

الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ - اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ -

১. আহলে হাদীসগণ ইমামের পেছনে আস্তে আস্তে সূরা ফাতেহা পড়েন।

২. যেসব নামাযে কেরায়াত উচ্চস্বরে পড়া হয় তাতে আহলে হাদীস গণ ইমামের পেছনে উচ্চস্বরে আমীন বলেন।

৩. আহলে হাদীসগণ রুকুতে যাবার সময় রুকু থেকে উঠার সময় দু'রাকয়াত পরে তৃতীয় রাকয়াতের জন্যে উঠার সময় 'রফে' ইয়াদাইন' করেন অর্থাৎ কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠান।

৪. আহলে হাদীসগণ পড়েন سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ পাক ও মহান তুমি আয় আল্লাহ্! আমার প্রভু প্রশংসার অধিকারী। হে আমার প্রভূ আমাকে মাফ করে দাও।

কাওমা

কাওমা রুকুর পরে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন, যে তাঁর তারীফ করেছেন) বলে বিলকুল সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং বলুন رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের রব, সমস্ত প্রশংসা তোমারই)। যদি আপনি মুক্তাদি হন তাহলে দ্বিতীয়টি পড়বেন। আর ইমাম হলে প্রথমটি পড়বেন।[১]

সিজদা

তারপর তাকবীর বলে সিজদায় যান। সিজদা এভাবে করুন যেন প্রথমে দু'হাঁটু যমীনে রাখেন, তারপর দু'হাত, তারপর নাক এবং তারপর কপাল। চেহারা দু'হাতের মাঝখানে থাকবে। বুড়ো আংগুল কানের বরাবর থাকবে। হাতের আংগুল মেলানো থাকবে এবং সব কেবলামুখী থাকবে। দু'কনুই যমীন থেকে উপরে থাকবে এবং হাঁটুও রান থেকে আলাদা থাকবে এবং পেটও রান থেকে আলাদা থাকবে। কনুই যমীন থেকে এতটা উঁচুতে থাকবে যেন একটা ছোট ছাগল ছানা ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। দু'পা আংগুলের উপর ভর করে মাটিতে লেগে থাকবে এবং আংগুলগুলো কেবলামুখী থাকবে।

সিজদায় অন্ততপক্ষে তিনবার থেমে থেমে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়ুন।

জালসা

তারপর তাকবীর বলে প্রথমে কপাল তারপর হাত উঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসুন। বসার পদ্ধতি এই যে, ডান পা খাড়া থাকবে এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর দু' জানু হয়ে বসুন। তারপর দু'হাত দু'জানুর উপর এমনভাবে রাখুন যেন আংগুলগুলো হাটুর উপর থাকে।[২] তারপর তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যান।

---

১. এ অবস্থায় আহলে হাদীস বলেন–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

২. জালসায় পড়ার জন্যে দোয়া হাদীসে বর্ণিত আছে। আহলে হাদীস এ দোয়া পড়ার তাকীদ করেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ

হে আল্লাহ্! আমায় মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে সচ্ছলতা দান কর এবং আমাকে রুজি দান কর (আবু দাউদ)।

প্রথম সিজদার মতো এ সিজদা করুন। দু'সিজদা করার পর তাকবীর বলে দ্বিতীয় রাকয়াতের জন্যে দাঁড়ান।[১] তারপর বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা এবং কেরায়াত করে দ্বিতীয় রাকয়াত পুরা করুন।

কা'দা (قعده)

তারপর প্রথম রাকয়াতের মতো রুকু, কাওমা, সিজদা ও জালসা করুন এবং দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে কা'দায় বসে যান। কা'দায় বসার ঐ একই পদ্ধতি যা, জালসায় বসার বয়ান করা হয়েছে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে থেমে থেমে তাশাহ্হুদ পড়ুন।

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত এবাদত ও সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্যে। হে নবী (সঃ) আপনার উপর সালাম। তাঁর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক আপনার উপর। সালামতি (শান্তি) হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ ও রসূল।

লা ইলাহা বলবার সময় ডান হাতের বুড়ো আংগুল এবং মধ্যমা আংগুল দিয়ে চক্র বানিয়ে অন্যান্য আংগুলগুলো বন্ধ করে শাহাদাত আংগুল আসমানের দিকে তুলে ইশারা করুন এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় আংগুল নামিয়ে নিন। সালাম ফেরা পর্যন্ত আংগুলগুলো ঐভাবে রাখুন।

যদি চার রাকয়াতওয়ালা নামায হয় তাহলে তাশাহহুদ পড়ার পর তাকবীর বলে তৃতীয় রাকয়াতের জন্যে দাঁড়ান। তারপর ঐভাবে বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতেহা পড়ুন। যদি সুন্নাত বা নফল নামায হয় তাহলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকয়াতে সূরা ফাতেহার পর কোন সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়ুন।

---

১. আহলে হাদীসের মতে, প্রথম এবং তৃতীয় রাকয়াতের সিজদা করার পর একটু বসে তারপর দাঁড়ানো উচিত। সিজদা থেকে সরাসরি উঠা ঠিক নয়।

যদি ফরয নামায হয় তাহলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাক্‌য়াতে সূরা ফাতেহার পর কুরআনের কোন অংশ পড়বেন না। শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে রুকুতে চলে যান। চতুর্থ রাক্‌য়াতের উভয় সিজাদ করার পর 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ুন। তারপর নিম্ন দরুদ শরীফ পড়ুন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

হে আল্লাহ্‌! সালাম ও রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর যেমন তুমি রহমত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারের উপর। হে আল্লাহ্‌! বরকত নাযিল কর মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারের উপর।

দুরূদের পর দোয়া

দুরূদের পর নিম্নের দোয়া পড়ুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

আয় আল্লাহ্‌! আমি আমার উপরে বড় যুলুম করেছি এবং তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে গুনাহ মাফ করতে পারে। অতএব তুমি আমাকে তোমার খাস মাগফেরাত দান কর এবং আমার উপর রহম কর। অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।

অথবা নিম্নের দোয়া পড়ুন কিংবা উভয়টি পড়ুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ

مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

আয় আল্লাহ্! আমি তোমার পানাহ (আশ্রয়) চাই জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের আযাব থেকে, পানাহ চাই মাসীহে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে, পানাহ চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে। হে আল্লাহ্! আমি পানাহ চাই গুনাহ থেকে এবং প্রাণান্তকর ঋণ থেকে।

সালাম

এ দোয়া পড়ার পর নামায খতম করার জন্যে প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলুন 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলুন 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। এ কথাগুলো বলার সময় মনে করতে হবে যে, আপনার এ সালামতি ও রহমতের দোয়া নামাযে অংশগ্রহণকারী সকল নামাযীদের এবং ফেরেশতাদের জন্যে। নামায শেষ করে যে কোন জায়েয দোয়া করতে পারেন। নবী (সঃ) থেকে বহু দোয়া ও যিকির বর্ণিত আছে। এসব দোয়া ও যিকিরের অবশ্যই অভ্যাস করবেন। কিছু দোয়া নিম্নে দেয়া হলো–

নামাযের পরে দোয়া

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ

السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

আমি আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাই। হে আল্লাহ্! তুমিই শান্তির প্রতীক, শান্তিধারা তোমার থেকেই প্রবাহিত হয়। তুমি নেহায়েত মঙ্গল ও বরকত ওয়ালা, হে দয়া ও অনুগ্রহের মালিক –(মুসলিম)।

২. এক দিন নবী (সঃ) হযরত মাআয (রা)–এর হাত ধরে বলেন, মাআয! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তারপর বলেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি কোন নামাযের পর এ দোয়াটি যেন করতে ভুলো না। প্রত্যেক নামাযের পর অবশ্যই পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلٰى ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (رياض الصلحين)

আয় আল্লাহ! তুমি আমার মদদ কর যেন আমি তোমার শোকর আদায় করতে পারি এবং ভালভাবে তোমার বন্দেগী করতে পারি।

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيىءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعطَيتَ وَلاَ مُعطِيَ لِمَا مَنَعتَ وَلاَ يَنفَعُ ذَالجَدِّ مِنكَ الجَدُّ (بخارى - مسلم)

আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর শরীক নেই। কর্তৃত্ব প্রভূত্ব বাদশাহী একমাত্র তাঁরই এবং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের একমাত্র অধিকারী তিনি। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা দান কর তা কেউ ঠেকাতে পারে না। যা তুমি দাও না, তা আর কেউ দিতে পারে না। কোন মহান ব্যক্তির মহত্ব তোমার মুকাবিলায় কোনই কাজে আসে না-(বুখারী ও মুসলিম)

৪. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার এবং একবার

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْىءٍ قَدِيْرٌ -

আল্লাহ্ পাক ও পবিত্র, সব প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ্ সকলের বড়ো, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। বাদশাহী তাঁর এবং প্রশংসা বলতে একমাত্র তাঁরই। এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান-(সহীহ মুসলিম -আবু হুরায়রাহ হতে)।

নারীদের নামাযের পদ্ধতি

নামাযের অধিকাংশ আরকান আদায় করার পদ্ধতি নারীদের জন্যেও তাই যা পুরুষের জন্যে। তবে নারীদের নামাযে ছ'টি জিনিস আদায় করার ব্যাপারে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের বুনিয়াদী কারণ হলো এ ধারণা যে, নামাযের মধ্যে নারীদেরকে সতর এবং পর্দার বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যে ছ'টি জিনিস সমাধা করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা হলো-

১. তাকবীর তাহরীমায় হাত উঠানো

শীত হোক গ্রীষ্ম হোক সর্বদা নারীদের চাদর অথবা দোপাট্টা প্রভৃতির ভেতর থেকে তাকবীর তাহরীমার জন্যে হাত উঠাতে হবে। চাদর বা দোপাট্টার বাইরে হাত বের করা উচিত নয় এবং হাত শুধু কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। কান পর্যন্ত উঠাবে না।

২. হাত বাঁধা

মেয়েলোকদের হামেশা বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে। বুকের নীচে নাভীর উপর বাঁধা উচিত হবে না। ডান হাতের বুড়ো এবং ছোটো আঙুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরার পরিবর্তে শুধু ডান হাতের হাতুলি বাম হাতের হাতুলির পিঠের উপর রাখবে।

৩. রুকু

মেয়েদেরকে রুকুতে শুধু এতটুকু ঝুঁকে পড়তে হবে যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছে। হাঁটু আংগুল দিয়ে ধরার পরিবর্তে শুধু মেলানো আংগুলগুলো হাঁটুর উপর রাখবে। উপরন্তু দু'হাতের কনুই-দু'পার্শ্বের সাথে মিলিত থাকতে হবে।

৪. সিজদা

সিজদার মধ্যে মেয়েদের পেট উরুর সাথে এবং বাহু বগলের সাথে মিলিত রাখতে হবে। কনুই পর্যন্ত হাত মাটিতে রাখতে হবে এবং দু'পা খাড়া না রেখে বিছিয়ে রাখতে হবে।

৫. কা'দা এবং জালসা

কা'দা অথবা জালসায় দু'পা ডান দিকে করে বাম পার্শ্বের উপর এমনভাবে বসবে যেন ডানদিকের রান বাম দিকের রানের সাথে এবং ডান পায়ের মাংসপিন্ড বাম পায়ের উপর আসে।

৬. কেরায়াত

মেয়েদেরকে সর্বদা নিঃশব্দে কেরায়াত করতে হবে। কোন নামাযেই উচ্চ শব্দ করে কেরায়াত করার অনুমতি তাদের নেই।

বেতর নামাযের বিবরণ

বেতর নামায পড়ার নিয়ম

এশার নামাযের পর যে নামায পড়া হয় তাকে বেতর বলে। তাকে বেতর বলার কারণ এই যে, তার রাক্‌য়াতগুলো বেজোড়। বেতর নামায ওয়াজেব। নবী (সঃ) তার জন্যে বিশেষ তাকীদ করেছেন। তিনি বলেন–

যে ব্যক্তি বেতর পড়বে না আমাদের জামায়াতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।[১] বেতরের নামায মাগরেবের মত তিন রাক্‌য়াত।[২] অধিকাংশ সাহাবী ফকীহ তিন রাক্‌য়াত পড়তেন।

বেতর নামায পড়ার নিয়ম এই যে, ফরয নামাযের মতো দু'রাক্‌য়াত নামায পড়ুন। তারপর তৃতীয় রাক্‌য়াতে সূরা ফাতেহার পর কোন ছোটো সূরা অথবা কয়েক আয়াত পড়ুন। তারপর তাকবীর বলে দু'হাত কান পর্যন্ত এমনভাবে উঠান যেমন তাকবীর তাহরীমায় উঠান। তারপর হাত বেঁধে আস্তে আস্তে দোয়া কুনুত পড়ুন।[৩]

---

১. আবু দাউদ, হাকেম। এ তাকীদের কারণে ইমাম আবু হানীফা (র) একে ওয়াজেব বলেন। অবশ্য আহলে হাদীস, ইমাম শাফেয়ী এবং কাযী আবু ইউসুফের মতে বেতর নামায সুন্নাত।

২. ইমাম শাফেয়ী এবং আহলে হাদীস এক রাক্‌য়াত পড়ার পক্ষে। আহলে হাদীসের নিকটে তিন, পাঁচ, সাত এবং নয় রাক্‌য়াত পর্যন্ত পড়াও জায়েয। এ জন্যে যে, হাদীস থেকে তা প্রমাণিত আছে। পড়ার নিয়ম এই যে, যদি কেউ তিন বা পাঁচ রাক্‌য়াত এক সালামে পড়তে চায় তাহলে মাঝখানে তাশাহ্‌হুদের জন্যে না বসে শেষ রাক্‌য়াতে বসে তাশাহ্‌হুদ দরুদ পড়ে সালাম ফেরাবে। সাত অথবা নয় রাক্‌য়াত এক সালামে পড়তে হলে শেষ রাক্‌য়াতের আগে বসবে এবং শুধু 'আত্তাহিয়্যাত' পড়ে দাঁড়াবে তারপর এক রাক্‌য়াত পড়ে আত্তাহিয়্যাত, দুরুদ ও দোয়া পড়ে সালাম ফেরাবে।–[নামাযে মুহাম্মদী মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী (র)।]

৩. আহলে হাদীসের মতে রুকুর পর হাত বাঁধার পরিবর্তে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে দোয়া কুনুত পড়তে হবে।

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ - اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই সাহায্য প্রার্থী এবং তোমার কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার উপর আমরা ঈমান এনেছি এবং তোমারই উপর ভরসা করি, তোমার ভালো ভালো প্রশংসা করি তোমার শোকর আদায় করি, তোমার না শোকরি করি না (কৃতঘ্নতা করি না), যারা তোমার নাফরমানী করে তাদেরকে পরিত্যাগ করছি ও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আয় আল্লাহ্! আমরা তোমারই এবাদত করি, তোমারই জন্যে নামায পড়ি এবং তোমাকেই সিজদা করি, তোমার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই, তোমারই হুকুম মানার জন্যে প্রস্তুত থাকি, তোমার রহমাতের আশা রাখি, তোমার আযাবকে ডরাই। তোমার আযাব অবশ্যই কাফেরদেরকে পেয়ে বসবে।

যদি তার সাথে নিম্নের দোয়া পড়া হয় তো ভালো হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَاقَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ - اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ - تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ -

আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে হেদায়েত দান করে হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল কর। তুমি আমাকে সচ্ছলতা দান করে সচ্ছল ব্যক্তিদের

শামিল কর, তুমি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাদের মধ্যে শামিল কর যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার মধ্যে বরকত দাও, তুমি আমাকে ঐ অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর যার তুমি ফায়সালা করেছ। কারণ তুমিই ফায়সালাকারী এবং তোমার উপর অন্য কারো ফায়সালা কার্যকর হয় না। তুমি যার অভিভাবকত্ব কর তাকে কেহ হীন লাঞ্ছিত করতে পারেনা এবং সে কখনো সম্মান পেতে পারেনা যাকে তুমি তোমার দুশমন বানিয়েছ। তুমি খুবই বরকতওয়ালা, হে আমার রব, সুউচ্চ ও সুমহান, দুরুদ ও সালাম হোক পিয়ারা নবীর উপর, তাঁর বংশধরের উপর।

আহলে হাদীসের লোক বেতরে এ দোয়া পড়েন।

দোয়া কুনুত যদি মুখস্ত না থাকে, তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব মুখস্ত করতে হবে। যতদিন মুখস্ত না হবে ততদিন দোয়া কুনুতের স্থলে নিম্নের দোয়া পড়তে হবে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও এবং আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

যদি এটাও মনে না থাকে তাহলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى তিনবার পড়বেন।

বেতর নামাযের সালাম ফেরার পর এ দোয়া পড়া মুস্তাহাব سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ এ দোয়া তিনবার পড়তে গিয়ে তৃতীয়বার উচ্চ শব্দ করে পড়বেন رَبِّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوحِ

বেতর নামাযে সূরা ফাতেহার পর যে কোন সূরা পড়তে পারবেন। তবে প্রথম রাক্‌য়াতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং তৃতীয় রাক্‌য়াতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়া ভালো।

আবু উবাই বিন কা'ব বলেন, নবী (সা) বেতরে এ তিন সূরা পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ আমাকে মাফ কর। سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ অর্থ ঃ পবিত্র ও মহান প্রকৃত বাদশাহ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধে। رَبِّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوحِ অর্থঃ প্রভূ ফেরেশতাদের এবং জিবরাইল আমীনের -(আবু দাউদ, নাসায়ী)

কুনূতে নাযেলা

কুনূতে নাযেলা বলতে সেই দোয়া বুঝায় যা নবী পাক (সঃ) দুশমনদের ধ্বংসকারীতা থেকে রক্ষার জন্যে তাদের শক্তি চূর্ণ করে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে পড়েন।[১] তাঁর পরে সাহাবায়ে কেরাম (রা) তা পড়ার ব্যবস্থা করেছেন।[২]

আহলে ইসলাম যদি কোন সময়ে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়, দিন-রাতব্যাপী দুশমনের পক্ষ থেকে আসন্ন বিপদে এবং তাদের ভয় ও সন্ত্রাসে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, যদি চারদিকে দুশমনের শক্তিমত্তা দেখা যায় তারা যদি মিল্লাতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করার জন্যে এবং ইসলামের নূর নিভিয়ে দেয়ার জন্যে আহলে ইসলামের উপর অমানুষিক যুলুম করতে থাকে, এমন নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে দুশমনের শক্তি চূর্ণ করতে, তাদেরকে ধ্বংস করতে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করার জন্যে কুনূতে নাযেলা পড়া মাসনূন।

কুনূতে নাযেলার মাসয়ালা

১. উচ্চশব্দে পড়া সকল নামাযে কুনূতে নাযেলা পড়া জায়েয।[৩] বিশেষ করে ফজরের নামাযে পড়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

---

১. হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, নবী (সঃ) মুসলমান কয়েদীদের উদ্ধার এবং কাফেরদের ধ্বংসের জন্যে অনবরত একমাস পর্যন্ত এশার নামাযে এ কুনূত পড়তেন। আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, একদিন নবী (সঃ) এ দোয়া পড়লেন না। তখন আমি নবী (সঃ)কে না পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি কি দেখছ না যে, মুসলমান কয়েদীরা খালাস হয়ে এসেছে?-(আবু দাউদ)

২. হযরত আবু বকর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এ কুনূতে নাযেলা পড়েন। এমনি হযরত ওমর (রা), হযরত আলী (রা) এবং আমীর মুয়াবিয়া (রা) যুদ্ধের সময় কুনূতে নাযেলা পড়েন-(গনিয়াতুল মস্তামলী)।

৩. আল্লামা তাহাবী শুধু ফজর নামাযে কুনূতে নাযেলা পড়ার উল্লেখ করেছেন। শামী কেতাবের লেখক এ উক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. যদি মুক্তাদীদের দোয়া কুনুতে নাযেলা মনে থাকে, তাহলে ইমামও আস্তে আস্তে পড়বে এবং সকল মুক্তাদীও আস্তে আস্তে পড়বে। কিন্তু আজকাল যেহেতু সাধারণত মুক্তাদীদের দোয়া মনে থাকে না সে জন্যে উত্তম এই যে, ইমাম উচ্চশব্দে[১] থেমে থেমে পড়বে এবং মুক্তাদীগণ আমীন, আমীন বলতে থাকবে।

৩. শেষ রাক্‌য়াতে রুকু থেকে উঠার পর ইমাম এবং মুক্তাদী সকলে হাত বাঁধবে[২] ইমাম কুনুত পড়বে এবং মুক্তাদী আস্তে আস্তে আমীন বলবে। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফের নিকট হাত বেঁধে কুনূতে নাযেলা পড়া মসনূন।

৪. একাকী নামায পাঠকারীও কুনুত পড়তে পারে। নারীগণও তাদের নামাযে পড়তে পারে।

কুনুতে নাযেলার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَاقَضَيْتَ - اِنَّكَ

আয়নী, শরহে হেদায়া উচ্চশব্দে পড়া সকল নামাযে পড়ার বিশ্লেষণ করেছেন। আয়নী শরহে হেদায়ার শব্দগুলো হচ্ছে

ان نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام فى صلوة الجهر وبه قال الاكثرون واحمد -

যদি মুসলমানদের উপর কখনো বিপদ এসে পড়ে, তাহলে ইমাম উচ্চশব্দে পড়া নামাযগুলোতে কুনুত পড়বে। অধিকাংশ ওলামা এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলেরও এই মত। দেখুন কুনুতে নাযেলা এবং তৎসংশ্লিষ্ট মাসায়ালাসমূহ মুফতী মুহাম্মদ কেফায়েতুল্লাহ মরহুম।

১. আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, নবী (সঃ) কুনুতে নাযেলা উচ্চস্বরে পড়তেন (বুখারী)।

২. যদি কেউ হাত বাঁধার পরিবর্তে হাত তুলে দোয়া করে অথবা হাত ছেড়ে দিয়ে পড়ে যেমন ইমাম মুহাম্মদের উক্তি রয়েছে তা হলে হাদীসের আলোকে তা করার অবকাশ আছে। এই জন্যে যে, এসব বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়া ফাসাদ করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَات وَاَلِّفْ بَيْن قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْنَا عَلٰى عَدُوِّك وَعَدُوِّهِمْ-اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِك وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لاَتَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْن-

হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে হেদায়েত দান করে তাদের মধ্যে শামিল কর যাদেরকে তুমি হেদায়েত দান করেছ। তুমি আমাদের সচ্ছলতা দান করে তাদের মধ্যে শামিল কর যাদেরকে তুমি সচ্ছলতা দান করেছ। আমাদের অভিভাবকত্ব করে তাদের মধ্যে শামিল কর যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ। তুমি আমাদেরকে যা দান করেছ তাতে বরকত দাও। আমাদেরকে তুমি সেই অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর যার ফায়সালা তুমি করেছ–কারণ ফায়সালা তুমিই করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা কার্যকর হয় না। তুমি যার অভিভাবকত্ব কর সে কখনো হীন লাঞ্ছিত হতে পারে না। তুমি যাকে দুশমন বলে আখ্যায়িত কর সে কখনো সম্মান পেতে পারে না। তুমি বড়ো বরকতওয়ালা। হে আমাদের রব! সুউচ্চ ও সুমহান, আমরা তোমার কাছে মাগফেরাত চাচ্ছি তোমার কাছে তওবা করছি। আল্লাহর রহমত হোক নবী (সঃ)-এর উপর।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মাফ কর। মুমেন নারী-পুরুষ এবং মুসলিম নারী-পুরুষকে মাফ কর, তাদের অন্তরকে পরস্পর মিলিত করে দাও, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে দাও, তোমার এবং তাদের দুশমনের মুকাবিলায় আমাদের মদদ কর।

আয় আল্লাহ্! তুমি ঐ সব কাফেরদের উপর লানত কর যারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিভ্রান্ত করে সরিয়ে দেয়, যারা তোমার রসূলগণকে মিথ্যা মনে করে, যারা তোমার প্রিয় লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আয় আল্লাহ্ তুমি তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য সৃষ্টি করে দাও, তাদেরকে ভীত প্রকম্পিত করে দাও এবং তাদের উপর তোমার এমন আযাব নাযিল কর যা তুমি তোমার পাপীদের জন্যে রহিত কর না।

নফল নামাযের বিবরণ

পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের সাথে নবী (সঃ) যেসব নফলের আমল করেছেন, উপরে পাঞ্জেগানা নামায প্রসংগে তার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ছাড়াও নবী পাক (সঃ) বিভিন্ন সময়ে বহু নফল নামায পড়তেন। হাদীসগুলোতে এসব নামাযের অনেক ফযিলত বয়ান করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বেশী বেশী নফল এবাদতের মাধ্যমেই বান্দাহ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে এবং বিরাট মর্যাদার অধিকারী হয়। মাকরুহ সময়গুলো ছাড়া যখনই কেউ নফল নামায পড়তে চায় এবং যত বেশী পড়তে চায় তা পড়লে তার জন্যে মঙ্গল ও বরকতেরই কারণ হয়। অবশ্যি কিছু বিশিষ্ট নফল নামায নবী (সঃ) বিশেষ বিশেষ সময়ে পড়েছেন এবং সে সবের আলাদা ফযিলতও বয়ান করেছেন। নিম্নে সে সব বিশিষ্ট নফল নামাযের উল্লেখ করা হচ্ছে।

তাহাজ্জুদের নামায

তাহাজ্জুদ নামায সুন্নাত। নবী (সঃ) হরহামেশা এ নামায নিয়মিতভাবে পড়তেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা)কে তা নিয়মিত আদায় করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতেন। কুরআন পাকে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যে বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে। যেহেতু উম্মতকে নবীর পায়রবি করার হুকুম করা হয়েছে সে জন্যে তাহাজ্জুদের এ তাকীদ পরোক্ষভাবে গোটা উম্মতের জন্যে করা হয়েছে।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (بنى اسرائيل ٧٩)

এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়তে থাক। এ তোমার জন্যে আল্লাহ্‌র অতিরিক্ত ফযল ও করম। শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাকে উভয় জগতে বাঞ্ছিত মর্যাদায় ভূষিত করবেন−(বনি ইসরাইল ঃ ৭৯)।

যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদের আমল করে কুরআন তাদেরকে মুহসেন এবং মুত্তাকী নামে অভিহিত করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত এবং আখেরাতে চিরন্তন সুখ সম্পদের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ‎ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ
كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ‎ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ
وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ - (الذاريات ١٥-١٨)

নিশ্চয়ই মুত্তাকী লোক বাগ-বাগিচায় এবং ঝর্ণার আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে এবং যে যে নিয়ামত তাদের প্রভু পরোয়ারদেগার তাদেরকে দিতে থাকবেন সেগুলো তারা গ্রহণ করবে। (কারণ) নিসন্দেহে তারা এর পূর্বে (দুনিয়ার জীবনে) মুহসেনীন (বড় নেক্কার) ছিল। তারা রাতের খুব অল্প অংশেই ঘুমাতো এবং শেষ রাতে ইস্তেগফার করতো। (কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র মাগফেরাত চাইতো।)

(যারিয়াত : ১৫-১৮)।

প্রকৃতপক্ষে তাহাজ্জুদ নামায মন ও চরিত্রকে নির্মল ও পবিত্র করার এবং সত্য পথে অবিচল থাকার জন্যে অপরিহার্য ও কার্যকর পন্থা।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً - (المزمل : ٦)

বস্তুতঃ রাতে ঘুম থেকে উঠা মনকে দমিত করার জন্যে খুব বেশী কার্যকর এবং সে সময়ের কুরআন পাঠ বা যিকির একেবারে যথার্থ।

(মুয্যাম্মিল-৬)।

এসব বান্দাহদেরকে আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় বান্দাহ বলেছেন এবং নেকী ও ঈমানদারীর সাক্ষ্য দিয়েছেন (সুবহানাল্লাহ)।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ ... وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

আল্লাহ্‌র পিয়ারা বান্দাহ তারা........যারা তাদের পরোয়ারদেগারের দরবারে সিজদা করে এবং দাঁড়িয়ে থেকেই রাত কাটিয়ে দেয়।

-(ফুরকান : ৬৩-৬৪)।

মুমেনদের এ বিশিষ্ট গুণ তাদেরকে কুফরের প্রবল আক্রমণের মুকাবিলায় অটল রাখতো এবং বিজয় মালায় ভূষিত করতো। বদরের ময়দানে হকের আওয়ায বুলন্দকারী নিরস্ত্র মুজাহিদগণের অতুলনীয় বিজয়ের বুনিয়াদী কারণগুলোর মধ্যে এটিও ছিল একটি যে, তাঁরা রাতের শেষ সময়ে আল্লাহ্‌র সামনে চোখের পানি ফেলে কাঁদতেন এবং গুনাহ মাফ চাইতেন।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ (ال عمران ١٧)

এসব লোক অগ্নি পরীক্ষায় অচল অটল, সত্যের অনুসারী, পরম অনুগত, আল্লাহ্র পথে মাল উৎসর্গকারী এবং রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ্র কাছে ভুলত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থী-(আলে-ইমরান ঃ ১৭)।

স্বয়ং নবী করীম (সঃ) তাহাজ্জুদের ফযিলত সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন্ সালাম (রা) বলেন, নবী (সঃ) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন তখন প্রথম যে কথাগুলো তাঁর পাক যবান থেকে শুনি তা হলো ঃ

"হে লোকগণ। ইসলামের প্রচার ও প্রসার কর, মানুষকে আহার দান কর, আত্মীয়তা অটুট রাখ, আর যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে তখন তোমরা রাতে নামায পড়তে থাকবে। তাহলে তোমরা নিরাপদে বেহেশতে যাবে- (হাকেম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)।"

হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন-

"তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থাপনা কর, এ হচ্ছে নেক লোকের স্বভাব এ তোমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট করে দেবে, গুনাহগুলো মিটিয়ে দেবে, গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং শরীর থেকে রোগ দূর করবে।"

আর এক সময় তিনি বলেন-

ফরয নামাযগুলোর পরে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নামায হলো রাতে পড়া তাহাজ্জুদ নামায-(সহীহ মুসলিম-আহমদ)।

নবী (সঃ) আরও বলেন-

রাতের শেষ সময়ে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার দিকে নাযিল হন এবং বলেন, "ডাকার জন্যে কেউ আছে কি যার ডাক আমি শুনব, চাওয়ার জন্যে কেউ আছে কি যাকে আমি দেব, গুনাহ মাফ চাওয়ার কেউ আছে কি যার গুনাহ আমি মাফ করব?" (সহীহ বুখারী)।

তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত

তাহাজ্জুদের অর্থ হলো ঘুম থেকে উঠা। কুরআনে রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের যে তাকীদ করা হয়েছে তার মর্ম এই যে, রাতের কিছু অংশ

ঘুমিয়ে থাকার পর উঠে নামায পড়া। তাহাজ্জুদের মসনূন সময় এই যে এশার নামায পর লোক ঘুমাবে। তারপর অর্ধেক রাতের পর উঠে নামায পড়বে।

নবী (সঃ) কখনো মধ্য রাতে, কখনো তার কিছু আগে অথবা পরে ঘুম থেকে উঠতেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে-ইমরানের শেষ রুকুর কয়েক আয়াত পড়তেন। তারপর মেসওয়াক ও অযু করে নামায পড়তেন। ঘুম থেকে উঠার পর তিনি নিম্ন আয়াতগুলো পড়তেন-

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۝ اَلَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَیْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُّنَادِیْ لِلْاِیْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا - رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ۝ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِیْعَادَ (اٰل عمران ١٩٠ - ١٩٤)

বস্তুত আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে ঐসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যে যারা দাঁড়ানো, বসে থাকা এবং শুয়ে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি নৈপূণ্যের উপর চিন্তা গবেষণা করে। অতপর তারা আপনা-আপনি বলতে থাকে, হে আমাদের রব। এসব কিছু তুমি অযথা পয়দা করনি। বেহদা কাজ থেকে তুমি পাক, পবিত্র ও মহান। অতএব হে আমাদের রব, আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ কর তাকে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লাঞ্ছনার মধ্যেই ফেল। তারপর এসব যালেমদের আর কোন সাহায্যকারী থাকবে না। হে প্রভু! আমরা একজন আহবানকারীকে শুনলাম, যে ঈমানের দিকে আহবান করে নিজেদে:

রবকে মেনে নিতে বলে। আমরা তার দাওয়াত কবুল করলাম। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও। আমাদের মধ্যে যেসব মন্দ কাজ আছে তা তুমি দূর করে দাও এবং আমাদের শেষ পরিণতি নেক লোকদের সাথে কর। হে আল্লাহ্! তুমি যেসব ওয়াদা তোমার রসূলদের মাধ্যমে করেছ, তা পূরণ কর এবং কিয়ামতের দিনে লাঞ্ছণায় ফেলো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদার বরখেলাপ কর না।(আল-ইমরান)

তাহাজ্জুদের রাক্‌য়াতসমূহ

তাহাজ্জুদের রাক্‌য়াত সংখ্যা অন্তত পক্ষে দুই এবং উর্ধতম সংখ্যা আট। নবী পাক (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল দুই দুই করে আট রাক্‌য়াত পড়া। সে জন্যে আট রাক্‌য়াত পড়াই ভালো। তবে তা জরুরী নয়। অবস্থা ও সুযোগের প্রেক্ষিতে যতটা পড়া সম্ভব তাই পড়লেই চলবে।

তারাবীহর নামায

তারাবীহর নামায নারী পুরুষ উভয়ের জন্যে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। পুরুষের জন্যে তারাবীহ জামায়াত করে পড়া সুন্নাত। তারাবীহ বিশ রাক্‌য়াত।[1]

হযরত ওমর (রা) বিশ রাক্‌য়াত তারাবীহ নামায পড়ার ব্যবস্থা করেন। এবং পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীনও বিশ রাক্‌য়াত পড়েন।

তারাবীহ পড়ার পদ্ধতি এই যে, দু'রাক্‌য়াত তারাবীহ সুন্নাতের নিয়ত করে এইভাবে পড়ুন যেমন অন্যান্য সুন্নাত ও নফল পড়েন। প্রত্যেক চার রাক্‌য়াত পর এতটুকু সময় বসুন যে সময়ে চার রাক্‌য়াত পড়া যায়। বসাকালে কিছু তসবীহ ও যিকির করা ভালো। চুপচাপ করে বসাও যায়।

তারাবীর ওয়াক্ত এশার নামাযের পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত।

হাদীসগুলোতে তারাবীহ নামাযের অনেক ফযিলত বয়ান করা হয়েছে। নবী পাক (সঃ) এরশাদ করেন -

"যে ব্যক্তি ঈমানের অনুভূতিসহ আখেরাতের প্রতিদানের উদ্দেশ্যে রমযানের রাতগুলোতে তারাবীহ পড়বে আল্লাহ্ তায়ালা তার কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন"-(বুখারী, মুসলিম)।

তারাবীহ নামাযের বিস্তারিত বিবরণ রোযার অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

---

১. আহলে হাদীসের নিকটে তারাবীহ আট রাক্‌য়াত।

চাশতের নামায

চাশতের নামায মুস্তাহাব। যখন সূর্য ভালোভাবে বেরিয়ে আসবে এবং আলো ছড়িয়ে পড়বে তখন চাশতের ওয়াক্ত শুরু হয়। এবং বেলা গড়ার আগে পর্যন্ত থাকে। এ সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে চার রাক্‌য়াত অথবা তার বেশী নফল নামায আদায় করতে পারে। নবী (সঃ) চার রাক্‌য়াতও পড়েছেন আবার চারের বেশীও পড়েছেন। চাশত নামাযের নিয়ত এভাবে করবেন–

নবীর সুন্নাত চার রাক্‌য়াত চাশ্‌ত নামাযের নিয়ত করছি।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ

তাহিয়্যাতুল মসজিদের অর্থ হলো এমন নামায যা মসজিদে প্রবেশকারীদের জন্যে পড়া মসনূন। নবীর (সঃ) এরশাদ হচ্ছে–তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মসজিদে যায়, এ দু'রাক্‌য়াত পড়ার আগে বসবে না।

–(বুখারী, মুসলিম)।

মসজিদ যেহেতু আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে তৈরী করা হয়, এ জন্যে তার সম্মানের জন্যে প্রবেশ করার পরই আল্লাহ্‌র দরবারে মানুষের সিজদারত হওয়া উচিত। যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করার পর ফরয নামায অথবা কোন ওয়াজেব, সুন্নাত ইত্যাদি পড়ে তাহলে–তাই তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হবে। তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক্‌য়াতও পড়া যায় অথবা তার বেশী।

তাহিয়্যাতুল অযু

অযু শেষ করার পর অযুর পানি শুকাবার আগে দু'রাক্‌য়াত নামায পড়া মুস্তাহাব। তাকে তাহিয়্যাতুল অযু বলে। চার রাক্‌য়াত পড়লেও দোষ নেই। তাহিয়্যাতুল অযুরও ফযিলত হাদীসে বয়ান করা হয়েছে। নবী (সঃ) বলেন–

"যে ব্যক্তি ভালোভাবে অযু করে দু'রাক্‌য়াত নামায পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পড়বে তার জন্যে বেহেশত ওয়াজেব হয়ে যায়"–(সহীহ মুসলিম)।

গোসলের পরেও এ দু'রাক্‌য়াত পড়া মুস্তাহাব এ জন্যে যে, গোসলের সাথে অযুও হয়ে যায়।

সফরে নফল

সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে দু'রাক্‌য়াত নামায পড়া মুস্তাহাব এবং সফর থেকে বাড়ী ফেরার পর দু'রাক্‌য়াত নামায মসজিদে আদায় করে বাড়ীতে প্রবেশ করা উচিত। নবী (সঃ) যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন। প্রথমে মসজিদে পৌছে দু'রাক্‌য়াত নামায পড়তেন (সহীহ মুসলিম)। তিনি বলেন, সফরের সময় যে দু'রাক্‌য়াত নামায ঘরে পড়া হয়, তার চেয়ে কোন ভাল জিনিস লোক ঘরে ফেলে যায় না-(তাবারানী)।

সফরকালে যদি কেউ কোথাও অবস্থান করতে চায় তাহলে সেখানে প্রথম দু'রাক্‌য়াত নামায আদায় করা মুস্তাহাব হবে (শামী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

সালাতুল আওয়াবীন

সালাতুল আওয়াবীন মাগরেব বাদ পড়া হয়। নবী (সঃ) তার বিরাট ফযিলত বয়ান করেছেন এবং পড়ার জন্যে প্রেরণা দিয়েছেন। আওয়াবীন মাগরেব বাদ দু'রাক্‌য়াত করে ছ' রাক্‌য়াত পড়তে হয়। এ নামায মুস্তাহাব।

সালাতুত তাসবীহ

এ নামাযকে সালাতুত তাসবীহ এ জন্যে বলা হয় যে, এর প্রত্যেক রাক্‌য়াতে পঁচাত্তর বার এ তাসবীহ পড়া হয়-

سُبْحَٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-

সালাতুত্ তাসবীহ মুস্তাহাব। হাদীসে তার অনেক সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। নবী (সঃ) চার রাক্‌য়াত এ নামায পড়েছেন। এ জন্যে একই সালামে চার রাক্‌য়াত পড়া ভালো। তবে দু'রাক্‌য়াত পড়লেও দুরস্ত হবে।

সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম এই যে, চার রাক্‌য়াত সালাতুত তাসবীহর নিয়ত করে হাত বাঁধুন। তারপর সানা পড়ার পর ১৫ বার এ তাসবীহ পড়বেন।

তারপর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ুন এবং কুরআনের কিছু অংশ। তারপর দশবার তাসবীহ পড়ুন।

রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহর পর এ তাসবীহ দশবার, রুকু থেকে উঠে কাওমার সময় এ তাসবীহ দশবার, সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লার' পর

দশবার, সিজদা থেকে উঠে জালসায় দশবার। দ্বিতীয় সিজদায় ঐভাবে দশবার পড়ুন।

অতপর দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে ঐভাবে সানার পর ১৫ বার, কেরায়াতের পর ১০ বার, রুকুতে ১০ বার, রুকু থেকে উঠে দশবার, দু' সিজদায় দশ-দশবার দু'সিজদার মাঝে ১০ বার পড়ুন।

অতপর ঠিক এমনি তৃতীয় ও চতুর্থ রাক্‌য়াত পড়ুন। অর্থাৎ প্রত্যেক রাক্‌য়াতে ৭৫ বার এবং মোট ৩০০ বার তাসবীহ্ পড়ুন। তাসবীহ্ গণনার হিসাব রাখার জন্যে আংগুলের আঁকে গুণবেন না। বরঞ্চ আংগুলের উপর চাপ দিয়ে সংখ্যা হিসাব করুন। কোনখানে তাসবীহ্ পড়তে ভুলে গেলে অন্য স্থানে তা পূরণ করুন। যেমন ধরুন, জালসায় তাসবীহ্ ভুলে গেলে সিজদায় গিয়ে পূরণ করুন। সিজদায় তাসবীহ পড়তে ভুলে গেলে জালসায় তা পূরণ করবেন না। এ জন্যে যে সিজদা থেকে জালসা দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়। সে জন্যে অন্য সিজদায় তা পূরণ করবেন।

সালাতে তওবা

প্রত্যেক মানুষ ভুল করে, গুনাহ করে। যখন কোন গুনাহের কাজ হয়ে যায়, তখন লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদে কেটে গুনাহ মাফের জন্যে দু'রাক্‌য়াত পড়া মুস্তাহাব।

হযরত আবু বকর (রা) বলেন, নবী পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন-

কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে কোন গুনাহ হয়ে গেলে তার উচিত পাক সাফ হয়ে দু'রাক্‌য়াত নফল নামায পড়া এবং আল্লাহ্‌র কাছে গুনাহ মাফ চাওয়া। তাহলে আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (ال عمران ١٣٥)

এবং তাদের অবস্থা এই যে, যদি কখনও তাদের দ্বারা কোন অশ্লীল কাজ হয়ে যায় অথবা তারা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে, তাহলে

তৎক্ষণাৎ তাদের আল্লাহ্‌র ইয়াদ হয় এবং তাঁর কাছে তারা গুনাহ মাফ চায়। কারণ আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে যে গুনাহ মাফ করতে পারে? এবং তারা তাদের কৃত অপরাধের জন্যে জ্ঞাতসারে জিদ ধরে না। (আলে-ইমরান ১৩৫)

সালাতে কসূফ ও খসূফ[১]

কসূফ এবং খসূফের সময় দু'রাক্‌য়াত করে নামায পড়া সুন্নাত। তবে তার জন্যে আযান একামাতের প্রয়োজন নেই। মানুষ জমায়েত করতে হলে অন্যভাবে করবে।

নামাযে সূরা বাকারাহ অথবা আলে-ইমরানের মতো লম্বা লম্বা সূরা পড়া এবং লম্বা লম্বা রুকু সিজদা করা সুন্নাত।[২] নামাযের পর ইমাম দোয়ায় মশগুল হবেন। এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলতে থাকবেন। তারপর গ্রহণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে দোয়াও শেষ হবে। তবে গ্রহণ শেষ হবার আগে যদি কোন নামাযের ওয়াক্ত এসে যায় তাহলে দোয়া করা ছেড়ে দিয়ে সে ওয়াক্তের নামায পড়তে হবে।

খসূফে জামায়াত সুন্নাত নয়। প্রত্যেকে একাকী দু'রাক্‌য়াত নামায পড়বে।

নবী (সঃ) এরশাদ করেন–

সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ্‌র দুটি নিদর্শন। কারো জন্ম অথবা মৃত্যুতে তাদের গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা দেখবে যে, সূর্য বা চন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক, তার কাছে দোয়া কর এবং নামায পড় যতোক্ষণ না গ্রহণ ছেড়ে গিয়ে সূর্য বা চন্দ্র পরিষ্কার হয়।[৩]

যেসব সময়ে নামায নিষিদ্ধ, যেমন সূর্য উঠার সময়ে, ডুবার সময় এবং দুপুর বেলা, তখন যদি সূর্য গ্রহণ হয় তাহলে নামায পড়া হবে না। তবে এসব নিষিদ্ধ সময় অতীত হওয়ার পরও যদি গ্রহণ থাকে তাহলে নামায পড়া যেতে পারে।

কসূফের নামাযে জোরে জোরে কেরায়াত পড়া সুন্নাত। এমনিভাবে ভয়-ভীতির সময়ে, বিপদ-মুসিবত দুঃখ কষ্টের সময়ে নফল নামায পড়া সুন্নাত।

---

১. সূর্য গ্রহণকে কসূফ এবং চন্দ্র গ্রহণকে খসূফ বলে।

২. প্রথম রাক্‌য়াতে সূরা আনকাবুত এবং দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে সূরা রুম পড়া ভালো। তবে তা পড়া জরুরী নয়।

৩. বুখারী, মুসলিম।

যেমন ধরুন ভয়ানক ঝড়-তুফান এলো, অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকলো, ভূমিকম্প এলো, আকাশ থেকে বিদ্যুত পড়া শুরু হলো, মহামারী শুরু হলো, দুশমনের ভয় হলো, বিশৃংখলা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হলো-মোট কথা সকল বিপদের সময়ে নামায পড়া সুন্নাত। এ নামায নিজ নিজ সুবিধা মতো একাকী পড়া উচিত।

সালাতে হাজাত

যখন বান্দাহ কোন বিশেষ প্রয়োজনের সম্মুখীন হবে তা সে প্রয়োজনের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে হোক যেমন পরীক্ষায় পাস করা কাম্য অথবা কোন বাড়ী বা দোকানের প্রয়োজন অথবা সে প্রয়োজনের সম্পর্ক অন্য কোন মানুষের সাথে হোক, যেমন কোন ইসলাম প্রিয় মেয়ের বিবাহ কাম্য, অথবা কারো অধীনে কোন চাকরির প্রয়োজন তখন তার জন্যে মুস্তাহাব এই যে, সে সালাতুল হাজাতের নিয়তে দুরাক্‌য়াত নামায আদায় করবে। তারপর নিম্নের দোয়া পড়বে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ - لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ -

আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বড়ো ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষাকারী ও বড়োই করুণাশীল। তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পাক, বিরাট আরশের মালিক, প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র যিনি বিশ্ব জগতের মালিক-প্রতিপালক। হে আল্লাহ্‌, আমি তোমার কাছে ঐসব জিনিস ভিক্ষা চাচ্ছি যার জন্যে তোমার রহমত অপরিহার্য এবং যা তোমার বখশিশ ও মাগফিরাতের কারণ হয়। আমি প্রত্যেক মংগলের অংশীদার হওয়ার কামনা করি এবং প্রত্যেক পাপ থেকে নিরাপদ থাকার ইচ্ছা পোষণ করি। (আয় আল্লাহ্‌) তুমি আমার গুনাহ মাফ করা ব্যতীত এবং আমার দুঃখ দৈন্য দূর করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইও না এবং আমার যেসব প্রয়োজন

তোমার পসন্দনীয় তা পূরণ না করে ছেড়ো না– হে অনুগ্রহকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অনুগ্রহকারী।

এ দোয়ার পর যা চাওয়ার তা চাইবেন। এ নামায প্রয়োজন পূরণের জন্যে পরীক্ষিত।

একবার এক অন্ধ নবী (সঃ)–এর খেদমতে হাযির হলো। সে আরয করে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার দৃষ্টিশক্তির জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। নবী (সঃ) বললেন, তুমি ধৈর্য ধারণ করলে অনেক অনেক প্রতিদান পাবে। আর যদি বল তো দোয়া করি।

সে দোয়া করার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী (সঃ) তাকে এ নামায শিক্ষা দেন–(ইলমুল ফেকাহ, ২য় খণ্ড)।

এস্তেখারার নামায

এস্তেখারা শব্দের অর্থ মঙ্গল কামনা করা। যদি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেমন কোন বিয়ের ব্যাপারে পয়গাম এসেছে। এখন তা কবুল করা হবে, না প্রত্যাখ্যান করা হবে, যেমন কোন সফরে যাওয়ার ব্যাপারে যাওয়া না যাওয়ার প্রশ্ন জাগলো, কোন কারবার শুরু করার ব্যাপারে, অন্য কারো সাথে কোন ব্যাপারে জড়িত হওয়া সম্পর্কে, কোন দোকান, বাড়ী বা জমি কেনা বেচার ব্যাপারে, অথবা কোন চাকরি করা বা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে, অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে এসব ব্যাপারে মনস্থির করার জন্যে দু'রাকয়াত নফল নামায এবং এস্তেখারায় মসনূন দোয়া পড়া মুস্তাহাব। এস্তেখারার পর যেদিকে মনের ঝোঁক প্রবণতা অনুভব করা যাবে তা অবলম্বন করলে আল্লাহ্র ফযলে সাফল্য লাভ করা যাবে।

নবী (সঃ) বলেন, এস্তেখারাকারী কখনো ব্যর্থকাম হয় না, পরামর্শকারী কখনো অনুতপ্ত হয় না এবং মিতব্যায়ী কখনো অপরের মুখাপেক্ষী হয় না–(তাবারানী)।

হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে এস্তেখারা করা আদম সন্তানদের সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ্র মর্জির উপর রাজী থাকাও আদম সন্তানদের জন্যে সৌভাগ্য। আদম সন্তানদের দুর্ভাগ্য এই যে, তারা আল্লাহ্র কাছে এস্তেখারা করে না এবং আল্লাহ্র ফায়সালার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করে–(মুসনাদে আহমদ)।

এস্তেখারা করার নিয়ম পদ্ধতি

এস্তেখারা করার নিয়ম এই যে, নিষিদ্ধ সময়গুলো ব্যতীত সুযোগমত যে কোন সময়ে সাধারণ নফল নামাযের মতো দু'রাক্‌য়াত এস্তেখারার নামায পড়ুন। তারপর আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা এবং দুরুদ শরীফ পড়ুন। তারপর নবীর শেখানো এস্তেখারার দোয়া পড়ে কেবলামুখী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। এমনি সাত বার করা ভাল। তারপর মনের ঝোঁকপ্রবণতা যেদিকে বুঝা যাবে তা আল্লাহ্‌র মর্জি মনে করে অবলম্বন করুন।

কোন কারণে যদি নামাযের সুযোগ না হয়, যেমন, কোন মেয়েলোক হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় আছে, তাহলে শুধু দোয়া পড়াই যথেষ্ট হবে। তারপর মন যেদিকেই যায় তদনুযায়ী কাজ করা উচিত।

এস্তেখারার দোয়া

হযরত জাবের (রা) বলেন, নবী (সঃ) যেভাবে আমাদেরকে কুরআন পাক শিক্ষা দিতেন, তেমনভাবে এস্তেখারার দোয়াও শিক্ষা দিতেন।

তিনি বলতেন–

তোমাদের কেউ যদি কোন সময়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড় তাহলে দু'রাক্‌য়াত নফল নামায পড়ে এ দোয়া কর–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَاۤ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَاۤ اَعْلَمُ
وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ –

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعِيْشَتِىْ
وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ – وَاِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعِيْشَتِىْ وَعَاقِبَةِ
اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ
ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ –

আয় আল্লাহ্। আমি তোমার এলেমের ভিত্তিতে তোমার নিকটে মংগল কামনা করছি এবং তোমার কুদরতের দ্বারা তোমার বিরাট ফযল ও করম ভিক্ষা চাচ্ছি। কারণ তুমি কুদরতের মালিক এবং আমি শক্তিহীন। তুমি সব জান, আমি জানি না এবং তুমি গায়েবের কথাও ভালভাবে জান।

আয় আল্লাহ্। তোমার জ্ঞান মতে এ কাজ যদি আমার জন্যে, আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে এবং শেষ পরিণামের দিক দিয়ে মংগলকর হয়, তাহলে তা আমার ভাগ্যে লিখে দাও। আমার জন্যে তা সহজ করে দাও এবং তা আমার জন্যে বরকতপূর্ণ করে দাও। আর যদি এ কাজ আমার জন্যে, আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে এবং পরিণামের দিক দিয়ে অমংগলকর হয় তাহলে তা আমা থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তার থেকে বাঁচাও এবং আমার ভাগ্যে মংগল লিখে দাও যেখানেই তা হোক এবং তারপর তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট এবং অবিচল থাকার তওফীক দাও।

মসজিদের বিবরণ

মদীনা শরীফে হিজরত করার পর নবী পাক (সঃ)–এর সবচেয়ে বড়ো চিন্তা এই হলো যে, আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে মসজিদ তৈরী করতে হবে। তাঁর বাসস্থানের নিকটে সাহল ও সুহাইল নামে দুই এতীম শিশুর কিছু জমি ছিল। নবী (সঃ) তাদেরকে ডেকে নিয়ে তাদের কাছ থেকে সে জমি খরিদ করে নেন। তারপর মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা)–এর সাথে স্বয়ং নবী (সঃ) তাঁর মুবারক হাত দিয়ে কাজ করতেন এবং ইট পাথর বয়ে আনতেন। তা দেখে একজন সাহাবী বলে উঠলেন।

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ - لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ

আমরা যদি চুপচাপ বসে থাকি এবং নবী (সঃ) স্বহস্তে কাজ করেন, তাহলে আমাদের এ আচরণ আমাদেরকে গোমরাহ করে দেবে।

সাহাবায়ে কেরাম আগ্রহ ও আনন্দ সহকারে কাজ করছিলেন এবং এ কবিতা সুর করে গাইছিলেন–

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ الْعَيْشَ الْاٰخِرَةِ - فَارْحِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

হে আল্লাহ্‌! সত্যিকার যিন্দেগী তো হচ্ছে আখেরাতের যিন্দেগী। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজেরীনের উপর রহম কর।

আসলে মসজিদ ইসলামী যিন্দেগীর এমন এক কেন্দ্রবিন্দু যার চার ধারেই মুসলমানের গোটা জীবন আবর্তিত হতে থাকে। এছাড়া কোন ইসলামী জনপদের ধারণাই করা যায় না। এ কারণেই নবী (সঃ) মদীনা পৌঁছার পরেই এই মসজিদ তৈরীর ব্যবস্থা করেন এবং নিজ হাতে ইট পাথর বয়ে নিয়ে মসজিদ তৈরী করেন।

মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনী প্রাণ শক্তি উজ্জীবিত রাখার জন্যে, তাদের মধ্যে মিল্লাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যিকার অনুভূতি পয়দা করার এবং তাদের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একত্রীভূত করার মাধ্যমই হচ্ছে এই যে, মসজিদকে

ইসলামী যিন্দেগীর কেন্দ্রবিন্দু বানাতে হবে এবং তার মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যেই হযরত মূসা (আ) এবং হযরত হারুন (আ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল মিসরে কিছু ঘর বাড়ী নির্দিষ্ট করে নিয়ে সেখানে জামায়াতসহ নামায কায়েম করার। এভাবে এ বাড়ী-ঘরগুলোকে মুসলমানদের যিন্দেগীর কেন্দ্র বিন্দু বানিয়ে বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোকে একত্র করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا
وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (يونس ٨٧)

আমরা মূসা (আ) এবং তার ভাইকে এই বলে নির্দেশ দিলাম মিসরে তোমাদের কওমের জন্যে কিছু ঘর দোর সংগ্রহ কর এবং কেবলা করে নামায কায়েম কর (ইউনুস ঃ ৮৭)।

আল্লাহ্র রসূল (সঃ) মসজিদ তৈরী করতে এবং তা চালু রাখার জন্যে বিভিন্ন রকমের প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর এরশাদ হচ্ছে-

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে মসজিদ তৈরী করে, তার জন্যে আল্লাহ্ জান্নাতে ঘর তৈরী করেন- (তিরমিযী, বুখারী)।

মসজিদ নির্মাণ করার অর্থ মসজিদের ঘর তৈরী করা। কিন্তু সত্যিকার অর্থে মসজিদ প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো তার মধ্যে আল্লাহ্র এবাদত করা, জামায়াতসহ নামায কায়েমের ব্যবস্থা করা। নতুবা এ কথা ঠিক যে, যদি এ উদ্দেশ্য পূরণ করা না হয় তাহলে মসজিদ অন্যান্য বাড়ী-ঘরের মতো একটি ঘর মাত্র হবে।

নবী (সঃ) বলেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র আরশের ছায়ার নীচে হবে যার মন সর্বদা মসজিদে লেগে থাকে- (বুখারী)।

অর্থাৎ কোন সময়ই মসজিদের চিন্তা তার মন থেকে দূর হয় না। এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর অধীর হয়ে দ্বিতীয় ওয়াক্তের অপেক্ষা করে।

মুসলমানদের দ্বীনী যিন্দেগী জীবিত ও জাগ্রত রাখার জন্যে মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের অনুমান করুন যে, নবী (সঃ) মৃত্যু শয্যায় কষ্ট পাচ্ছেন তথাপি ঐ অবস্থায় বিছানা ছেড়ে উঠছেন এবং দু'জন লোকের উপর ভর দিয়ে পা মুবারকদ্বয় মাটিতে টেনে হেঁচড়ে মসজিদে পৌছেছেন। তারপর জামায়াতে নামায আদায় করেন- (বুখারী)।

আল্লাহ্র কাছে এ গোটা দুনিয়ার মধ্যে শুধু ঐ অংশটুকু সবচেয়ে বেশী প্রিয় যেখানে আল্লাহ্র মসজিদ প্রতিষ্ঠিত আছে। অতপর এটা কি করে হতে পারে যে, মুমেনদের মসজিদের সাথে অসাধারণ সম্পর্ক হবে না?

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন–

আল্লাহ্র নিকটে ঐসব জনপদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় স্থান তাঁর মসজিদ এবং সবচেয়ে ঘৃণিত স্থান সে বস্তিগুলোর বাজার (মুসলিম)।

এক সময়ে নবী (সঃ) মসজিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ঈমানের সুস্পষ্ট আলামত বলে বর্ণনা করেন। তারপর নির্দেশ দেন যে, মুসলমান সমাজে যারা মসজিদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখে এবং মসজিদের খেদমত করা তাদের প্রিয় কাজ হয়, তারা সত্যিকার ঈমানদার এবং তোমরা তাদের ঈমানের সাক্ষী থাক। এটা ঠিক যে, মুসলিম সমাজে এ সব লোকই শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের অনুসরণ করা দ্বীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন–

যখন তোমরা কাউকে দেখবে যে, সে মসজিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে এবং মসজিদ দেখাশুনা করে তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক যে, সে ঈমানদার। এ জন্যে যে, আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (توبه)

আল্লাহ্র মসজিদ তারাই আবাদ রাখে যারা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে।

উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ।

মসজিদের আদব ও শিষ্টাচার

১. মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা রাখা উচিত। তারপর দরুদ শরীফ পড়ে–সেই দোয়া করা উচিত যা নবী (সঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। নবী (সঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মসজিদে আসবে সে যেন নবীর উপর দরুদ পাঠায় এবং এ দোয়া করে।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আয় আল্লাহ্ তোমার রহমতের দুয়ার আমার জন্যে খুলে দাও।

(সহীহ মুসলিম)

২. মসজিদে প্রবেশ করে সর্ব প্রথম দু'করাক্য়াত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নফল নামায পড়া উচিত। নবী (সঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে এলে দু'রাক্য়াত নামায না পড়া পর্যন্ত যেন সে না বসে।

-(বুখারী, মুসলিম)।

৩. মসজিদে নিশ্চিন্ত মনে বিনয়ের সাথে বসে থাকা উচিত। যাতে করে আল্লাহ্র মহত্ব ও তাঁর ভয় মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মসজিদে হৈ হল্লা করা, হাসি-ঠাট্টা এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্মের আলোচনা করা, বেচা কেনা করা এবং এ ধরনের অন্যান্য দুনিয়াদারী কাজ-কর্ম করা মসজিদের মর্যাদার খেলাপ। নবী (সঃ) এসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ মসজিদের মধ্যে নিরেট দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে। তোমরা যেন এসব লোকের কথাবার্তায় শরীক না হও। আল্লাহ্ দ্বীন থেকে এ ধরনের উদাসীন লোকদের নামায কবুল করবেন না।

মসজিদের মহত্ব ও তার প্রতি শ্রদ্ধা এটাই দাবী করে যে, মানুষ ভীত কম্পিত হয়ে সেখানে প্রবেশ করে এবং যেখানেই জায়গা পায় সেখানে বিনীতভাবে বসে পড়ে। এটাতো মারাত্মক অন্যায় যে, মানুষ অন্যান্য লোকের ঘাড়ের উপর দিয়ে মানুষ ঠেলে সামনে যাবে। এটাও অন্যায় যে, ইমামের সাথে রুকু এবং রাক্য়াত ধরার জন্যে মসজিদে হুড়মুড় করে দৌড়াবে। এভাবে দৌড়ানো মসজিদের মর্যাদার খেলাপ। রাক্য়াত ধরা যাক না যাক নেহায়েত ভদ্রতা ও শালীনতার সাথে ধীর পায়ে মসজিদে চলা উচিত। নবী (সঃ) বলেন, তোমাদের জন্যে জরুরী যে, তোমরা শান্তশিষ্ট হয়ে শালীনতাসহ মসজিদে থাকবে।

৪. মসজিদে দুর্গন্ধ জিনিস নিয়ে বা খেয়ে যাওয়া উচিত নয়। নবী (সঃ) বলেন, রসুন-পিঁয়াজ খেয়ে যেন কেউ আমাদের মসজিদে না আসে। এ জন্যে যে, যেসব জিনিসে মানুষের কষ্ট হয়, তাতে ফেরেশতাদেরও কষ্ট হয়-

(বুখারী মুসলিম)।

৫. মসজিদে এমন ছোটো বাচ্চা নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, যে পেশাব পায়খানা চাপলে বলতে পারে না। কারণ আশংকা থাকে যে, কখন পেশাব পায়খানা

করে ফেলে কিংবা অন্যভাবে মসজিদের সম্মান নষ্ট করে ফেলে। পাগলদেরকেও মসজিদে আসতে দেয়া উচিত নয় যাদের পাক নাপাক জ্ঞান নেই।

৬. মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করা ঠিক নয়। মসজিদে ঢুকলেই তার হক হয়ে দাঁড়ায় যে, সেখানে প্রবেশকারী নামায পড়বে, অথবা বসে যিকির ও তেলাওয়াত করবে। এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে এমনি এমনি বের হয়ে যাওয়া মসজিদের বেইযযতি করা হয়। ভুলে কেউ ঢুকে পড়লে স্মরণ হওয়া মাত্র বেরিয়ে আসা উচিত।

৭. কোন কিছু হারিয়ে গেলে মসজিদে জোরে জোরে চিৎকার করে তার ঘোষণা করা ঠিক নয়। এভাবে কেউ মসজিদে ঘোষণা করলে নবী (সঃ) তার উপর অসন্তুষ্ট হতেন এবং বলতেন–

لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ ضَالَّتَكَ

আল্লাহ্ তোমার হারানো জিনিস ফিরিয়ে না দেন–(বুখারী)।

৮. মসজিদের সাথে মনের গভীর সম্পর্ক রাখা উচিত। প্রত্যেক নামাযের সময় আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে মসজিদে যাওয়া উচিত। নবী পাক (সঃ) বলেন–

কিয়ামতের ভয়ংকর দিনে যখন আল্লাহ্র আরশ ব্যতীত কোথাও কোন ছায়া থাকবে না। সে দিন সাত প্রকার লোক আরশের ছায়ার নীচে হবে। তাদের মধ্যে এক প্রকারের হবে তারা যাদের দিল সিজদায় লেগে থাকতো–(বুখারী)।

অর্থাৎ মসজিদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হবে। সর্বদা মসজিদ তার ধ্যানের বস্তু হয়। এক ওয়াক্ত নামায শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় ওয়াক্তের জন্যে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

নবী (সঃ) বলেন–

সকাল সন্ধ্যায় মসজিদে যাতায়াতকারীদের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের মেহমানদারির আয়োজন করেন (বুখারী, মুসলিম)।

নবী (সঃ) আরও বলেন–

যে ব্যক্তি ঘরে অযু করে নামাযের জন্যে মসজিদে যায়, তার মসজিদে পৌঁছার পর আল্লাহ্ এতোটা খুশী হন যেমন ধারা মুসাফির সফর শেষে

বাড়ী ফিরে এলে বাড়ীর লোকজন খুশী হয়-(ইবনে খুযায়মা)।

নবী (সঃ) আরও বলেন-

সকালের অন্ধকারে যারা মসজিদে যায়, কেয়ামতের দিনে তার সাথে পরিপূর্ণ আলো থাকবে-(তাবারানী)।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা) বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন -

যে ব্যক্তি ভালভাবে অযূ করলো, তারপর ঘর থেকে নামাযের জন্যে বেরুলো তার প্রতি ডান কদমের উপর একটি করে নেকী লেখা হবে। আর বাম কদমের উপর একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। মসজিদ নিকটে হোক অথবা দূরে। তারপর মসজিদে পৌছার পর যদি পুরা জামায়াতের সাথে নামায আদায় করে তাহলে পুরা সওয়াব পাবে, কিছু নামায হয়ে যাওয়ার পর শরীক হলে এবং সালামের পর বাকী নামায পুরা করলে-তবুও পুরা সওয়াব পাবে। আর যদি মসজিদে পৌছতে পৌছতে জামায়াত হয়ে যায় এবং সে একাকী মসজিদে নামায আদায় করে, তথাপিও পুরা সওয়াব পাবে -(আবু দাউদ)।

৯. মসজিদে সুগন্ধি প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, মসজিদ পাক সাফ রাখা মসজিদের হক। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ হচ্ছে জান্নাতবাসীদের কাজ। নবী (সঃ) বলেন, মসজিদ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা রাখা, পাক সাফ রাখা, আবর্জনা বাহিরে ফেলা, মসজিদে সুগন্ধির ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে জুমার দিনে মসজিদ খোশবুতে ভরপুর করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে-(ইবনে মাজাহ, তাবারানী)।

তিনি আরও বলেন-

মসজিদের আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজটা হলো বেহেশতের সুন্দরী হুরপরীর মোহর-(তাবারানী)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করে সে প্রকৃতপক্ষে সুন্দরী হুরের মোহর আদায় করে।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, একজন মেয়েলোক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দেয়ার কাজ করতো হঠাৎ সে মারা গেল। লোক তাকে গুরুত্ব না দিয়ে দাফন করলো। নবী (সঃ) কেও কোন খবর দিল না। নবী (সঃ) যখন তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর জানতে পারলেন যে, সে মারা গেছে এবং সামান্য ব্যাপার মনে করে দাফন করা হয়েছে, তখন নবী (সঃ) বলেন-

তোমরা আমাকে জানালে না কেন?

তারপর তিনি তার কবরে গিয়ে দোয়া করে বলেন, এ মেয়েলোকটির সবচেয়ে ভাল আমল এ ছিল যে, মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার কাজ করতো– (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, প্রভৃতি)।

১০. মসজিদের আঙিনায় অযু করা, কুলি করা অথবা অযু করে মসজিদে হাত ঝেড়ে পানি ছিঁটে ফেলা মাকরুহ। কিছু লোক অযু করার পর চেহারা এবং হাত মুছে ব্যবহৃত পানি মসজিদের মধ্যে ফেলে। এমন করা মসজিদের বেয়াদবী করা হয়। এভাবে কারো পায়ে অথবা কাপড়ে প্রভৃতিতে যে কাদামাটি লেগে থাকে তা মসজিদের দেয়ালে, থামে অথবা পর্দায় মুছে ফেলা মাকরুহ।

১১. জানাবাত অথবা হায়েয নেফাস অবস্থায় মসজিদে না যাওয়া উচিত কোন অপরিহার্য কারণ ব্যতীত এরূপ অবস্থায় মসজিদে যাওয়া মাকরুহ তাহরীমি।

১২. মসজিদে ঘুমানো, অযথা শুয়ে শুয়ে অথবা বসে বসে সময় কাটানো মাকরুহ। অবশ্যি মুসাফিরের জন্যে থাকা এবং ঘুমানোর অনুমতি আছে। তারপর যারা এ'তেকাফ করেন তাদের মসজিদেই থাকতে এবং ঘুমাতে হবে।

১৩. সতর খোলা আছে এমন পোশাকে মসজিদে না যাওয়া উচিৎ। যেমন ধরুন, নেকাব পরে অথবা কাপড় উপরে উঠিয়ে না যাওয়া উচিৎ। বরঞ্চ পোশাক আবৃত হয়ে আদবের সাথে যাওয়া উচিত।

১৪. মসজিদের দরজা বন্ধ করা উচিত নয়। কারণ যখন যার ইচ্ছা সে যেন নামায পড়তে পারে। অবশ্যি লট বহর জিনিসপত্র চুরি হওয়ার ভয় থাকলে দরজা বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু নামাযের সময় অবশ্যই দরজা খোলা রাখতে হবে। সাধারণ অবস্থায় মসজিদের দরজা বন্ধ রাখা মাকরুহ।

১৫. মসজিদে দস্তুরমত আযান ও জামায়াতের ব্যবস্থা করা উচিত। এমন লোককে আযান দেয়ার জন্যে এবং ইমামতী করার জন্যে নিযুক্ত করা উচিত, যে মসজিদে আগমনকারী সমস্ত নামাযীর কাছে সামগ্রিকভাবে দ্বীন ও আখলাকের দিক দিয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হয়। যতদূর সম্ভব এ বিষয়ে চেষ্টা করা দরকার যাতে করে আযান–ইমামতের জন্যে এমন

লোক পাওয়া যায়, যে নিছক আখেরাতের প্রতিদানের আশায় এ দায়িত্ব পালনকরবে।

হযরত ওসমান ইবনে আবীল আস (রা) বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছে দরখাস্ত করে বললাম, আমাকে কওমের ইমাম বানিয়ে দিন।

নবী (সঃ) বলেন-

তুমি তার ইমাম হও কিন্তু দুর্বল লোকদের খেয়াল রাখবে এবং এমন মুয়াযযিন নিযুক্ত করবে যে আযান দেয়ার পারিশ্রমিক নেবে না-(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী)।

১৬. মসজিদ চালু রাখার জন্যে পুরাপুরি ব্যবস্থা করতে হবে। মসজিদ চালু রাখার অর্থ এই যে, তার মধ্যে আল্লাহ্র এবাদত করতে হবে এবং লোক যেন যিকির-ফিকির, তেলাওয়াত, নফল নামায প্রভৃতিতে মশগুল থাকে। আল্লাহ্ তায়ালার এরশাদ-

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ (النور : ٣٦)

এসব ঘরে যেগুলোকে আল্লাহ্ উচ্চ-উন্নত করতে এবং তার মধ্যে আল্লাহ্র নামের যিকির করতে অনুমতি দিয়েছেন। (নূর ঃ ৩৬)

অর্থাৎ মসজিদের এ হক যে তার সম্ভ্রম শ্রদ্ধা করা হোক, তার মধ্যে যিকির-ফিকির করা হোক এবং আল্লাহ্র ইবাদতের ব্যবস্থা করা হোক এ মুমিনদের হক ও দায়িত্ব এবং তাদের ঈমানের সাক্ষ্য।

কুরআনে আছে-

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

(التوبه ١٧)

আল্লাহ্র মসজিদগুলোকে তো তারাই তৈরী করে সজীব ও আবাদ রাখে যারা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে-(তওবা ঃ ১৭)।

কিন্তু আজকাল সাধারণত মানুষ মসজিগুলোকে সুন্দর কারুকার্য সহকারে সাজিয়ে রঙিন আলো ঝলমল করে রাখার আশ্চর্য ধরনের ব্যবস্থা করে। বরঞ্চ তার জন্যে চাঁদাও আদায় করে যা আরো খারাপ। কিন্তু তারা মসজিদকে সজীব রাখার এবং আল্লাহ্র ইবাদতের

সৌভাগ্যলাভ করার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন থাকে। অথচ নবী পাক (সঃ) এরশাদ করেন–

আমাকে মসজিদ সুউচ্চ ও জাঁকজমকপূর্ণ করে বানাতে আদেশ করা হয়নি।–(আবু দাউদ)।

হযরত ইবনে আব্বাস এ হাদীস শুনানোর পর লোকদের সাবধান করে দিয়ে বলেন–

"তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে এমনভাবে সাজাতে থাকবে যেমন ইহুদী–নাসারা তাদের ইবাদতখানাকে করে।"

মসজিদ থেকে বেরুবার সময় প্রথমে বাম পা রাখতে হবে এবং তারপর এ দোয়া পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

আয় আল্লাহ্ আমি তোমার ফযল ও করম ভিক্ষা চাই।

১৮. মসজিদের ছাদের উপর পেশাব পায়খানা করা এবং যৌনকার্য করা মাকরুহ তাহরীমি। যদি কেউ ঘরের মধ্যে মসজিদ বানিয়ে থাকে তাহলে পুরা ঘরের উপর মসজিদের হুকুম কার্যকর করা হবে না। বরঞ্চ অতটুকু মসজিদের হুকুমের মধ্যে আসবে যা নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এমনিভাবে ওসব স্থানও মসজিদের হুকুমের আওতায় আসবে না যা ঈদাইন অথবা জানাযার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৯. সাধারণত কোন পেশাজীবীর জন্যে এটা জায়েয নয় যে, সে মসজিদে বসে তার আপন কাজ করবে। তবে যদি এমন লোক মসজিদের হেফাযতের জন্যে মসজিদে বসে সাময়িকভাবে নিজের কাজ করে যেমন কোন দর্জি সেলাইয়ের কাজ করে অথবা লেখক লেখার কাজ করে তাহলে তা জায়েযহবে।

জামায়াতে নামাযের বর্ণনা

জামায়াতের তাকীদ ও ফযিলত

কুরআন ও সুন্নায় জামায়াতের সাথে নামাযের যে তাকীদ এবং ফযীলত বয়ান করা হয়েছে, তার থেকে এ সত্য পরিস্ফুট হয় যে, ফরয নামায তো জামায়াতে পড়ারই জিনিস এবং ইসলামী সমাজে জামায়াত ব্যতীত ফরয নামায পড়ার কোন ধারণাই করা যেতে পারে না। অবশ্য যদি প্রকৃত ওযর থাকে তো ভিন্ন কথা।

কুরআনের নির্দেশ

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ - (البقره ٤٣)

–এবং রুকু'কারীদের সাথে রুকু' কর–(বাকারাহ ঃ ৪৩)

মুফাস্‌সিরগণ সাধারণত এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন যে, নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা উচিত–(মায়ালেমুত্তানযীল, খাযেন, তাফসীরে কাবীর প্রভৃতি)।

দ্বীনের মধ্যে জামায়াতসহ নামাযের অসাধারণ গুরুত্ব ও তাকীদের অনুমান এর থেকে করুন যে, লড়াইয়ের ময়দানে যখন প্রতি মুহূর্তে দুশমনের সাথের রক্তাক্ত সংঘর্ষের আশংকা হয়, তখনও এ তাকীদ করা হয়েছে যে, আলাদা, আলাদা নামায না পড়ে বরঞ্চ জামায়াতের সাথেই পড়তে হবে। তারপর কুরআনে শুধু এ নির্দেশই নেই যে নামায জামায়াতসহ পড়তে হবে–বরঞ্চ নামাযের নিয়ম পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে–

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْآ اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ -(النساء ١٠٢)

–এবং (হে নবী) যখন তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকবে এবং (লড়াইয়ের অবস্থায়) তাদেরকে নামায পড়াবার জন্যে দাঁড়াবে, তখন উচিত যে একদল তোমার সাথে দাঁড়াবে, এবং অস্ত্র নিয়ে থাকবে। তারপর যখন তারা সিজদা আদায় করবে তখন পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল যারা এখনও নামায পড়েনি তারা এসে তোমার সাথে নামায পড়বে। তারাও সতর্ক থাকবে এবং অস্ত্র নিয়ে থাকবে। (নিসাঃ ১০২)।

জামায়াতের তাকীদ ও ফযিলত সম্পর্কে নবী পাক (সঃ) অনেক কিছু বলেছেন। তার গুরুত্ব ও বরকত উল্লেখ করে তিনি তার প্রেরণা দিয়েছেন এবং জামায়াত পরিত্যাগকারীদের জন্যে কঠিন সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন–

* মুনাফিকদের নিকটে ফজর এবং এশার নামায থেকে বেশী কঠিন কোন নামায নয়। তারা যদি জানতো যে এ দু'নামাযের কতখানি সওয়াব তাহলে তারা সব সময়ে এ দু'নামাযের জন্যে হাযির হতো. (এমন কি) হাঁটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে আসতো।

তারপর তিনি বলেন–

আমার মন বলেছে যে, কোন মুয়াযযিনকে হুকুম দিই যে, জামায়াতের একামত দিক এবং আমি কাউকে হুকুম দিই যে, সে আমার স্থানে ইমামতী করুক এবং আমি স্বয়ং আগুনের কুণ্ডলি নিয়ে তাদের ঘরে লাগিয়ে দেই এবং তাদেরকে জ্বালিয়ে মারি যারা আযান শুনার পরও ঘর থেকে বের হয় না–(বুখারী, মুসলিম)।

* নামায জাময়াতসহ পড়া একাকী পড়া থেকে সাতাশ গুণ বেশী ফযিলত রাখে –(বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন–

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামায নিয়মিতভাবে জামায়াতের সাথে আদায় করবে এমনভাবে যে, তাকবীরে উলাও তার ছুটে যাবে না, তাহলে তার জন্যে দু'টি জিনিস থেকে অব্যাহতির ফায়সালা করা হয়। (অর্থাৎ দুটি জিনিস থেকে তার হেফাজত এবং নাজাতের ফায়সালা আল্লাহ্ তায়ালা করেন)। একটি জাহান্নামের আগুন থেকে অব্যাহতি এবং দ্বিতীয়টি মুনাফেকী থেকে অব্যাহতি ও হেফাযত– (তিরমিযী)।

* হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন–

হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে 'সুনানে হুদা' নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এমন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যা অবলম্বন করেই উম্মত হেদায়েতের উপর কায়েম থাকতে পারবে। আর এ পাঞ্জেগানা নামায জামায়াতের সাথে মসজিদে পড়াই হলো 'সুনানে হুদা'। তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামায পড়া শুরু কর, যেমন অমুক ব্যক্তি জামায়াত ছেড়ে ঘরে নামায পড়ে। (সে সময়ের কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে) তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দেবে। যদি তোমরা নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও তাহলে হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে–(মুসলিম)।

* হযরত উবাই বিন কা'ব (রা)–এর বর্ণনা, নবী (সঃ) বলেন–

যদি লোক জামায়াতে নামাযের সওয়াব ও প্রতিদান জানতে পারতো তাহলে তারা যে অবস্থায়ই থাক না কেন দৌড়ে এসে জামায়াতে শামিল হতো। জামায়াতের প্রথম কাতার এমন, যেন ফেরেশতাদের কাতার। একা নামায পড়ার চেয়ে দু'জনে নামায পড়া ভালো। তারপর মানুষ যতো বেশী[১] হবে, ততোই আল্লাহ্র নিকটে সে জামায়াত বেশী পছন্দনীয় ও প্রিয় হবে।[২]

* নবী (সঃ) আরও বলেন–

যারা অন্ধকার রাতে জামায়াতে নামাযের জন্যে মসজিদে যায়, তাদেরকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে, কেয়ামতের দিনে তারা পরিপূর্ণ আলো লাভ করবে– (তিরমিযী)।

* হযরত উসমান (রা) বলেন, নবী (সঃ) এরশাদ করেন–

যে ব্যক্তি এশার নামায জামায়াতে আদায় করে সে অর্ধেক রাত এবাদত করার সওয়াব পাবে এবং যে ফজরের নামায জামায়াতে পড়বে সে গোটা রাতের এবাদতের সওয়াব পাবে–(তিরমিযী)।

---

১ তাওরাতে আছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জামায়াতের নামাযে যতো বেশী মানুষ হবে প্রত্যেক লোকের জন্যে ততোটা সওয়াব হবে। অর্থাৎ যদি এক হাজার লোক হয়, তাহলে প্রত্যেকে এক হাজার নামাযের সওয়াব পাবে। (ইলমুল ফেকাহ)।

২ আবু দাউদ।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন–যে ব্যক্তি আযান শুনার পর জামায়াতে নামায পড়তে আসে না এবং তার না আসার কোন ওযরও নেই, তাহলে তার সে নামায কবুল হবে না, যা সে একাকী পড়ে।

জনৈক সাহাবী (রা) জিজ্ঞাসা করেন–ওযর বলতে কি বুঝায়। তার উত্তরে নবী (সঃ) বলেন–'ভয় অথবা অসুস্থতা'–(আবু দাউদ)।

হযরত আসওয়াদ (রা) বলেন, একদিন আমরা হযরত আয়েশা (রা)–এর খেদমতে হাযির ছিলাম এমন সময় নামাযের পাবন্দী এবং ফযিলত সম্পর্কে কথা উঠলো। তখন হযরত আয়েশা (রা) নবী পাক (সঃ)–এর মৃত্যুশয্যার বর্ণনা করে বলেন–

একদিন নামাযের ওয়াক্ত হলে নবী (সঃ) বলেন, আবু বকর (রা) কে বল নামায পড়িয়ে দিক। আমরা বললাম, আবু বকর নরম দিল লোক। আপনার জায়গায় দাঁড়ালে নিজেকে সামলাতে পারবে না এবং নামায পড়াতে পারবে না।

নবী পাক (সঃ) আবার হুকুম দিলেন, আবু বকরকে নামায পড়াতে বল। আমরা আবার ঐ কথাই বললাম। তখন হুযুর (সঃ) বললেন, তোমরা আমার সাথে এমনভাবে কথা বলছো যেমনভাবে মিসরের মহিলারা হযরত ইউসুফ (আ)–এর সাথে বলেছিল? তোমরা আবু বকরকে বল নামায পড়িয়ে দিক।

যা হোক হযরত আবু বকর (রা) নামায পড়াবার জন্যে সামনে এগিয়ে গেলেন। এমন সময়ে নবী পাক (সঃ)–এর একটু ভালো মনে হলো বলে দু'জনের উপর ভর দিয়ে মসজিদের দিকে যেতে লাগলেন। সে চিত্র আমার চোখের সামনে ভাসছে। নবী পাক (সঃ)–এর কদম মুবারক মাটির উপর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলছিল। তার মানে তাঁর পায়ে এত শক্তি ছিল না যে, পা খাড়া করেন। আবু বকর (রা) মসজিদে নামায শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু নবী পাক (সঃ) নিষেধ করলেন এবং তাঁর দ্বারাই নামায পড়িয়ে নিলেন–(সহীহ বুখারী)।

জামায়াতের হুকুম

১. পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে জামায়াত ওয়াজেব। কোন ওয়াক্ত মসজিদের বাইরে হলেও ওয়াজেব। যেমন ঘর অথবা মাঠে ময়দানে। ঘরে জামায়াত

করা জায়েয বটে কিন্তু কোন ওযর ব্যতীত এমন করা ঠিক নয়। মসজিদেই জামায়াতে নামায পড়া উচিত।

২. জুমা এবং ঈদাইনের জন্যে জামায়াত শর্ত। অর্থাৎ জামায়াত ব্যতীত না জুমার নামায পড়া যায়, আর না ঈদাইনের নামায।

৩. রমযানের তারাবীহ্ নামায জামায়াতে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্, যদিও পূর্ণ কুরআন পাক জামায়াতের সাথে পড়া হয়ে থাকে।

৪. নামাযে কসুফেও জামায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

৫. রমযানের বেতেরের নামায জামায়াতে পড়া মুস্তাহাব।

৬. নামাযে খসুফে জামায়াত মাকরুহ্ তাহরীমী।

৭. সাধারণ নফল নামাযেও জামায়াত মাকরুহ্ যদি ফরয নামাযের মতো ডেকে নেয়ার জন্যে আযান ও ইকামতের ব্যবস্থা করা হয়। তবে কোন সময়ে কোন আয়োজন ব্যতিরেকে কিছু লোক একত্র হয়ে নফল নামায জামায়াতে আদায় করলে কোন দোষ নেই।

জামায়াত ওয়াজেব হওয়ার শর্ত

১. পুরুষ হওয়া। মেয়েদের জন্যে জামায়াতে নামায ওয়াজেব নয়।

২. বালেগ হওয়া। নাবালেগ বাচ্চাদের জন্যে জামায়াত করা ওয়াজেব নয়।

৩. জ্ঞান থাকা। বেহুশ, পাগল নেশাগ্রস্তদের জন্যে জামায়াত ওয়াজেব নয়।

৪. ঐসব ওযর না থাকা যার কারণে জামায়াত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে।

জামায়াত ছেড়ে দেয়ার ওযর

যেসব ওযর থাকলে জামায়াত না করা যায় তা চার প্রকার। এসব কারণে জামায়াত তো ছাড়া যায়, কিন্তু যতদূর সম্ভব জামায়াতে যোগদান করা ভালো।

১. নামাযী মসজিদ পর্যন্ত যেতে অপারগ। যেমন–

(ক) এত দুর্বল যে, চলতে পারে না।

(খ) এমন রোগ যে, চলাফেরা করা যায় না।

(গ) অন্ধ অথবা পংগু অথবা পা কাটা হলে। এমন অবস্থায় তাকে কেউ মসজিদে পৌছিয়ে দিলেও তার জন্যে জামায়াত ওয়াজেব নয়।

২. মসজিদে যেতে খুব অসুবিধা হওয়া অথবা রোগ বৃদ্ধির আশংকা। যেমন–

(ক) মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

(খ) ভয়ানক শীত এবং বাইরে বেরুলে অসুখ হওয়ার আশংকা।

(গ) ভয়ানক অন্ধকার, রাস্তা দেখা যায় না।

(ঘ) মসজিদের রাস্তায় কাদা–পানি থাকা।

(ঙ) যানবাহন ছেড়ে যাওয়ার আশংকা এবং পরবর্তী যানবাহনের অপেক্ষা করলে ক্ষতির আশংকা।

৩. জান ও মালের আশংকা হওয়া, যেমন–

(ক) মসজিদের রাস্তায় কোন অনিষ্টকর প্রাণী থাকা, সাপ অথবা হিংস্র পশু প্রভৃতি।

(খ) দুশমনের ওঁত পেতে বসে থাকা।

(গ) পথে চোর ডাকাতের ভয় অথবা বাড়ীতে চুরি হওয়ার আশংকা।

৪. এমন কোন মানবীয় প্রয়োজন যা পূরণ না করলে নামাযে মন না লাগার আশংকা। যেমন–

(ক) ক্ষুধা লেগে গেছে এবং খানা হাযির।

(খ) পেশাব পায়খানার বেগ হওয়া।

কাতার সোজা করা

১. জামায়াতের জন্যে কাতার সোজা করার পুরাপুরি ব্যবস্থা করা উচিত। নবী (সঃ)–এর নির্দেশ হচ্ছে–

নামাযে তোমাদের কাতার সোজা ও বরাবর রাখ। এরূপ করা নামাযের অংশ (বুখারী, মুসলিম)।

হযরত নো'মান বিন বশীর (রা) বলেন, নবী পাক (সঃ) আমাদের কাতার এমনভাবে সোজা করে দিতেন যেন তার দ্বারা তিনি তীর সোজা করছেন। এটা এ জন্যে যে, যাতে করে তাঁর ধারণা জন্মে যে আমরা তাঁর কথা

ভালভাবে বুঝতে পেরেছি। একবার তিনি বাইরে এসে নামায পড়াবার জন্যে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বলতে যাবেন এমন সময় এক ব্যক্তির উপর তাঁর নযর পড়লো। যার বুক কাতার থেকে একটু সামনে বেড়ে গিয়েছিল। তখন নবী পাক (সঃ) বললেন–

"আল্লাহর বান্দাহ। তোমাদের কাতার সোজা এবং সমান কর। এমন যেন না হয় যে, কাতার সোজা না করার কারণে আল্লাহ্ তোমাদের মুখ একে অপরের দিক থেকে ফিরিয়ে দেন"-(মুসলিম)।

২. প্রথমে সামনের কাতারগুলো সোজা এবং সমান করতে হবে। তারপর কিছু ত্রুটি যদি থাকে তো পেছনের কাতারগুলোতে থাকবে।

৩. ইমামের পেছনে তাঁর নিকটে ঐসব লোক থাকবেন যারা এলেম ও দূরদর্শিতায় অগ্রসর। তারপর নিকটে ঐসব লোক হবে যারা বুদ্ধি-বিবেচনার দিক দিয়ে তাদের নিকটবর্তী হবে।

৪. ইমামের পেছনে থাকবে প্রথমে পুরুষের কাতার, তারপর বালকদের এবং সব শেষে মেয়েদের।

৫. মুক্তাদী ইমামের উভয় দিকে দাঁড়াবে যেন ইমাম মাঝখানে থাকেন, এমন যেন না হয় যে, ইমামের এক দিকে বেশী লোক এবং অন্যদিকে কম।

৬. যদি একজনই মুক্তাদী হয়, বালেগ পুরুষ হোক অথবা না-বালেগ বালক ইমামের ডান দিকে একটু পেছনে তার দাঁড়ানো উচিত। একজন মুক্তাদীর ইমামের পেছনে বা বাঁয়ে দাঁড়ানো মাকরুহ।

৭. একাধিক মুক্তাদী হলে তাদেরকে ইমামের পেছনে দাঁড়াতে হবে। যদি দু'জন মুক্তাদী হয় এবং তারা ইমামের ডানে বামে দাঁড়ায় তাহলে মাকরুহ তানযীহী হবে। দুয়ের বেশী হলে মাকরুহ তাহরীমী হবে। কেননা, দু'য়ের বেশী মুক্তাদী হলে, ইমামেরই সামনে দাঁড়ানো ওয়াজেব হবে-(ইলমুল ফেকাহ-দুররে মুখতার, শামী)

৮. প্রথমে যদি একজন মুক্তাদী থাকে এবং পরে আরও মুক্তাদী এসে যায়, তাহলে ইমামের বরাবর দণ্ডায়মান মুক্তাদীকে পেছনের কাতারে টেনে নিতে হবে অথবা ইমাম সামনে এগিয়ে দাঁড়াবেন যাতে মুক্তাদীগণ সকলে মিলে ইমামের পেছনে একই কাতারে দাঁড়াতে পারে।

৯. আগের কাতার পুরা হয়ে গেলে পরে যে আসবে সে একা পেছনের কাতারে দাঁড়াবে না। আগের কাতার থেকে কাউকে টেনে পেছনের কাতারে আনতে

হবে। তবে এ মাসয়ালা যার জানা নেই তাকে টানলে খারাপ মনে করবে।

১০. আগের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পেছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরুহ।

মহিলাদের জামায়াত

১. শুধু মহিলাদের জামায়াত–(অর্থাৎ ইমামও মহিলা এবং মুক্তাদীও মহিলা) জায়েয, মাকরুহ নয়।

হযরত উম্মে ওয়ারাকা (রা) বিনতে নওফেল বলেন যে, নবী (সঃ) তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে তাঁর বাড়ী যেতেন। তিনি তাঁর জন্যে একজন মুয়াযযিনও নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁদের নামাযের জন্যে আযান দিতেন। উম্মে ওয়ারাকা তাঁর ঘরের মেয়েদের ইমামতী করতেন

–(আবু দাউদ)

২. মহিলাদের ইমামতি করতে হলে ইমাম কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে, আগে দাঁড়াবে না তা মুক্তাদী একজন হোক বা একাধিক হোক।

৩. কোন পুরুষের শুধু মহিলাদের ইমামতী করা জায়েয এ শর্তে যে এ জামায়াতে কোন একজন পুরুষ থাকবে অথবা মহিলাদের মধ্যে কোন মুহাররাম মহিলা থাকবে যেমন মা, বোন অথবা স্ত্রী। তবে যদি কোন পুরুষ বা মুহাররামা মহিলা জামায়াতে না থাকে তাহলে ইমামতী করা মাকরুহ তাহরীমী হবে।

৪. মুক্তাদী যদি মেয়েলোক হয়, সাবালিকা হোক বা নাবালিকা তার উচিত ইমামের পিছনে দাঁড়ানো সে একাকী হোক কিংবা একাধিক হোক। একজন হলেও ইমামের সাথে দাঁড়াবে না, বরঞ্চ পেছনে দাঁড়াবে।

সুতরা

১. যদি কেউ এমন স্থানে নামায পড়ে যার সামনে দিয়ে লোক যাতায়াত করে, তাহলে তার সামনে এমন কিছু রাখা উচিত যা প্রায় একগজ উঁচু হবে এবং অন্তত এক আঙুল পরিমাণ মোটা হবে। এটা করা মুস্তাহাব।

২. নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া গুনাহের কাজ। কিন্তু সুতরা (উপরে বর্ণিত জিনিস) খাড়া করে রাখলে সামনে দিয়ে যাতায়াত করলে গুনাহ হবে না। কিন্তু সুতরা এবং নামাযীর মাঝখানে দিয়ে যাওয়া চলবে না।

৩. ইমাম যদি তার সামনে সুতরা খাড়া করে তাহলে তা সকল মুক্তাদীর জন্যে যথেষ্ট হবে। তখন জামায়াতের সামনে দিয়ে যাওয়া গুনাহ্ হবে না।

জামায়াত সম্পর্কে মাসয়ালা

১. যদি কেউ তার নিকটস্থ মসজিদে এমন সময় পৌছে দেখে যে, জামায়াত হয়ে গেছে, তাহলে তার অন্য কোন মসজিদে জামায়াত ধরার জন্যে চেষ্টা করা মুস্তাহাব। ঘরে এসে ঘরের লোকদের সাথে জামায়াত করাও জায়েয।

২. জামায়াত সহীহ্ হওয়ার জন্যে প্রয়োজন এই যে, ইমাম এবং মুক্তাদীর নামাযের স্থান যেন এক হয়, যেমন একই মসজিদে অথবা একই ঘরে উভয়ে নামায পড়ছে, অথবা ইমাম মসজিদে মুক্তাদী বাইরে সড়কে কিংবা নিজের বাড়ীতে দাঁড়ায় কিন্তু মাঝখানে ক্রমাগত কাতার দাঁড়িয়ে গেছে।

৩. যদি ইমাম মসজিদের ভিতরে এবং মুক্তাদী মসজিদের ছাদে দাঁড়ায় অথবা কারো বাড়ী মসজিদের সাথে লাগানো এবং সে তার বাড়ীর উপরে দাঁড়িয়েছে কিন্তু উভয়ের মাঝখানে এতটুকু যায়গা যেন খালি না থাকে যে দুটি কাতার হতে পারে।

৪. কেউ একাকী ফরয নামায পড়ে নিয়েছে এবং জামায়াতে ফরয নামায হচ্ছে তখন তার উচিত জামায়াতে শামিল হওয়া। তবে ফজর, আসর এবং মাগরেবে শরীক হবে না। এ জন্যে যে, ফজর এবং আসরের পর নামায মাকরুহ্। মাগরেবে শরীক না হওয়ার কারণ তার এ দ্বিতীয় নামায নফল হবে। আর নফল নামায তিন রাক্য়াত হওয়া বর্ণিত নেই।

৫. কেউ ফরয নামায পড়ছে, তারপর সেই নামায জামায়াতে হওয়া শুরু হলো, তখন তার উচিত তার নামায ছেড়ে দিয়ে জামায়াতে শরীক হওয়া। তাতে ফজরের নামাযে যদি দ্বিতীয় রাক্য়াতের সিজদা করে থাকে, এবং অন্য কোন ওয়াক্তের নামাযে তৃতীয় রাক্য়াতের সিজদা করে থাকে, তাহলে নামায পুরা করবে। নামায পুরা করার পর যদি দেখে যে, জামায়াত শেষ হয়নি, তাহলে যোহর এবং এশার নামায যদি হয় তাহলে জামায়াতে শরীক হবে।

৬. যদি কেউ নফল নামায শুরু করে থাকে এবং ফরযের জামায়াত দাঁড়ায় তাহলে সে দু'রাক্য়াত পড়ে সালাম ফিরাবে।

৭. যদি কেউ যোহরের অথবা জুমার প্রথম চার রাক্‌য়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ শুরু করে থাকে এবং এমন সময় ইমাম ফরয নামাযের জন্যে দাঁড়ালো, তখন তার উচিত দুরাক্‌য়াত সুন্নাত পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর ফরযের পর ঐ সুন্নাত পুরা করবে।

৮. যখন ইমাম ফরয নামায পড়ার জন্যে দাঁড়িয়ে যাবে তখন সুন্নাত পড়া উচিত নয়। তবে যদি বিশ্বাস হয় যে, ফরযের কোন রাক্‌য়াত বাদ পড়বে না, তাহলে সুন্নাত পড়া যাবে। অবশ্যি ফজরের সুন্নাতের যেহেতু খুব বেশী তাকীদ আছে, সে জন্যে জামায়াতে এক রাক্‌য়াত পাওয়ারও যদি আশা থাকে তাহলে সুন্নাত পড়বে। এক রাক্‌য়াত পাওয়ার যদি আশা না থাকে তাহলে পড়বে না।

৯. যখন জামায়াতে ফরয নামায হচ্ছে তখন কেউ সুন্নাত পড়তে চাইলে মসজিদ থেকে আলাদা জায়গায় পড়বে। তা সম্ভব না হলে জামায়াতের কাতার থেকে আলাদা হয়ে মসজিদের এক কোণে পড়বে। তাও সম্ভব না হলে সুন্নাত পড়বে না। এ জন্যে যেখানে ফরয নামাযের জামায়াত হয় সেখানে অন্য কোন নামায মাকরুহ্‌ তাহরীমী।

১০. যদি কোন সময়ে বিলম্ব হয়ে যায় এবং তার জন্যে পুরা জামায়াত পাওয়ার আশা না থাকে। তথাপি মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়া উচিত। জামায়াতের সওয়াব আশা করা যেতে পারে বরঞ্চ জামায়াত শেষ হয়ে গেলেও আল্লাহর কাছে আশা করা যায় যে, জামায়াতের সওয়াব পাওয়া যাবে।

নবী (সঃ) বলেন–

যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করলো, তারপর জামায়াতের আশায় মসজিদে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলো জামায়াত হয়ে গেছে। তাহলে আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর সে বান্দাহকে ঐ লোকদের মতো জামায়াতের সওয়াব দিবেন, যারা জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আদায় করেছে। এতে করে তাদের সওয়াবে কোন কম করা হবে না–(আবু দাউদ)।

১১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হবে সে ঐ রাক্‌য়াত পেয়েছে মনে করা হবে। কিন্তু রুকু না পেলে সে রাক্‌য়াত পাওয়া যাবে না।

১২. ইমাম ছাড়া একজন যদি নামাযে শরীক হয় তাহলে সাধারণ নামাযগুলোতে জামায়াত হয়ে যাবে। কিন্তু জুমার জামায়াতের জন্যে

প্রয়োজন ইমাম ব্যতিরেকে অন্তত আরও দু'জন। নতুবা জুমার জামায়াত হবেনা।

দ্বিতীয় জামায়াতের হুকুম

মসজিদে নিয়ম মাফিক প্রথম জামায়াত হয়ে যাওয়ার পর যারা জামায়াত পায়নি, এমন কিছু লোক মিলে দ্বিতীয় জামায়াত করলে কোন অবস্থায় এ দ্বিতীয় জামায়াত জায়েয এবং কোন অবস্থায় তা মাকরুহ হবে।

১. মসজিদে নিয়মিত জামায়াত হওয়ার পর কেউ তার ঘরে অথবা মাঠে দ্বিতীয় জামায়াত করলে তা জায়েয হবে। এতে কোন মতভেদ নেই।

২. সাধারণ চলাফেরার স্থানে যে মসজিদ যার না ইমাম নির্দিষ্ট আছে আর না মুয়াযযিন এবং না নামাযের কোন নির্ধারিত সময়। তাতে দ্বিতীয় জামায়াত জায়েয।

৩. প্রথম জামায়াত যদি উচুঁ গলায় আযান দিয়ে একামাতসহ পুরাপুরি ব্যবস্থা মতো না হয়ে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় দ্বিতীয় জামায়াত জায়েয হবে।

৪. প্রথমে জামায়াত করে এমন লোক পড়লো যারা মহল্লার লোক নয়, আর না মসজিদের ব্যাপারে তাদের কোন কিছু করার আছে, তাহলে এখানে দ্বিতীয় জামায়াত জায়েয।

৫. যদি দ্বিতীয় জামায়াতের ধরন বদলে দেয়া যায় তাহলে বিনা দ্বিধায় দ্বিতীয় জামায়াত জায়েয হবে। ধরন বদলানোর অর্থ এই যে, প্রথম জামায়াতে ইমাম যে স্থানে দাঁড়িয়েছিল, দ্বিতীয় জামায়াতে ইমাম সেখান থেকে সরে অন্য স্থানে দাঁড়াবে।[১]

---

১. ইলমুল ফেকাহ, ২য় খণ্ডে দুররুল মুখতারের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফের মতে জামায়াতের রূপ ও ধরন বদলে দিলে দ্বিতীয় জামায়াত মাকরুহ হবে না এবং এর উপরেই ফতোয়া।

তিরমিযী এবং আবু দাউদে আছে, নবী (সঃ) একজনকে দেখলেন যে, সে একাই নামায পড়ছে। নবী (সঃ) বললেন, কে আছে যে তাকে সাহায্য করবে? তখন একজন দাঁড়ালো এবং তাঁর সাথে নামায পড়লো। কিন্তু মসজিদে এমন অবস্থা হওয়া উচিত নয় যে, সেখানে নিয়মিত দ্বিতীয় জামায়াত চলতে থাকবে।

৬. উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে এবং ঐরূপ অবস্থা না হলে দ্বিতীয় জামায়াত মাকরুহ হবে। অর্থাৎ কোন মহল্লার মসজিদে মহল্লাবাসী রীতিমতো ব্যবস্থাপনার সাথে উচ্চ গলায় আযান দিয়ে এবং একামতসহ জামায়াত করে নামায পড়লো। তারপর সে মসজিদে জামায়াতের পর কিছু লোক পৌছলো এবং এমনভাবে জামায়াত করে নামায পড়লো যে জামায়াতের ধরন বদলালো না, এমন অবস্থায় জামায়াত মাকরুহ তাহরীমী হবে।

ইমামতির বর্ণনা

ইমাম নির্বাচন

নামাযের ইমামতি একটি বিরাট দ্বীনী মর্যাদা এবং দায়িত্ব। এ রসূলের উত্তরাধিকারীর মর্যাদা। এ জন্যে খুব সাবধানতার সাথে ইমাম নির্বাচন করতে হবে। এমন ব্যক্তির উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে যিনি সামগ্রিকভাবে সকল নামাযীর চেয়ে অধিক উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন, যিনি এলেম ও পরহেজগারী, ত্যাগ ও কুরবানি এবং দ্বীনের ব্যাপারে দূরদর্শিতা ও সুক্ষ্ম বিচার বিবেচনায় সকলের উর্ধে। যিনি মসজিদের মধ্যে মুসলমানদের ইমামও হবেন এবং ব্যবহারিক জীবনেও তাদের পথ প্রদর্শক ও নেতা হবেন।

মৃত্যু শয্যা থেকে নবী পাক (সঃ) যখন মসজিদে যেতে অপারগ হন, তখন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)কে তিনি মনোনীত করেন যিনি সামগ্রিকভাবে গোটা উম্মতের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ঘরের মহিলাগণ দু'বার আপত্তি করে বলেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক অত্যন্ত নরমমনা লোক বলে নিজেকে সামলাতে পারবেন না। তথাপি নবী (সঃ) তিন বার বললেন, আবু বকর (রা)কে নামায পড়িয়ে দিতে বল। তারপর হযরত আবু বকর (রা) নামায পড়ান।

প্রকৃতপক্ষে নামায দ্বীনি যিন্দেগীর উৎস। নামাযের মধ্যে আল্লাহর দরবারে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী তিনিই যিনি এ মর্যাদার উপযুক্ত এবং সামগ্রিকভাবে দ্বীনি গুণাবলীতে সকলের চেয়ে অধিক মর্যাদাশীল, হযরত আবু মসউদ (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন–

মুসলমানদের ইমাম ঐ ব্যক্তি হতে পারেন যিনি সকলের চেয়ে অধিক কুরআন পাঠকারী। যদি এ গুণে সকলেই সমান হয়, তাহলে যিনি সকলের চেয়ে সুন্নাত ও শরীয়তের জ্ঞান রাখেন। যদি এ ব্যাপারেও সকলে সমান হন তাহলে যিনি সকলের আগে হিযরত করেছেন। এ ব্যাপারেও সকলে সমান হলে যাঁর বয়স সবচেয়ে বেশী–(মুসলিম)।

অধিক কুরআন পাঠকারী সেই ব্যক্তিকে বলে যার কুরআনের সাথে বিশেষ মহব্বত ও সম্পর্ক হবে। যিনি বেশী বেশী তেলাওয়াত করেন এবং কুরআনের

হাফেয, ভালভাবে কুরআন পড়তে পারেন। যিনি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে পারেন এবং যিনি কুরআনের দাওয়াত ও হিকমত উপলব্ধি করেছেন। এ গুণ যদি সকলের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানাতে হবে যিনি সুন্নাত ও শরীয়ত সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ এবং দ্বীনের আহকাম ও মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ।

হিজরতে অগ্রগামী হওয়ার অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি দ্বীনের পথে অগ্রগামী এবং ত্যাগ ও কুরবানীতে সকলের সেরা। এসব গুণাবলী সকলের মধ্যে সমানভাবে থাকলে যিনি সকলের চেয়ে বয়সে বেশী তাঁকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

ইমামতির মাসয়ালা

১. কোন মহিলার জন্যে জায়েয নয় যে, তিনি পুরুষের ইমামতি করবেন। হযরত জাবের (রা) বলেন, কোন মহিলা যেন কোন পুরুষের ইমামতি না করে একথা নবী (সঃ) বলেছেন।-(ইবনে মাজাহ)

২. যদি মহিলাদের ইমামতি মহিলা করেন তাহলে কাতারের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে আগে নয়।

৩. ইমামের জন্যে প্রয়োজন যে, মুক্তাদীগণের প্রয়োজন এবং অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে কুরআন পড়বেন এবং রুকূ সিজদা দীর্ঘ করবেন না। মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল না করে লম্বা লম্বা সূরা পড়া এবং লম্বা লম্বা রুকূ, সিজদা করা মাকরূহ তাহরীমি।

নবী (সঃ) বলেন-

তোমাদের কেউ যদি নামায পড়ায় তো তার উচিত হালকা নামায পড়াবে। এ জন্যে যে, মুক্তাদীদের মধ্যে অসুস্থও থাকে, দুর্বল লোকও থাকে এবং বুড়ো লোকও থাকে। তবে যদি একা নামায পড়ে তাহলে যতো লম্বা খুশী পড়তে পারে।-(বুখারী, মুসলিম)

হযরত মাআয (রা) এশার নামাযে লম্বা সূরা পড়তেন। তারপর নবী (সঃ)-এর নিকটে এ নিয়ে অভিযোগ করা হলো। নবী (সঃ) হযরত মাআযের উপর খুব রাগ করে বললেন-

মাআয তুমি কি মানুষকে ফেতনার মধ্যে জড়িত করতে চাও?

তারপর তিনি তাঁকে বলেন–وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ـ وَالضُّحٰى ـ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এ ধরনের সূরাগুলো পড়বে।–(বুখারী, মুসলিম)

নবী (সঃ) স্বয়ং নিজের বেলায় বলেন,

আমি নামায পড়াতে শুরু করলে মনে করি যে, নামায লম্বা পড়ি। কিন্তু আমার কানে বাচ্চাদের কান্নার আওয়ায পৌছলে নামায সংক্ষেপ করি। এ জন্যে যে, আমি জানি বাচ্চা কাঁদলে মায়ের মনে কত কষ্ট হয়।–(বুখারী)

৪. ইমামের তাকবীর মুক্তাদী পর্যন্ত পৌছাবার জন্যে মাঝখানে মুকাব্বের ঠিক করে দেয়া জায়েয, যে ইমামের তাকবীর শুনে তাকবীর বলবে এবং তার তাকবীর শুনে মুক্তাদীগণ রুকূ সিজদা ও নামাযের অন্যান্য আরকান আদায় করবে।

৫. ফাসেক, বদকার এবং বেদআতী লোককে ইমাম বানানো মাকরূহ তাহরীমি। তবে কোন সময় এমন লোক ছাড়া যদি আর কাউকে না পাওয়া যায়, তাহলে মাকরূহ হবে না।

৬. যে কোন ফেকাহর অনুসারী লোককে ইমাম বানানো এবং তার পেছনে নামায জায়েয। ইমামের নামায যদি তার ফেকাহর দিক দিয়ে সহীহ হয় তাহলে সকল মুক্তাদীর নামায সহীহ হবে তারা যে কোন ফেকাহর অনুসারী হোক না কেন।

৭. যদি কোন ব্যক্তি মাগবের, এশা অথবা ফজরের ফরয নামায একাকী পড়ে এবং কেউ এসে তার মুক্তাদী হয় তাহলে ঐ ইমামের জোরে জোরে কেরায়াত করা ওয়াজেব হবে। যদি সূরা ফাতেহা অথবা তার পরের সূরা সে পড়ে থাকে তথাপি উচ্চ শব্দে পুনরায় তা পড়তে হবে। কারণ এসব নামাযে ইমামের জন্যে উচ্চ শব্দে কেরায়াত করা ওয়াজেব। অবশ্যি সূরা ফাতেহা দুবার পড়ার জন্যে সুহু সিজদা করা ওয়াজেব হবে।

৮. এমন কোন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো মাকরূহ যার রোগের কারণে সাধারণত মানুষ ঘৃণা বোধ করে। যেমন কুষ্ঠ বা এ জাতীয় কোন রোগ হলে।

৯. এমন কোন সুশ্রী বালককে ইমাম বানানো মাকরূহ যার দাড়ি উঠেনি।

১০. যে ব্যক্তির ইমামতিতে মুক্তাদী সন্তুষ্ট নয় তার ইমামতি করা উচিত নয়। কওমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইমামতি করা মাকরুহ তাহরীমি।

১১. যদি কখনো কারো বাড়ীতে নামায পড়া হয় তাহলে বাড়ীর মালিকই ইমামতির হকদার। তবে তিনি নিজে কাউকে আগে বাড়িয়ে দিলে তাতে কোন দোষ নেই। তেমনি কোন মসজিদে নির্ধারিত ইমাম থাকলে তিনিই ইমামতির হকদার। তবে তিনি স্বয়ং অন্য কাউকে ইমাম বানালে দোষ হবে না।

১২. ইমামের নামায কোন কারণে নষ্ট হলে সকল নামাযীর নামায নষ্ট হয়ে যাবে, নামায নষ্ট হওয়ার বিষয় নামাযের মধ্যেই জানতে পারা যাক অথবা নামাযের পর। নামাযের পর জানতে পারা গেলে ইমামের জন্যে জরুরী হবে সকল মুক্তাদীকে তা জানিয়ে দেয়া যেন তারা পুনরায় নামায পড়তে পারে।

১৩. ইমামের দায়িত্ব এই যে, তিনি মুক্তাদীগণকে কাতার সোজা ও বরাবর করার জন্যে বলবেন যে, তারা যেন এসে অপরের সাথে মিলে গিয়ে দাঁড়ায় এবং দু'জনের মাঝে কোন ফাঁক না থাকে।

১৪. পুরুষ শুধু মেয়েদের ইমামতিও করতে পারে–এ অবস্থায় যে, মেয়েদের মধ্যে অবশ্যই কেউ তার মুহাররাম মেয়েলোক হতে হবে অথবা ঐসব মেয়েলোক ছাড়া একজন পুরুষ জামায়াতে শরীক হতে হবে।

মেশিনের সাহায্যে ইমামতি

টেপরেকর্ডে কোন ইমামের আওয়ায রেকর্ড করে অথবা গ্রামোফোনের সাহায্যে জামায়াতে নামাযের রেকর্ড তৈরী করে তার এক্তেদায় জামায়াতে নামায পড়া জায়েয হবে না। এমনিভাবে যদি কেউ রেডিওর সাহায্যে দূর দূরান্তর থেকে নামাযের ইমামতি করে তাহলে তার একতেদায় নামায জায়েয হবে না।[১]

---

১. আল্লামা মওদূদী (র) এক প্রশ্নের জবাবে এ প্রসংগে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

প্রশ্ন : রেডিও এমন একটি প্রচার মাধ্যম যা এক ব্যক্তির কথা ও শব্দ হাযার হাযার মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে গ্রামোফোনের রেকর্ডেও মানুষের আওয়ায সংরক্ষণ করা যায়। তারপর আবার বিশেষ পদ্ধতিতে তার পুনরাবৃত্তি করা যায়। এখন প্রশ্ন এই যে, যদি কোন ইমাম হাযার হাযার মাইল দূর থেকে রেডিওর সাহায্যে ইমামতি করে

পূর্ববর্তী পৃঃ টীকার অংশ

অথবা কোন গ্রামোফোন রেকর্ডে কোন আওয়ায সংরক্ষণ করে তা আবার পুনর্বার বাজানো যায়। তাহলে এসব যান্ত্রিক আওয়াযের এক্তেদা করে নামাযের জামায়াত করা কি জায়েয হবে?

জবাব : রেডিওতে এক ব্যক্তির ইমামতীতে দূর দূরান্তের লোকের নামায পড়া অথবা গ্রামোফোনের সাহায্যে নামাযের রেকর্ড বাজানো এবং তারপর তার এক্তেদা করে কোন জামায়াতের নামায পড়া নীতিগতভাবে সহীহ্ নয়। তার কারণগুলো যদি তলিয়ে দেখেন তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

ইমামের কাজ শুধু নামায পড়ানো নয়। বরঞ্চ তিনি এক দিক দিয়ে স্থানীয় জামায়াতের নেতা। তাঁর কাজ হচ্ছে এই যে, তিনি লোকের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন, তাদের চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং স্থানীয় অবস্থার প্রতি নযর রাখবেন। তারপর অবস্থা ও প্রয়োজনবোধে তাঁর খোতবার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন সুযোগে তাদের সংশোধনের ও হেদায়েত দানের দায়িত্ব পালন করবেন। এটা অবশ্যি অন্য কথা যে, অন্যান্য ব্যাপারের সাথে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানেরও অবনতি ঘটেছে। কিন্তু সকল অবস্থায় মূল প্রতিষ্ঠানকে তার প্রকৃত রূপে কায়েম রাখা প্রয়োজন। যদি রেডিওতে নামায শুরু হয় অথবা গ্রামোফোনের মাধ্যমে ইমামতি ও খোতবা দেয়ার কাজ নেয়া যেতে থাকে, তাহলে ইমামতির প্রকৃত প্রাণশক্তিই চিরদিনের জন্যে নষ্ট হয়ে যাবে।

নামায অন্যান্য ধর্মের মতো নিছক 'পূজা' নয়। অতএব তার ইমামতী থেকে ব্যক্তিত্বকে দূরীভূত করে দেয়া এবং তার মধ্যে 'যান্ত্রিকতা' সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে তার মর্যাদা ও মূল্য নষ্ট করে দেয়া।

তা ছাড়াও যদি কোন কেন্দ্রীয় স্থান থেকে কোন ব্যক্তি রেডিও অথবা গ্রামোফোনের সাহায্যে ইমামতি ও খোতবা দেয়ার কাজ করে এবং স্থানীয় ইমামতি খতম করে দেয়, তাহলে এটা এমন একটা কৃত্রিম সমরূপতা (Uniformity) হবে যা ইসলামের গণতান্ত্রিক প্রাণশক্তিকে (Spirit) বিনষ্ট করে দেবে এবং একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত করবে। এ জিনিস ঐসব ব্যবস্থাপনার মেযাজ-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যার দ্বারা সকল জনপদ ও অঞ্চলগুলোকে একটি কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং সকল লোককে একই নেতার সার্বিকভাবে অনুগত বানাবার নীতি অবলম্বন করা হয়। যেমন, ফ্যাসিজম এবং কমিউনিজম। কিন্তু ইসলাম একজন কেন্দ্রীয় ইমাম অথবা আমীরের কর্তৃত্বকে এতোটা সর্বব্যাপী বানাতে চায় না যাতে করে স্থানীয় লোকের কর্তৃত্ব একেবারে তার হাতে চলে যায় এবং স্বয়ং তাদের মধ্যে নিজের স্বার্থ সম্পর্কে চিন্তা করার, নিজেদের বিষয়াদি বুঝবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্যতার বিকাশ হতে পারবে না।

নবী (সঃ)-এর যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ (খায়রুল কুরুন)। তখন 'ইমাম' নিছক পূজারীর ভূমিকা পালন করতেন না যার কাজ শুধু কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা। বরঞ্চ তাঁরা স্থানীয় নেতা হিসেবে নিয়োজিত হতেন। তাঁদের কাজ ছিল তা'লীম ও তাযকিয়া

পূর্ববর্তী পৃঃ টীকার অংশ

এবং সমাজ ও তামাদ্দুনের সংস্কার-সংশোধন করা। স্থানীয় জামায়াতগুলো এ উদ্দেশ্যে তৈরী করতে হতো যে বড় ও কেন্দ্রীয় জামায়াতের কল্যাণ ও উন্নয়নে নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী তারা অংশগ্রহণ করবে। এ ধরনের মহান ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রেডিও অথবা গ্রামোফোনের দ্বারা কি করে পূর্ণ হতে পারে? যন্ত্র মানুষের বিকল্প কিছুতেই হতে পারেনা। বরঞ্চ সহায়ক হতে পারে, এসব কারণে আমি মনে করি 'যান্ত্রিক ইমামতি' ইসলামী প্রাণশক্তির একেবারে পরিপন্থী।-(রোসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৫৬-আবুল আ'লা মওদূদী)।

মুক্তাদীর হুকুম

১. মুক্তাদীর নামায সহীহ হওয়ার শর্ত এই যে, তাকেও নিয়ত করতে হবে এই বলে, "আমি এ ইমামের একতেদায় নামায পড়ছি।"

নিয়তের জন্যে এ জরুরী নয় যে, সে মুখের দ্বারা তা প্রকাশ করবে। মনে মনে ধারণা করাই যথেষ্ট।

২. মুক্তাদীর জন্যে জরুরী এই যে, সে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। মুক্তাদী একজন হলে ইমামের বরাবর দাঁড়াবে, আগে দাঁড়ালে নামায হবে না।

এতটুকুতেই আগে দাঁড়ানো হবে যদি তার পা ইমামের পা থকে এগিয়ে যায়।

৩. নামাযের যাবতীয় ফরয ও ওয়াজেবগুলোতে ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীর জন্যে ওয়াজেব। তবে নামাযের সুন্নাতগুলোতে ইমামের মতো করা জরুরী নয়। অতএব ইমাম যদি শাফেয়ী মতাবলম্বী হন এবং রুকুতে যেতে ও উঠতে 'রফে' ইয়াদাইন' করেন, তাহলে হানাফী মতাবলম্বী মুক্তাদীর এ সুন্নাতে ইমামের অনুসরণ ওয়াজেব হবে না। এমনিভাবে ফজরের নামাযে যদি দোয়া কুনুত পড়েন, তাহলে হানাফী মুক্তাদীর জন্যে তা পড়া জরুরী নয়। তবে বেতের নামাযের শাফেয়ী ইমাম রুকুর পরে দোয়াকুনূত পড়লে হানাফী মুক্তাদীর জন্যেও রুকুর পরে দোয়া কুনূত পড়া ওয়াজেব হবে। এ জন্যে যে, বেতের নামাযে কুনুত পড়া ওয়াজেব।

৪. জামায়াতে একজন মুক্তাদী হলে এবং সে বালেগ অথবা নাবালেগ ছেলে হোক, তাকে ইমামের ডান দিকে বরাবর অথবা একটু পেছনে হটে দাঁড়াতে হবে। ইমামের পেছনে অথবা বামে দাঁড়ালে মাকরুহ হবে। অবশ্যি মুক্তাদী কোন মহিলা হলে তাকে সকল অবস্থায় পেছনে দাঁড়াতে হবে।

৫. প্রথম কাতারে জায়গা থাকতে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানো মাকরুহ হবে। আর প্রথম কাতারে যদি জায়গা না থাকে তাহলে দ্বিতীয় কাতারে একা দাঁড়ানো মাকরুহ হবে[১] এমন অবস্থায় মুক্তাদীর উচিত হবে আগের

---

১. হযরত ওয়াবেসা বিন মা'বাদ (রা) বলেন, একবার নবী (সঃ) দেখলেন যে, এক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাই দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে। তখন নবী (সঃ) তাঁকে পুনরায় নামায পড়তে বললেন–(তিরমিযী, আবু দাউদ)।

কাতার থেকে এমন এক ব্যক্তিকে পেছনে টেনে আনা–যার সম্পর্কে এ বিশ্বাস থাকে যে, সে খারাপ মনে করবে না। আর যদি আগের কাতারে এ ধরনের কোন লোক পাওয়া না যায়, তাহলে অগত্যা একাই দাঁড়াবে।

৬. মুক্তাদীর জন্যে জরুরী যে, সে কেরায়াত ব্যতীত সকল আরকানে ইমামের সাথে শরীক থাকবে। যদি কোন রুকনে শরীক না হয় তাহলে নামায দুরস্ত হবে না। যেমন, ইমাম রুকুতে গেলেন এবং তারপর রুকু থেকে উঠলেন। কিন্তু মুক্তাদী রুকু করলো না, অথবা ইমামের রুকু থেকে উঠার পর রুকু করলো, তাহলে মুক্তাদীর নামায হবে না। তবে যদি মুক্তাদী কিছু বিলম্বে রুকুতে গেল অথবা একটু আগে গেল এবং তারপর ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হলো, তাহলে নামায সহীহ হবে।

মুক্তাদীর প্রকার

জামায়াতে শরীক হওয়ার দিক দিয়ে মুক্তাদী তিন প্রকারের, যথা– মুদরেক, মসবুক, লাহেক।

মুদরেক

যে নামাযী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বরাবর ইমামের সাথে নামাযে শরীক রইল তাকে মুদরেক বলে।

মসবুক

এক বা একাধিক রাকয়াত হয়ে যাওয়ার পর যে নামাযী জামায়াতে শরীক হয় তাকে মসবুক বলে।

লাহেক

লাহেক এমন নামাযীকে বলে, যে জামায়াতে শরীক হলো বটে, কিন্তু শরীক হওয়ার পর এক বা একাধিক রাক্য়াত নষ্ট হয়ে গেল–অযু যাওয়ার কারণে হোক, ঘুমিয়ে পড়ার কারণে হোক, পায়খানার জন্যে জামায়াতে শরীক থাকতে পারলো না অথবা কোন অসাধারণ কারণ বশত রুকু সিজদা করতে পারলো না।

মসবুকের মাসয়ালা

মসবুক জামায়াতে শরীক হয়ে প্রথমে ইমামের সাথে ঐসব বাকী নামায আদায় করবে যা সে ইমামের সাথে পাবে। তারপর ইমাম নামায শেষ করে

সালাম ফিরাবে, তখন মসবুক সালাম ফিরাবে না বরঞ্চ তার ছুটে যাওয়া রাক্‌য়াতগুলো আদায় করার জন্যে উঠে দাঁড়াবে। তারপর ছুটে যাওয়া রাক্‌য়াতগুলো একাকী নামাযীর ন্যায় আদায় করবে। অর্থাৎ কেরায়াতও করবে এবং ভুল হলে সিজদা সহুও করবে। এমন ক্রমানুসারে নামায পড়বে যে, প্রথমে কেরায়াত ওয়ালা রাক্‌য়াতগুলো পড়বে, তারপর কেরায়াত বিহীন রাক্‌য়াতগুলো। আর যেসব রাক্‌য়াত সে ইমামের সহিত পেয়েছে তার হিসাবে কা'দায় বসবে। যেমন ধরুন, যোহরের জামায়াতে এক ব্যক্তি তিন রাক্‌য়াত হয়ে যাওয়ার পর শরীক হলো। তাহলে সে ইমামের সাথে এক রাক্‌য়াত পড়ার পর উঠে দাঁড়াবে এবং ছুটে যাওয়া তিন রাক্‌য়াত এমনভাবে পড়বে যে, প্রথম রাক্‌য়াতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা মিলিয়ে পড়বে এবং কা'দা উলা (প্রথম বৈঠক) করবে। এ জন্যে এ রাক্‌য়াত তারপরও পুরা নামাযের হিসাবে দ্বিতীয় রাক্‌য়াত। তারপর দ্বিতীয় রাক্‌য়াতেও সূরা ফাতেহার সাথে সূরা মিলিয়ে পড়বে এবং তারপর কা'দা করবে না। এ জন্যে যে এ তার প্রাপ্ত রাক্‌য়াতগুলোর মধ্যে তৃতীয় রাক্‌য়াত হচ্ছে। তারপর তৃতীয় রাক্‌য়াতে সূরা ফাতেহার সাথে কোন সূরা পড়বে না। কা'দায়ে আখীরায় (শেষ বৈঠক) বসে নামায শেষ করে সালাম ফিরাবে।

লাহেকের মাসয়ালা

লাহেক প্রথমে ঐ রাক্‌য়াতগুলো আদায় করবে যা ইমামের সাথে পড়তে নষ্ট হয়েছে এবং এ রাক্‌য়াতগুলো লাহেক মুক্তাদীর মতো আদায় করবে। অর্থাৎ কেরায়াত করবে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি কোন এমন ভুল হয় যার জন্যে সহু সিজদা ওয়াজেব হয় তাহলে তাও করবে। তার এ ছুটে যাওয়া নামাযগুলো আদায় করার পর জামায়াতে শরীক হবে এবং বাকী নামায ইমামের সাথে পুরা করবে। আর ইত্যবসরে ইমাম যদি নামায শেষ করেন, তাহলে লাহেক বাকী নামায আলাদা শেষ করবে। যেমন ধরুন এক ব্যক্তি প্রথম থেকে ইমামের সাথে জামায়াতে শরীক আছে। তারপর এক রাক্‌য়াত পর তার অযু নষ্ট হয়ে গেল। তারপর সে চুপচাপ গিয়ে অযু করলো। এর মধ্যে ইমাম আর এক রাক্‌য়াত পড়ে ফেলেছেন। তাহলে এ সময়ে লাহেক তার ছুটে যাওয়া রাক্‌য়াতগুলো এমনভাবে আদায় করবে যেমন মুক্তাদী করে। অর্থাৎ কেরায়াত প্রভৃতি পড়বে না। এর মধ্যে যদি ইমাম জামায়াত শেষ করে ফেলেন তাহলে লাহেক তার বাকী রাক্‌য়াতগুলো আলাদা পড়ে নেবে।

নামাযে কেরায়াতের মাসয়ালা

১. কুরআন মজীদ সহীহ্ পড়া ওয়াজেব। সহীহ্ পড়ার অর্থ এই যে, প্রত্যেক অক্ষর ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে হবে অর্থাৎ ذ ج ظ ض ز ء ع ح প্রভৃতি অক্ষরগুলোর উচ্চারণে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। চেষ্টা করেও যদি কোন অক্ষর সহীহ্ উচ্চারণ না হয় তাহলে অপরাগই থাকতে হবে। কিন্তু বেপরোয়া হয়ে ভুল পড়া এবং সহীহ্ পড়ার অভ্যাস না করা বড়ো গুনাহ।

২. ফরয নামাযগুলোর প্রথম দু'রাকায়াতে সূরা ফাতেহার পর কোন সূরা অথবা বড়ো এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পড়া ওয়াজেব। বেতর, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাক্য়াতে সূরা ফাতেহার পর কোন সূরা অথবা এক বড়ো আয়াত অথবা তিন ছোটো আয়াত পড়া ওয়াজেব। ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাক্য়াতে সূরা ফাতেহার পর কোন সূরা পড়া চলবে না। শুধু ফাতেহা পড়ে রুকুতে যাবে।

৩. ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাক্য়াত বাদে সকল নামাযের প্রত্যেক রাক্য়াতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজেব তা ফরয হোক, ওয়াজেব, সুন্নাত অথবা নফল হোক।

৪. প্রথমে সূরা ফাতেহা এবং তারপর কোন সূরা অথবা তিন ছোটো আয়াত পড়া ওয়াজেব। যদি কেউ প্রথমে অন্য সূরা পড়ে এবং পরে সূরা ফাতেহা তাহলে ওয়াজেব আদায় হবে না।

৫. ফজর, মাগরেব, এশা, জুমা এবং দু'ঈদের নামায জাহরী।–অর্থাৎ মাগরেব এবং এশার প্রথম দু'রাক্য়াতে এবং বাকী সকল নামায ইমামের উচ্চস্বরে কেরায়াত করা ওয়াজেব। যদি ভুলে ইমাম আস্তে কেরায়াত করে তাহলে সিজদা সহু করার দরকার হবে। আর ইচ্ছা করে আস্তে পড়লে নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে।

৬. যোহর–আসর নামায 'সিররী' অর্থাৎ এ দু'নামাযে ইমাম এবং মুক্তাদির আস্তে আস্তে কেরায়াত করা ওয়াজেব। বেতরের নামাযেও একাকী পাঠকারীর জন্যে আস্তে কেরায়াত ওয়াজেব।

৭. যদি কেউ ফজর, মাগরেব ও এশা একাই পড়ে তার জন্যে উচ্চস্বরে কেরায়াত করা ভালো।

৮. ইমাম ফজর, মাগরেব ও এশার নামায কাযা পড়াচ্ছেন। তার জন্যেও উচ্চস্বরে কেরায়াত ওয়াজেব।

৯. যে সূরা প্রথম রাক্‌য়াতে পড়া হয়েছে তা আবার দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে পড়া জায়েয। কিন্তু এমন করা ভালো নয়।

১০. সিররী নামাযেও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে কেরায়াত করা জরুরী। খেয়াল করে মুখ বন্ধ করে মনে মনে পড়লে হবে না।

১১. কেরায়াত খতম হওয়ার পূর্বে রুকুর জন্যে ঝুঁকে পড়া এবং ঝুঁকে পড়া অবস্থায় কেরায়াত করা মাকরুহ।

১২. ফরয নামাযে ইচ্ছা করে কুরআনের ক্রমিক ধারার বিপরীত কেরায়াত করা মাকরুহ। যেমন, কেউ 'আল কাফেরুন' প্রথম রাকয়াতে পড়লো এবং দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে 'আলাম তারা'। ভুলে পড়লে মকরুহ হবে না। নফল নামাযে ইচ্ছা করেও কেউ ক্রমিক ধারা অবলম্বন না করলেও মাকরূহ হবে না।

১৩. একই সূরায় কয়েক আয়াত এক স্থান থেকে পড়া এবং দু'আয়াতের কম ছেড়ে দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে সামনে থেকে পড়া মাকরুহ। এভাবে যদি কেউ দু'সূরা এভাবে পড়ে যে, মাঝখানে এমন এক সূরা যার মধ্যে তিন আয়াত আছে তা ছেড়ে দিয়ে সামনের সূরা পড়ে, তাহলে মাকরুহ হবে। যেমন প্রথম রাক্‌য়াতে 'সূরা লাহাব' পড়লো এবং দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে 'আল ফালাক' পড়লো, মাঝ খানে 'কুলহু আল্লাহ ছেড়ে দিল, তাহলে মাকরুহ হবে। কিন্তু শুধু ফরয নামাযে এরূপ করা মাকরুহ –নফল নামাযে নয়।

১৪. এক রাক্‌য়াতে দু'সূরা এমনভাবে পড়া যে, মাঝখানে এক বা একাধিক আয়াত ছেড়ে দেয়া হলো তাহলে মাকরুহ। কিন্তু এটাও ফরয নামাযে মাকরুহ হবে–নফলে নয়।

১৫. যদি কারো কুরআনের কোন আয়াত মনে না থাকে। যেমন কেউ নতুন মুসলমান হয়েছে এবং সবে মাত্র নামায শুরু করেছে এবং তার কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত মুখস্ত হয়নি। তাহলে যতো তাড়াতাড়ি হোক তার মুখস্ত করা উচিত। এ সময় কেরায়াতের জায়গায় 'সুবহানাল্লাহ' অথবা 'আলহামদুলিল্লাহ' প্রভৃতি পড়বে। কিন্তু কুরআনের সূরা–আয়াত মুখস্ত করতে অবহেলা করলে গুনাহগার হবে।

নামাযের মসনূন কেরায়াত

১. সফর অবস্থায় সূরা ফাতেহার পর যে কোন সূরা পড়া যায় কিন্তু সফর ব্যতীত বাড়ীতে অবস্থানকালে ইমাম এবং একাকী নামাযী উভয়ের জন্যে নামাযে কিছু বিশেষ পরিমাণে সূরা পড়া সুন্নাত।

* ফজর এবং যোহর নামাযে সূরা 'হুজুরাত' থেকে সূরা 'বুরুজ' পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে পড়া সুন্নাত। এ সূরাগুলোকে 'তোওয়ালে মুফাসসাল' (طوال مفصل) বলে।

* আসর এবং এশার নামাযে সূরা 'তারেক' থেকে সূরা 'বাইয়্যেনাহ' পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে পড়া মসনূন। এ গুলোকে 'আওসাতে মুফাসসাল (اوساط مفصل) বলে।

* মাগরেবের নামাযে সূরা 'যিলযাল' থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে পড়া মসনূন। এগুলোকে বলে 'কেসারে মুফাসসাল।' (قصار مفصل)

২. কোন সূরা নিজের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে নেয়া শরীয়তের খেলাপ। অবশ্যি নবী (সঃ) যেসব নামাযে যেসব সূরা অধিকাংশ সময়ে পড়তেন সেসব নামাযে সেসব সূরা পড়া মসনূন।

* ফজরের সুন্নাতে নবী (সঃ) অধিকাংশ সময়ে প্রথম রাক্য়াতে সূরা 'কাফেরুন' এবং দ্বিতীয় রাক্য়াতে সূরা এখলাস' পড়তেন।

* বেতের নামাযে নবী (সঃ) প্রথম রাক্য়াতে সূরা 'আল আলা' এবং দ্বিতীয় রাক্য়াতে সূরা 'কাফেরুন' এবং তৃতীয় রাক্য়াতে সূরা 'এখলাস' পড়তেন।

* জুমার দিন ফজরের নামাযে তিনি প্রায়ই সূরা الم سجده এবং সূরা الدهرপড়তেন।

৩. জুমার নামাযে নবী (সঃ) প্রায়ই সূরা الاعلى এবং সূরা الغاشيه পড়তেন অথবা সূরা الجمعه এবং সূরা المنافقون পড়তেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) জুমার দিন ফজর নামাযে الم تنزيلএবং هل اتك আর জুমার নামাযে সূরা الجمعه এবং সূরা المنافقون পড়তেন।

৪. ফরয নামাযের প্রথম রাক্‌য়াতে কেরায়াত দ্বিতীয় রাক্‌য়াতের কেরায়াত থেকে লম্বা হওয়া উচিত। এ জন্যে নবী (সঃ) দ্বিতীয় রাক্‌য়াতের তুলনায় প্রথম রাক্‌য়াতে লম্বা সূরা পড়তেন–(বুখারী)।

৫. ফজরের নামাযে সকল নামাযের কেরায়াত থেকে লম্বা কেরায়াত করা উচিত। কারণ সে সময়ে মন ধীরস্থির থাকে এবং একাগ্রতাও হয়। উপরন্তু সকাল ও সন্ধ্যায় ফেরেশতাদের সম্মেলন হয়। প্রথম রাক্‌য়াতের কেরায়াত দ্বিতীয় রাক্‌য়াতের দেড়গুণ হওয়া উচিত।

সিজদায়ে তেলাওয়াত

কুরআনে পাকে এমন চৌদ্দটি স্থান আছে যা তেলাওয়াত করলে অথবা শুনলে এক সিজদা ওয়াজেব হয়ে যায়। নামাযে ইমামের নিকট থেকে শুনা হোক, অথবা স্বয়ং কেউ পড়ুক, নামাযের বাইরে কেউ তেলাওয়াত করুক বা শুনুক এবং পুরা আয়াত পড়া হোক বা শুনা হোক, অথবা শুধু সিজদার আয়াত পুর্বাপর মিলে পড়া হোক–সকল অবস্থায় সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজেবহবে।[১]

ইমামের পেছনে কেরায়াতের হুকুম

নামাযে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কেরায়াত দুরস্ত নয়। উচ্চ শব্দে ইমামের পেছনে কেরায়াত করা মাকরুহ তাহরীমি। এ জন্যে যে, এতে ইমামের কেরায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং নবী (সঃ) তা করতে নিষেধ করেছেন।

একবার তিনি ফজরের নামাযের পর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার পেছনে কেরায়াত করছিলে?

এক সাহাবী বললেন, জি হাঁ, আমি করছিলাম।

এরশাদ হলো–আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আমার সাথে কুরআন পড়তে ঝগড়া কর কেন?

ইমামের পেছনে নিঃশব্দে কেরায়াত করা মাকরূহ তো নয়, কিন্তু জরুরীও নয়। এ জন্যে যে, ইমামের কেরায়াত সকল মুক্তাদীর কেরায়াত বলে গণ্য করা হয়। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন–

---

১. সিজদা তেলাওয়াতের বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

যে ব্যক্তি কোন ইমামের পেছনে নামায পড়ছে তাহলে ইমামের কেরায়াত মুক্তাদীর কেরায়াত বলে গণ্য হবে।[১]

ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া

ইমাম যখন উচ্চশব্দে কেরায়াত করবেন, যেমন ফজর, এশা ও মাগরেব প্রভৃতি জাহ্‌রী নামাযগুলোতে, তখন মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া মাকরুহ। কিন্তু ইমাম যখন নিঃশব্দে কেরায়াত করবে, যেমন যোহর, আসর, তখন সুসমঞ্জস মতবাদ এই যে, মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া মুস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ (র)–ও সাবধানতা স্বরূপ মুক্তাদীর জন্যে সূরা ফাতেহা পড়া ভালো বলেছেন।[২] যেমন হেদায়া গ্রন্থকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد

(هدايه جلد اول – صفحه ٥٩ – ١١٠)

---

১. হাদীসে শব্দগুলো নিম্নরূপ :

مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ –

ইমাম মুহাম্মদ (র) তাঁর মুয়াত্তায় এ হাদীস দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন এবং উভয় রাবী অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এক সনদে ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অন্যটিতে মুসা ইবনে আবী আয়েশা (রহ)। আল্লামা ইবনে হাম্মাম বলেন, এ হাদীস সহীহ এবং বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী। আল্লামা আইনী বলেন, এ হাদীস সহীহ। এক তো আবু হানীফা, তিনিও আবু হানীফাই এবং অন্যজন মুসা ইবনে আবী আয়েশা (রহ)। তিনিও অত্যন্ত পরহেজগার এবং নির্ভরযোগ্য লোকের মধ্যে একজন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর নিকট থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

২. ইমাম মালেকের মতও তাই যে, সিররী নামাযগুলোতে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া মুস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল–সিররী, জেহরী উভয় নামাযেই মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া ফরয বলেছেন। আহলে হাদীসের অভিমতও তাই।

সিজদায়ে সহুর বয়ান

সহু অর্থ ভুলে যাওয়া। ভুলে নামাযের মধ্যে কিছু বেশী–কম হয়ে গেলে ত্রুটি–বিচ্যুতি হয় তা সংশোধনের জন্যে নামাযের শেষ বৈঠকে দু'টি সিজদা করা ওয়াজেব হয় তাকে বলে সিজদায়ে সহু।

সহু সিজদার নিয়ম

নামাযের শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতের' পর ডান দিকে সালাম ফিরাতে হবে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যেতে হবে। নামাযের অন্যান্য সিজদার নিয়মে দু'সিজদা করে আত্তাহিয়্যাত, দরুদ, প্রভৃতি পড়ে দু'দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে।

যেসব অবস্থায় সিজদা সহু ওয়াজেব হয়

১. ভুলে নামাযের কোন ওয়াজেব ছুটে গেলে, যেমন সূরা ফাতেহা পড়া ভুলে যাওয়া অথবা সূরা ফাতেহার পর কোন সূরা পড়তে ভুলে যাওয়া।

২. কোন ওয়াজেব আদায় করতে বিলম্ব হলে, ভুলে হোক কিংবা কিছু চিন্তা করতে গিয়ে হোক যেমন কোন লোক সূরা ফাতেহা পড়ার পর চুপ করে থাকলো। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার কোন সূরা পড়লো।

৩. কোন ফরয আদায় করতে বিলম্ব হলে অথবা ফরয আগে করা হলো। যেমন, কেরায়াত করার পর রুকু করতে বিলম্ব হলো[১] অথবা রুকুর আগেই সিজদা করা।

৪. কোন ফরয বার বার আদায় করা। যেমন দু'রুকু পর পর করা হলো।

৫. কোন ওয়াজেবের রূপ পরিবর্তন করা হলো। যেমন সিররী নামাযে জোরে কেরায়াত করা অথবা জাহরী নামাযে আস্তে কেরায়াত করা।

---

১. এখানে বিলম্বের অর্থ এই যে, এ সময়ের মধ্যে এক সিজদা বা রুকু করা যায়।

সহু সিজদার মাসয়ালা

১. নামাযের ফরযের কোনটি যদি স্বেচ্ছায় ছুটে যায় অথবা ভুলে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে কোন ওয়াজেব ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে নামায নষ্ট হবে। সিজদা সহ্ করলেও নামায সহীহ্ হবে না। নামায পুনরায় পড়তে হবে।

২. এক বা একাধিক ওয়াজেব ছুটে গেলে একই বার দু' সিজদা করলেই যথেষ্ট হবে। এমন কি নামাযের সকল ওয়াজেব ছুটে গেলেও দু' সিজদা যথেষ্ট, দু'য়ের বেশী সহ্ সিজদা করা ঠিক নয়।

৩. যদি কেউ ভুলে দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতেহার আগে আত্তাহিয়্যাত পড়ে তাহলে সহ্ সিজদা ওয়াজেব হবে না। কারণ ফাতেহার আগে আল্লাহ্র হামদ ও সানা পড়া হয় এবং আত্তাহিয়্যাতের মধ্যেও হামদ ও সানা আছে। তবে যদি কেরায়াতের পর অথবা দ্বিতীয় রাক্য়াতে কেরায়াতের আগে বা পরে আত্তাহিয়্যাত পড়লে সহ্ সিজদা ওয়াজেব হবে।

৪. ভুলে কোন 'কাওমা' বাদ পড়লে অথবা দু' সিজদার মাঝখানে জালসা না হলে সহ্ সিজদা করা জরুরী হয়।

৫. যদি কেউ কা'দা উলা করতে ভুলে যায় এবং বসার পরিবর্তে একেবারে উঠে দাঁড়ায়, তারপর মনে পড়লে যেন বসে না পড়ে। বরঞ্চ নামায পুরা করে নিয়ম মুতাবেক সহ্ সিজদা করবে। আর যদি পুরাপুরি না দাঁড়ায়, সিজদার নিকটে থাকে তাহলে বসে পড়বে। তখন সহ্ সিজদার দরকার হবে না।

৬. যদি কেউ দু' বা চার রাক্য়াত বিশিষ্ট ফরয নামাযে কা'দায়ে আখীরা[১] ভুলে গেল এবং বসার পরিবর্তে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। এখন যদি সিজদা করার আগে তার মনে হয় তাহলে বসেই নামায পুরা করে সহ্ সিজদা করবে। তাতেই ফরয নামায দুরস্ত হবে। যদি সিজদা করার পর মনে হয় যে, 'কা'দা' আখীরা করেনি, তাহলে আর বসবে না বরঞ্চ এক রাক্য়াত মিলিয়ে চার রাক্য়াত বা দু' রাক্য়াত পুরা করবে। এ অবস্থায় সিজদা সহুর দরকার নেই। এ রাক্য়াতগুলো নফল হয়ে যাবে। ফরয নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। মাগরেবের ফরযে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে পুনরায়

---

১. ফেকাহ্র পরিভাষাগুলো দ্রষ্টব্য–বইয়ের প্রথমে দেয়া আছে।

পঞ্চম রাক্‌য়াত পড়বে না। চতুর্থ রাক্‌য়াতে বসে নামায পুরা করবে। কারণ নফল নামায বেজোড় হয় না। নবী (সঃ) বলেন–

নফল নামাযের রাক্‌য়াত দুই দুই করে–(ইলমুল ফেকাহ)।

৭. সূরা ফাতেহা পড়া ভুলে গেলে অথবা দোয়া কুনুত ভুলে গেলে অথবা আত্তাহিয়্যাত পড়া ভুলে গেলে অথবা ঈদুল ফেতের–ঈদুল আযহার অতিরিক্ত তাকবীর ভুলে গেলে সহু সিজদা ওয়াজেব হবে।

৮. মাগরেব, এশা বা ফজরের জাহরী নামাযগুলোতে ইমাম যদি ভুলে কেরায়াত আস্তে পড়ে তাহলে সহু সিজদা ওয়াজেব হবে।

৯. ইমামের যদি কোন ওয়াজেব ছুটে যায় এবং সহু সিজদা ওয়াজেব হয় তাহলে মুক্তাদীকেও সহু সিজদা করতে হবে। আর মুক্তাদীর যদি কোন ওয়াজেব ছুটে যায় তাহলে না মুক্তাদীর সহু সিজদা ওয়াজেব হবে আর না ইমামের।

১০. সূরা ফাতেহার পর যদি কেউ সূরা মিলাতে ভুলে যায় অথবা সূরা প্রথমে পড়লো পরে সূরা ফাতেহা, তাহলে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়বে এবং শেষ কা'দার পর অবশ্যই সহু সিজদা করবে।

১১. যদি ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক্‌য়াতে অথবা এক রাক্‌য়াতে কেউ সূরা মিলাতে ভুলে যায়, তাহলে পরের রাক্‌য়াতগুলোতে সূরা মিলিয়ে সহু সিজদা করে নামায পুরা করবে।

১২. সুন্নাত অথবা নফল নামাযের মধ্যে সূরা মিলাতে কেউ যদি ভুলে যায় তাহলে সিজদা সহু অনিবার্য হবে।

১৩. যদি চার রাক্‌য়াত ফরয নামাযে কেউ শেষ রাক্‌য়াতে এত সময় পর্যন্ত বসলো যতোক্ষণে 'আত্তাহিয়্যাত' পড়া যায়। তারপর তার সন্দেহ হলো যে, এটা তার কাদায়ে উলা এবং সালাম ফেরার পরিবর্তে পঞ্চম রাক্‌য়াতের জন্যে উঠে দাঁড়ালো। এখন যদি সিজদা করার আগে তার মনে হয়, তাহলে বসে নামায পুরা করবে এবং নিয়ম মাফিক সহু সিজদা করবে এবং সালাম ফিরাবে। আর যদি পঞ্চম রাক্‌য়াতের সিজদা করে ফেলে তাহলে ষষ্ঠ রাক্‌য়াত মিলিয়ে নেবে এবং সহু সিজদা করে নামায পুরা করবে। এ অবস্থায় তার ফরয নামায সহীহ হবে আর অতিরিক্ত দু'রাক্‌য়াত নফল গণ্য হবে।

১৪. চার রাক্‌য়াত ফরয নামাযের শেষ দু'রাক্‌য়াতে কোন একাকী লোক বা ইমাম যদি সূরা ফাতেহা পড়া ভুলে যায়, তাহলে সিজদা সহু ওয়াজেব হবে না। তবে যদি সুন্নাত ও নফল নামাযে ভুলে যায় তাহলে সহু সিজদা ওয়াজেব হবে। এ জন্যে যে, ফরয নামাযের শেষের রাক্‌য়াতগুলোতে ফাতেহা পড়া ওয়াজেব নয়। সুন্নাত নফলের প্রত্যেক রাক্‌য়াতে সূরা ফাতেহা ওয়াজেব।

১৫. যদি কেউ ভুলে এক রাক্‌য়াতে দু'রুকু করে অথবা এক রাক্‌য়াতে তিন সিজদা করে অথবা সূরা ফাতেহা দু'বার পড়ে তাহলে সহু সিজদা ওয়াজেব হবে। কারণ সূরা ফাতেহা একবার পড়া ওয়াজেব।

১৬. যদি 'কাদায়ে উলাতে' আত্তাহিয়্যাতের পরে কেউ দরুদ পড়া শুরু করে এবং 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ' এর পরিমাণ পড়ে ফেলে অথবা এতটা সময় চুপচাপ বসে থাকে, তাহলে সহু সিজদা ওয়াজেব হবে।

১৭. যদি কোন মসবুক তার অবশিষ্ট নামায পুরা করতে গিয়ে কোন ভুল করে তাহলে শেষ বৈঠকে তার সহু সিজদা করা ওয়াজেব হবে।

১৮. কেউ যোহর অথবা আসরের ফরয নামাযের দু'রাক্‌য়াত পড়লো, কিন্তু মনে করলো যে, চার রাক্‌য়াত পড়েছে এবং তারপর সালাম ফিরালো। তারপর মনে হলো যে, দু'রাক্‌য়াত পড়েছে। তাহলে বাকী দু'রাক্‌য়াত পড়ে নামায পুরা করবে এবং সহু সিজদা করবে।

১৯. কারো নামাযে সন্দেহ হলো যে, তিন রাক্‌য়াত পড়লো, না চার রাক্‌য়াত তাহলে এ ধরনের সন্দেহ তার যদি এই প্রথম বার ঘটনাক্রমে হয়ে থাকে এবং সাধারণত এ ধরনের সন্দেহ তার হয় না, তাহলে সে পুনরায় নামায পড়বে। কিন্তু যদি তার প্রায়ই এরূপ সন্দেহ হয় তাহলে তার প্রবল ধারণা যেদিকে হবে সেদিকে আমল করবে। আর কোন দিকেই যদি ধারণা প্রবল না হয় তাহলে কম রাক্‌য়াতই ধরবে। যেমন কেউ যোহর নামাযে সন্দেহ হলো যে, তিন রাক্‌য়াত পড়লো না চার রাক্‌য়াত এবং কোন দিকেই তার ধারণা সুস্পষ্ট হচ্ছে না, তাহলে এমন অবস্থায় তিন রাক্‌য়াতই মনে করে বাকী এক রাক্‌য়াত পুরা করবে এবং সহু সিজদা দিবে।

২০. নামাযের সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব ছুটে গেলে সহু সিজদা দরকার হয় না। যেমন নামাযের শুরুতে সানা পড়তে কেউ ভুলে গেল, অথবা রুকু এবং সিজদার তসবিহ্‌ পড়তে ভুলে গেল, অথবা রুকুতে যেতে এবং উঠতে

দোয়া ভুলে গেল অথবা দরুদ শরীফ এবং তার পরের দোয়া ভুলে গেল, তাহলে সহু সিজদা ওয়াজেব হবে না।

২১. নামাযে যদি এমন ভুল হয় যার জন্যে সহু সিজদা ওয়াজেব কিন্তু সহু সিজদা না করেই নামায শেষ করা হলো। তারপর মনে হলো যে ভুলে সহু সিজদা দেয়া হয়নি। যদি মুখ কেবলার দিকে থাকে এবং কারো সাথে কথা বলা না হয় তাহলে সংগে সংগেই সহু সিজদা করে আত্তাহিয়্যাত ও দরুদের পর সালাম ফিরাবে।

২২. কেউ এক রাক্য়াতে ভুলে এক সিজদা করলো। এখন যদি কা'দায়ে আখীরায় আত্তাহিয়্যাত পড়ার আগে প্রথম রাক্য়াতে অথবা দ্বিতীয় রাক্য়াতে অথবা যখনই মনে হবে সিজদা করতে হবে এবং নিয়ম মাফিক সহু সিজদা দিতে হবে। যদি 'আত্তাহিয়্যাত' পড়ার পর সিজদার কথা মনে হয় তাহলে সিজদা আদায় করে পুনর্বার 'আত্তাহিয়্যাত' পড়তে হবে এবং সহু সিজদা করে কা'দা অনুযায়ী নামায পুরা করতে হবে।

২৩. সফরের মধ্যে কসর করা ওয়াজেব হবে। কিন্তু কেউ যদি ভুলে কসর না করে পুরা চার রাক্য়াত পড়লো, তাহলে এ অবস্থায় শেষ রাক্য়াতে নিয়ম মুতাবিক সহু সিজদা করা ওয়াজেব হবে। এ অবস্থায় এ নামায এভাবে সহীহ হবে যে, প্রথম দু'রাকায়াত ফরয এবং শেষ দু'রাক্য়াত নফল হবে।

কাযা নামায পড়ার বিবরণ

কোন ফরয অথবা ওয়াজেব নামায সময় মতো যদি পড়া না হয় এবং সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পড়া হলে তাকে কাযা পড়া বলে। ওয়াক্তের ভেতরেই পড়লে তাকে আদা' বলে।

কাযা নামাযের হুকুম

১. ফরয নামাযের কাযা ফরয এবং ওয়াজেব নামাযের (বেতর) কাযা ওয়াজেব।

২. মানত করা নামাযের কাযাও ওয়াজেব।

৩. নফল নামায শুরু করার পর ওয়াজেব হয়ে যায়। কোন কারণে নফল নামায নষ্ট হলে অথবা শুরু করার পর কোন কারণে যদি ছেড়ে দিতে হয়, তাহলে তার কাযা করা ওয়াজেব হবে।

৪. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং নফলের কাযা নেই। অবশ্য ফজরের সুন্নাত যেহেতু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং হাদীসে তার খুব তাকীদ রয়েছে, সে জন্যে যদি ফজরের ফরয এবং সন্নাত উভয়ই কাযা হয়ে যায় তাহলে দুপুরের আগে উভয়েরই কাযা পড়তে হবে। তারপর হলে শুধু ফরয কাযা পড়তে হবে। সুন্নাতের কাযা পড়তে হবে না। আর যদি ফজরের ফরয ওয়াক্তের মধ্যে পড়া হয় এবং সুন্নাত রয়ে যায় তাহলে বেলা উঠার পর থেকে দুপুরের আগে পর্যন্ত পড়া যায়। বেলা গড়ার পরে নয়। এছাড়া অন্য কোন সুন্নাত বা নফল ওয়াক্তের মধ্যে পড়তে না পারলে তার কাযা ওয়াজেব হবে না।

৫. যোহরের ফরযের আগে যে চার রাক্‌য়াত সুন্নাত তা যদি কোন কারণে পড়া না হয় তাহলে ফরযের পর পড়া যায়। ফরযের পর যে দু'রাক্‌য়াত যোহরের সুন্নাত আছে তার আগেও পড়া যায় এবং পরেও পড়া যায়। তবে যোহরের ওয়াক্ত চলে গেলে কাযা ওয়াজেব হবে না।

কাষা নামাযের মাসয়ালা ও হেদায়েত

১. বিনা কারণ ও ওযরে নামায কাযা করা বড় গুনাহ্‌। তার জন্যে হাদীসে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যদি অবহেলার জন্যে এমন ভুল হয় তাহলে খাঁটি দেলে তওবা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্যে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

২. কোন ন্যায়সংগত ওযর বা অক্ষমতার জন্যে নামায কাযা হলে তার গড়িমসি করা ঠিক নয়। যতো শীঘ্র সম্ভব কাযা আদায় করা উচিত। বিনা কারণে বিলম্ব করা গুনাহ। তারপর জীবনেরও তো কোন ভরসা নেই, সুযোগ নাও মিলতে পারে এবং এমন অবস্থায় মানুষ আল্লাহর কাছে হাযির হবে যে, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে বিলম্ব করে কাযা নামায পড়তে পারেনি।

৩. যদি কোন সময়ে কয়েকজনের নামায কাযা হয়ে যায় যেমন এক সাথে সফর করার সময় ওয়াক্তের মধ্যে নামায আদায় করা যায়নি, অথবা কোন মহল্লায় কোন দুর্ঘটনা হওয়ার কারণে সকলের নামায কাযা হয়ে গেল অথবা কয়েকজন ঘুমিয়ে রইলো এবং সকলের নামায কাযা হলো, এ অবস্থায় জামায়াতের সাথে কাযা আদায় করতে হবে। যদি সেররী নামায কাযা হয় তো কাযা জামায়াতের সেররী কেরায়াত করতে হবে। জাহরী হলে জাহরী কেরায়াত।[১]

৪. কোন এক ব্যক্তির নামায যদি কখনো কাযা হয়, তাহলে চুপে চুপে ঘরে কাযা পড়ে নেয়া ভালো। যদি অবহেলায় এ কাযা হয়ে থাকে তাহলে এ গুনাহ লোকের মধ্যে প্রকাশ করাও গুনাহ্‌। কোন অক্ষমতায় কাযা হয়ে গেলেও তা মানুষের কাছে প্রকাশ করা দোষণীয় এবং মাকরুহ। যদি মসজিদেও কাযা পড়া হয় তবুও মানুষকে জানতে দেয়া ঠিক নয়।

৫. কাযা নামায পড়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখনই স্মরণ হবে এবং সুযোগ হবে পড়ে নিতে হবে। তবে নিষিদ্ধ সময়গুলোতে মনে পড়লে অপেক্ষা করতে হবে। সে সময় উত্তীর্ণ হলে পড়তে হবে।

---

১. একবার নবী (সঃ) এর কাফেলা সফরে রাত ভর চললো এবং শেষ রাতে এক স্থানে তাঁবু গাড়লো। তারপর সকলে এমন ঘুমিয়ে পড়লেন যে, ফজরের নামাযের সময় চলে গেল, তবুও সকলে ঘুমিয়ে রইলেন। তারপর বেলা উঠলে রোদের গরমে সকলের ঘুম ভাঙলো। নবী (সঃ) তৎক্ষণাৎ আযান দেওয়ালেন এবং জামায়াতে ফজরের নামায আদায় করলেন।

৬. যদি এক সাথে কয়েক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়, তাহলে কাযা আদায় করতে বিলম্ব করা উচিত নয়। যত শীঘ্র সম্ভব কাযা পড়ে নিতে হবে। সম্ভব হলে একই ওয়াক্তে সমস্ত কাযা পড়ে নিতে হবে এটা জরুরী নয় যে, যোহারের কাযা যোহরের সময় আসরের কাযা আসরের সময় বরং একই সময় সব কাযা পড়ে নেয়া উচিত।

৭. কেহ অবহেলা করে দীর্ঘ দিন নামায পড়েনি। এভাবে মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর নামায না পড়ে কাটিয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তাকে তওবা করার সুযোগ দিলেন। তখন ঐ সমস্ত নামাযের কাযা তার উপর ওয়াজেব হবে। তওবা করলে আশা করা যায় নামায না পড়ার গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু যে নামায পড়া হয়নি তা মাফ হবে না। সে জন্যে সব কাযা পড়তে হবে।

৮. কারো যদি কয়েক মাস এবং বছর নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে তার উচিত কাযা নামায একটা অনুমান করে নিয়ে কাযা পড়া শুরু করবে। এ অবস্থায় কাযা পড়ার নিয়ম এই যে, সে যে ওয়াক্তের কাযা পড়তে চাইবে সে ওয়াক্তের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ওয়াক্তের সবচেয়ে প্রথম বা শেষ নামায পড়ছি। যেমন কাযা হওয়া নামাযের মধ্যে ফজরের নামাযের কাযা পড়তে চায়। তাহলে বলবে, ফজরের সবচেয়ে প্রথম অথবা শেষ নামায পড়ছি। এভাবে পড়তে থাকবে যাতে সকল কাযা নামায পুরা হয়ে যায়।

৯. সফরে যে নামায কাযা হবে তা মুকীম হয়ে পড়তে গেলে কসর পড়বে। তেমনি মুকীম অবস্থায় কাযা হলে সফরে তা পুরা পড়তে হবে।

১০. শুধু বেতেরের নামায কাযা হয়েছে এবং আর কোন কাযা নেই। তাহলে বেতরের কাযা পড়া ব্যতীত ফজরের নামায পড়া ঠিক হবে না। যদি বেতরের কাযা স্মরণ রাখা সত্ত্বেও প্রথমে ফজরের নামায পড়ে তারপর বেতর পড়ে তাহলে বেতরের পর পুনরায় ফজরের নামায পড়তে হবে।

১১. যদি কোন রোগ শয্যায় ইশারা করে নামায পড়া যেতো কিন্তু কিছু নামায কাযা হয়ে গেল। তাহলে এমন ব্যক্তির উচিত হবে যে, সে যেন তার ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করে যায় তার এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে কাযা নামাযের ফিদিয়া আদায় করে। এক কাযা নামাযের ফিদিয়া সোয়া সের গম অথবা আড়াই সের যব। এ সবের মূল্য দিলেও হবে।

১২. কোন রোগী যদি এতটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ইশারায় নামায পড়ারও শক্তি নেই অথবা বেহুঁশ হয়ে পড়লো এবং এভাবে ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গেল। তাহলে তার কাযা পুরা করা ওয়াজেব হবে না। তবে পাঁচ ওয়াক্তের পর যদি হুঁশ হয় তাহলে সব নামায কাযা পড়তে হবে।

১৩. যারা অজ্ঞাত কারণে জীবনের একটা অংশ অবহেলায় কাটিয়েছে এবং অসংখ্য নামায কাযা হয়েছে। তারপর তার যদি তওবার তৌফিক হয় তাহলে তার ছুটে যাওয়া নামাযগুলোর কাযা পড়ার সহজ পন্থা এই যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ফরয আদায় করার সাথে যেসব সুন্নাত এবং নফল সাধারণত পড়া হয়ে থাকে, সেগুলো সুন্নাত নফলের নিয়তে পড়ার পরিবর্তে ছুটে যাওয়া ফরয নামাযের কাযা হিসেবে পড়তে থাকবে। যতোক্ষণা না তার এ প্রবল ধারণা জন্মে যে, সব নামাযের কাযা পড়া হয়েছে ততোদিন পড়তে থাকবে। এটা খুবই ভুল যে, মানুষ পাঁচ ওয়াক্তের আদা ফরযের সাথে সুন্নাত নফল পড়বে কিন্তু ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করা অবহেলা করবে। ছুটে যাওয়া নামায কর্জের ন্যায়। এটা একেবারে অর্থহীন যে, কর্জ পরিশোধ করার কথা নেই, এদিকে দান খয়রাত চলছে। তবে ছুটে যাওয়া ফরয নামাযের কাযা পড়ার পুরাপুরি ব্যবস্থার সাথে সাথে যদি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে সুন্নাত--নফল পড়ে, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তাআলা কবুল করবেন।

১৪. জুমা নামাযের কাযা নেই। জুমা পড়তে না পারলে চার রাক্‌য়াত যোহর কাযা পড়তে হবে।

১৫. কোন ব্যক্তি ঈদের নামাযে ইমামের সাথে শরীক হলো। তারপর কোন কারণে তার নামায নষ্ট হয়ে গেল। এখন সে আর ঐ নামাযের কাযা পড়তে পারে না। কারণ ঈদের নামাযের কাযা নেই।[১] ওয়াক্তের মধ্যে একাও আদায় করতে পারে না। এ জন্যে যে, ঈদের নামাযের জন্যে জামায়াত শর্ত।

১৬. যদি ঈদুল ফেতের এবং ঈদুল আযহার নামায কোন কারণে প্রথম দিন পড়তে পারা না যায়, তাহলে ঈদুল ফেতেরের নামায পর দিন এবং ঈদুল আযহার নামায বারো তারিখ পর্যন্ত কাযা পড়া যায়।

---

১. আহলে হাদীসের মতে একাও ঈদের নামায পড়া যায়। ঈদগাহে যদি জামায়াত পাওয়া না যায় অথবা রোগী ঈদগাহে যেতে না পারে– তাহলে একা পড়তে পারে।

সাহেবে তরতীব এবং তার কাযা নামায

বালেগ হওয়ার পর যে মুমেন বান্দাহর কোন নামায কাযা হয়নি, অথবা জীবনে প্রথম এক বা দু'নামায কাযা হয়েছে, ক্রমাগত হোক অথবা মাঝে মাঝে হোক, অথবা প্রথমে কাযা হয়ে থাকলে তার কাযা পড়া হয়েছে এবং এখন তার এক দুই বা উর্ধে পাঁচ নামায কাযা আছে, এমন ব্যক্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'সাহেবে তরতীব' বলে। সাহেবে তরতীবের কাযা পড়ার ব্যাপারে দু'টি বিষয়ের লক্ষ্য রাখা জরুরী।

প্রথম এই যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা না পড়বে, সামনের ওয়াক্তের আদা নামায পড়তে পারবে না। যেমন কারো ফজর, যোহর, আসর, মাগরেব এবং এশা অর্থাৎ একদিন রাতের নামায কাযা হলো। এখন যতোক্ষণ না সে এ পাঁচ ওয়াক্তের কাযা পড়বে, ততোক্ষণ সামনের দিনের ফজর নামায পড়া তার জন্যে দুরস্ত হবে না। যদি জেনে বুঝেও পড়ে ফেলে, তাহলে তা আদায় হবে না, কাযা নামায আদায়ের পর ফজরের নামায তাকে পড়তে হবে। তবে যদি সাহেবে তরতীবের কাযা নামায পড়তে মনে না থাকে এবং ওয়াক্তের নামায পড়ে ফেলে সে তাহলে নামায পুনরায় পড়ার দরকার হবে না। বেতরের কাযারও তাই হুকুম অন্যান্য নামাযের মতো।

দ্বিতীয় কথা এই যে, কাযা হওয়া নামাযগুলো ক্রম অনুসারে পড়তে হবে। অর্থাৎ প্রথমে ফজরের নামায, তারপর যোহরের, তারপর আসরের, তারপর মাগরেবের এবং তারপর এশার। যদি সে ফজরের নামাযের আগে যোহর পড়ে ফেলে, তাহলে ফজরের নামায পড়ার পর যোহরের কাযা আবার পড়তে হবে। এমনি যোহরের নামাযের কাযা পড়ার আগে যদি আসর বা মাগরেবের কাযা পড়া হয়, তাহলে যোহরের কাযা পড়ার পর আবার আসর মাগরেব পড়তে হবে।

যার পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামায কাযা হয়, সে সাহেবে তরতীব নয়। কাযা নামায পড়ার জন্যে তার ক্রম অনুসারে পড়া ওয়াজেব হবে না। যখন সুযোগ পাবে এবং যে ওয়াক্তের নামায কাযা পড়তে চাইবে তা পড়তে পারবে। কাযা নামায পড়ার আগে আদা নামায পড়াও জায়েয। ক্রম অনুসারে পড়ার বাধ্যবাধকতা শুধু সাহেবে তরতীবের জন্যে।

অক্ষম ও রোগীর নামায

১. রোগ যতোই কঠিন হোক, যতোদূর সম্ভব নামায ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা উচিত। নামাযের সকল আরকান আদায় করার শক্তি না থাকে না থাক, যে আরকান আদায় করার শক্তি হোক, অথবা ইশরায় আদায় করার শক্তি হোক, তবুও নামায ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা উচিত।[১]

২. যথাসাধ্য দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। সমস্ত নামায দাঁড়িয়ে থেকে সম্ভব না হলে যতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হয় ততোক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। এমন কি কোন অক্ষম অথবা রোগী শুধু তাকবীর তাহরিমা বলার জন্যেও যদি দাঁড়াতে পারে, তাহলে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরিমা বলবে এবং তারপর বসে নামায পুরা করবে। দাঁড়িয়ে নামায পড়ার শক্তি থাকতে বসে পড়া দুরস্ত নয়।

৩. যদি কেউ দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কিছুতেই সক্ষম নয়, অথবা দুর্বলতার কারণে পড়ে যাওয়ার আশংকা হয়, অথবা দাঁড়ালে মাথা ঘুরে যায়, অথবা দাঁড়ালে ভয়ানক কষ্ট হয়, অথবা দাঁড়ালেও রুকূ' সিজদা করার শক্তি নেই এমন সকল অবস্থায় বসে নামায পড়বে।

৪. বসে নামায পড়া সম্ভব হলে মসনূন তরিকায় বসতে হবে যেমন 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার সময় বসা হয়। এভাবে বসা যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেভাবে বসা যায় সেভাবেই বসে নামায পড়বে। রুকূ' সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারা করে কাজ সারবে।

৫. ইশারায় রুকূ' সিজদা করতে হলে চোখ এবং মুখ দিয়ে ইশারা করা যথেষ্ট হবে না। মাথার দ্বারা ইশারা করতে হবে। রুকূ'তে একটু কম এবং সিজদাতে বেশী মাথা নত করতে হবে।

৬. সিজদা করার জন্যে মাটি পর্যন্ত কপাল ঠেকানো যদি না যায় তাহলে ইশারাই যথেষ্ট। বালিশ প্রভৃতি কপাল পর্যন্ত উঁচু করে তাতে সিজদা করা মাকরূহ।

---

১. দ্বীনের ফকীহগণ এতটা তাকীদ করেছেন যে, যদি কোন গর্ভবতী নারীর গর্ভবেদনা শুরু হয় এবং নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়, আর যদি সে নারীর হুশ-জ্ঞান থাকে, তাহলে দাঁড়িয়ে হোক বসে হোক যেমন করেই হোক তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নেবে। কারণ নেফাসের রক্ত আসার পর তো নামায কাযা হয়ে যাবে এবং নামায পড়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা কাযা করা কঠিন গুনাহ।

৭. বসে নামায পড়ার শক্তিও যদি না হয়, অথবা খুব কষ্ট হয় অথবা রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয়, অথবা ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ খুলে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে শুয়ে শুয়ে নামায পড়বে। শুয়ে শুয়ে নামায পড়ার উত্তম পন্থা এই যে, চিত হয়ে কেবলার দিকে পা করতে হবে। তবে পা সটান না করে হাঁটু উঁচু রাখতে হবে এবং মাথার নীচে বালিশ প্রভৃতি দিয়ে মাথা একটু উঁচু করতে হবে। তারপর ইশারায় রুকূ' সিজদা করবে। তাও সম্ভব না হলে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে কেবলার দিকে মুখ ফিরাতে হবে এবং ডান কাত হয়ে নামায আদায় করবে। তাও সম্ভব না হলে যেমন ভাবে সম্ভব হয় তেমনভাবে নামায পড়বে।

৮. রোগীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, ইশারায়ও নামায পড়া সম্ভব নয়। তাহলে নামায পড়বে না। ভালো হলে কাযা পড়বে। এমন অবস্থা যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশী সময় পর্যন্ত থাকে তাহলে তার কাযা ওয়াজেব হবে না। এ নামায মাফ হবে। অথবা দুর্বলতার জন্যে জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে এবং এ অবস্থা ছয় ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত চলে, তাহলে এসব নামাযের কাযা ওয়াজেব হবে না। ঠিক তেমনি কোন সুস্থ লোক যদি হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়ে এবং এভাবে ছয় ওয়াক্ত পর্যন্ত থাকে তাহলে এসব নামায তার মাফ।

৯. যদি নামায পড়া অবস্থায় হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারে, বসে পড়বে, বসে না পারলে শুয়ে, অথবা ইশারা করে। মোট কথা বাকী নামায যেভাবে পারে পড়বে।

১০. চলন্ত নৌকা, জাহায রেলগাড়ী বিমান প্রভৃতিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অসুবিধা হলে বসে পড়বে। অবশ্যি দাঁড়িয়ে পড়তে কোন অসুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে নামায পড়াই উচিত।

১১ সুস্থ অবস্থায় যদি কারো কিছু নামায কাযা হয় এবং তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে রোগ সেরে যাওয়া পর্যন্ত কাযা করার অপেক্ষা করবে না। অসুস্থ অবস্থায় যেমন করেই হোক কাযা পড়ে নিতে হবে।

১২. যদি কোন রোগীর বিছানা নাপাক হয়ে যায় এবং পাক বিছানা জোগাড় করা কঠিন অথবা বিছানা বদলানো সম্ভব নয়, তাহলে নাপাক বিছানায় নামায পড়া দুরস্ত হবে।

কসর নামাযের বয়ান

শরীয়ত মুসাফিরকে সফরে নামায সংক্ষিপ্ত করার সুযোগ দিয়েছে। অর্থাৎ যেসব নামায চার রাক্‌য়াতের তা দু'রাক্‌য়াত পড়বে। আল্লাহ্‌ বলেন–

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ (النساء: ١٠١)

–যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ করতে বেরুবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোন দোষ নেই–(নেসাঃ ১০১)।

নবীর এরশাদ হচ্ছে–

এ একটি সদকা যা আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে দান করেছেন, এ সদকা তোমরা গ্রহণ কর–(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি)।

কসর নামাযের হুকুম

আপন বস্তি বা জনপদ থেকে বের হওয়ার পর মুসাফিরের জন্যে নামায কসর পড়া ওয়াজেব। পুরা নামায পড়লে গুনাহগার হবে–(এলমুল ফেকাহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩০, দুররে মুখতার, প্রভৃতি)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন–আমি নবী (সঃ), আবু বকর (রা), ওমর (রা) এবং ওসমান (রা) এর সাথে সফর করেছি। আমি কখনো দেখিনি যে, তাঁরা দু'রাকয়াতের বেশী ফরয নামায পড়েছেন–(বুখারী, মুস–লিম)। কসর শুধু ঐসব নামাযে যা চার রাক্‌য়াত ফরয। যেমন যোহর, আসর ও এশা। যার মধ্যে দুই বা তিন রাক্‌য়াত ফরয, তাতে কোন কম করা যাবে না। ফজরের দু এবং মাগরেবে তিন রাক্‌য়াতই পড়তে হবে।

সফরে সুন্নাত এবং নফলের হুকুম

ফজর নামাযের সুন্নাত ত্যাগ করা ঠিক নয়। মাগরেবের সুন্নাতও পড়া উচিত, বাকী ওয়াক্তের সুন্নাতগুলো সম্পর্কে না পড়ার এখতিয়ার আছে। তবে

সফর চলতে থাকলে শুধু ফরয পড়া ভালো এবং সুন্নাত ছেড়ে দেবে। সফরের মধ্যে কোথাও কোথাও অবস্থান করলে পড়ে নেবে। বেতর পুরা পড়তে হবে- কারণ তা ওয়াজেব। সুন্নাত, নফল ও বেতরের নামাযের কসর নেই। বাড়ীতে যত রাক্য়াত, সফরেও তত রাক্য়াত পড়তে হবে।

কসরের দূরত্ব

যদি কেউ তার বাড়ী থেকে এমন স্থানে সফর করার জন্যে বের হয় যা তার বাড়ী বা বস্তি থেকে তিন দিনের দূরত্ব হয়, তাহলে তার কসর করা ওয়াজেব। তিন দিনের দূরত্ব আনুমানিক ছত্রিশ মাইল। যদি কেউ মধ্যম গতিতে দৈনিক পায়ে হেঁটে চলে তাহলে ছত্রিশ মাইলের বেশী যেতে পারবে না। সে জন্যে যদি কেউ অন্তত ছত্রিশ মাইল সফর করার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয় তা সে পায়ে হেঁটে তিন দিনে সেখানে পৌছুক অথবা দ্রুতগামী যানবাহনে কয়েক ঘন্টায়-পৌছুক সকল অবস্থায় তাকে নামায কসর পড়তে হবে।[১]

---

১. আল্লামা মওদূদী (র)-এর যে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার দ্বারা এ সত্যের প্রতি আলোকপাত করা হয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে সফর কাকে বলে। কোন এক ব্যক্তি আল্লামাকে প্রশ্ন করেছিলেন-

ইংরেজী মাইলের হিসাবে কত দীর্ঘ সফরে কসর নামায ওয়াজেব হবে? তার উত্তরে আল্লামা মওদূদী (র) বলেন, এ বিষয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কসর নামাযের জন্যে কমপক্ষে নয় মাইল এবং উর্ধে ৪৮ মাইল সফরের নেসাব নির্ণয় করা হয়েছে। মতভেদের কারণ এই যে, নবী পাক (সা)-এর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই সুস্পষ্ট নস্ (نص) বা উক্তির অবর্তমানে যেসব দলীলের ভিত্তিতে এস্তেবাত করা হয়েছে অর্থাৎ শরয়ী সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার মধ্যে মতান্তরের অবকাশ আছে। এটাই সঠিক একটা বিশেষ বিন্দু অতিক্রম করলেই সফরের হুকুম লাগাতে হবে, কসরের জন্যে এ ধরনের দূরত্ব নির্ধারণ শরীয়ত প্রণেতার অভিলাষ নয়। শরীয়ত প্রণেতা, সফর বলতে কি বুঝায় তা সাধারণভাবে প্রচলিত রীতিনীতির উপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এটা সহজে বুঝতে পারে যে, কখন সে সফরে এবং কখন নয়। এটা ঠিক যে, যখন আমরা শহর থেকে গ্রামের দিকে আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি অথবা গ্রাম থেকে শহরে বেচা-কেনার জন্যে যাই, তখন আমাদের মধ্যে মুসাফির হওয়ার অনুভূতি কখনো হয় না। পক্ষান্তরে প্রকৃতপক্ষেই যখন আমাদের সফর করতে হয় তখন স্বয়ং সফরের অবস্থা অনুভব করি। এ অনুভূতি অনুযায়ী কসর অথবা পুরা নামায পড়া যেতে পারে। খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, শরীয়তের ব্যাপারে সে ব্যক্তির মনের ফতোয়াই নির্ভরযোগ্য যে শরীয়ত মেনে চলার ইচ্ছা করে, বাহানা খুঁজে বেড়ায় না-(রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬৭)।

কসর শুরু করার স্থান

সফরে রওয়ানা হওয়ার পর মুসাফির যতোক্ষণ তার অধিবাসের ভেতর থাকে, ততোক্ষণ পুরা নামায পড়বে। অধিবাস বা বস্তির বাইরে চলে গেলে কসর পড়বে। বস্তির ষ্টেশন যদি তার বাসস্থানের ভেতর হয় তাহলে কসর পড়বে না, পুরা নামায পড়বে। আর যদি বাইরে হয় তাহলে কসর পড়বে।

কসরের মুদ্দৎ

মুসাফির যতোদিন তার 'ওয়াতনে আসলীতে' (পরিভাষা দেখুন) ফিরে না আসবে ততোদিন কসর পড়তে থাকবে। সফরকালে কোথাও যদি পনেরো দিন বা তার বেশী সময় অবস্থানের ইচ্ছা করে তাহলে সে স্থান তার 'ওয়াতনে একামত' (পরিভাষা দেখুন) বলে বিবেচিত হবে। 'ওয়াতনে একামতে' পুরা নামায পড়তে হবে। যদিও পনেরো দিন থাকার নিয়ত করার পর তার কম সময় সেখানে অবস্থান করে। আর কোন স্থানে পনেরো দিনের কম থাকার ইচ্ছা কিন্তু কোন কারণে সেখানে বার বার আটকা পড়ছে অর্থাৎ যাবে যাবে করেও যাওয়া হচ্ছে না তাহলে কসরই পড়বে। এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে যদি কয়েক মাস অতীত হয় তবুও সে স্থান 'ওয়াতনে একামত' বলে বিবেচিত হবে না এবং সেখানে কসরই পড়তে হবে।

কসরের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. যদি সফরকালে ভুলে কেউ চার রাকয়াত নামায পড়ে ফেলে এমনভাবে যে, দ্বিতীয় রাকয়াতে বসে 'আত্তাহিয়্যাত' পড়েছে, তাহলে সহু সিজদা করে নেবে। এ অবস্থায় দু'রাকয়াত ফরয এবং দু'রাকয়াত নফল হবে। এ নামায দুরস্ত হবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাকয়াতে বসে 'আত্তাহিয়্যাত' না পড়ে থাকে তাহলে এ চার রাকয়াত নফল হবে। কসর নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

২. সফরকালে যদি কয়েক স্থানে অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে–কোথাও পাঁচ দিন, কোথাও দশ দিন, কোথাও বার দিন, কোথাও পনেরো দিন থাকার ইচ্ছা নেই–তাহলে পুরা সফরে কসর পড়তে হবে।

৩. বিয়ের পর কোন মেয়ে মানুষ যদি স্থায়ীভাবে শ্বশুর বাড়ী থাকা শুরু করে, তাহলে তার 'ওয়াতনে আসলী' তখন ঐ স্থান হবে যেখানে সে তার স্বামীর সাথে থাকবে। এখন যদি সে এখান থেকে বাপের বাড়ী বেড়াতে

যায় এবং শ্বশুর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ির দূরত্ব যদি ৩৬ মাইল হয় তাহলে বাপের বাড়ীতে কসর পড়তে হবে। তবে হাঁ যদি শ্বশুর বাড়ী কয়েকদিনের জন্যে যায় এবং বাপের বাড়ী স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা হয় তাহলে বিয়ের আগে যেটা 'ওয়াতনে আসলী' ছিল, সেটাই তার ওয়াতনে আসলী থাকবে।

৪. কোন মহিলা যদি তার স্বামীর সাথে অথবা কোন কর্মচারী তার মালিকের সাথে অথবা কোন পুত্র তার পিতার সাথে সফর করে, অর্থাৎ সফরকারী যদি এমন কোন ব্যক্তি হয় যে, অপরের অধীন এবং অনুগত, তাহলে এ অধীন ব্যক্তির ইচ্ছা বা নিয়ত মূল্যহীন হবে। এ অবস্থায় সে মহিলা, অথবা কর্মচারী অথবা পুত্র যদি কোথাও পনেরো দিন থাকার নিয়তও করে তথাপি সে মুকীম হতে পারবে না, যদি তার স্বামী অথবা মুনিব অথবা পিতা ১৫ দিনের নিয়ত না করে।

৫. মুকীম মুসাফিরের পিছনে নামায পড়তে পারে। মুসাফির ইমামের উচিত হবে ঘোষণা করে দেয়া যাতে করে ইমাম দু'রাকয়াত পড়ে সালাম ফিরালে মুকীম মুক্তাদী যেন উঠে বাকী দু'রাকয়াত পুরা করতে পারে।

৬. মুসাফিরের জন্যে কুকীম ইমামের পেছনে নামায পড়া দুরস্ত আছে। এ অবস্থায় ইমামের অনুসরণে চার রাকয়াত ফরযই পড়বে, কসর করবে না।

৭. যদি কেউ কোথাও অবস্থান সম্পর্কে কিছু ঠিক করেনি অথবা ১৫ দিনের কম নিয়ত করেছে কিন্তু নামাযের মধ্যে ১৫ দিনের বেশী থাকার নিয়ত করলো, তাহলে সে ব্যক্তি নামায পুরা পড়বে, কসর করবে না।

৮. সফরে যেসব নামায কাযা হবে বাড়ী ফেরার পর তা কসর কাযা পড়বে। ঠিক তেমনি বাড়ী থাকাকালীন কিছু নামায কাযা হলো এবং হঠাৎ সফরে যেতে হলো, তাহলে সফরে কাযা নামায পুরাই পড়তে হবে কসর পড়বেনা।

সফরে একত্রে দু'নামায

হজ্জের সফরের মধ্যে 'জময়ো বাইনাস সালাতাইন' অর্থাৎ দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া মসনূন। ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসরের নামায যোহরের ওয়াক্তে একত্রে পড়া হয়। আযান একবার দেয়া হয় এবং একামত উভয় নামাযের জন্যে পৃথক পৃথক দেয়া হয় যেহেতু আসরের নামায নির্দিষ্ট সময়ের আগে পড়া হয় সে জন্যে মানুষকে জানিয়ে দেয়ার জন্যে একামত পৃথকভাবে দেয়া হয়।

তারপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মুযদালফার দিকে হাজীগণ রওয়ানা হন। এবং মুযদালফায় পৌছে মাগরেব এবং এশার নামায একত্রে পড়েন। কেউ যদি মুযদালফার পথে মাগরেব পড়েন তাহলে তা দুরস্ত হবে না তা পুনরায় পড়তে হবে।

হজ্জের সফর ব্যতীত অন্য কোন সফরে একত্রে দু'নামায জায়েয নয়। অবশ্য 'জময়ে' সূরী' (পরিভাষা দ্রঃ) জায়েয। জময়ে সূরী অর্থ এই যে, প্রথম নামায বিলম্ব করে শেষ ওয়াক্তে পড়া এবং দ্বিতীয় নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়া। এভাবে প্রকাশ্যত এটাই মনে হবে যে, দু'নামায একত্রে পড়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'টি নামায তাদের আপন আপন ওয়াক্তেই পড়া হচ্ছে।[১]

---

১. আহলে হাদীসের নিকটে প্রত্যেক সফরে একত্রে দু'নামায জায়েয। শুধু জময়ে সূরীই জায়েয নয়, বরঞ্চ 'জময়ে' হাকীকিও'। জময়ে হাকীকির অর্থ এই যে, দু'ওয়াক্তের নামায একসাথে একই ওয়াক্তে পড়া। তার দু'টি উপায় ঃ-

* এক এই যে, দ্বিতীয় নামাযের সময় হওয়ার পূর্বেই প্রথম নামাযের ওয়াক্তে এক সাথে পড়ে নেয়া। যেমন বেলা গড়ার পর যোহরের ওয়াক্তে যোহরের নামাযের সাথে আসরের নামায পড়া। একে জময়ে' তাকদীম বলে।

* দ্বিতীয় এই যে, প্রথম নামায বিলম্ব করে দ্বিতীয় নামাযের ওয়াক্তে দুই নামায একত্রে পড়া। যেমন, যোহরের নামায বিলম্ব করে আসরের ওয়াক্তে যোহর এবং আসরের নামায একত্রে পড়া। একে জময়ে' তা'খীর বলে। আহলে হাদীসের মতে জময়ে' সূরী, জময়ে তাকদীম এবং জময়ে তা'খীর তিনটিই জায়েয। প্রয়োজন অনুসারে মুসাফিরের যাতে সুবিধা হয়, তার উপর আমল করবে। সফর চলা কালেও তা করা যেতে পারে এবং কোথাও অবস্থানকালেও করা যেতে পারে। এ সবই সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে।

পূর্ববর্তী পৃঃ টীকার অংশ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) সফরকালে ঘরে থাকতেই যদি বেলা গড়ে যেতো, তাহলে প্রথমে তিনি যোহর এবং আসরের নামায একত্রে পড়ে তারপর রওয়ানা হতেন। আর যদি ঘরে থাকতে বেলা না গড়াতো তাহলে তিনি যাত্রা শুরু করতেন এবং যখন আসরের ওয়াক্ত হতো তখন যোহর এবং আসর একত্রে পড়তেন। ঠিক এমনি রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যদি ঘরে থাকতেই বেলা ডুবে যেতো তাহলে তিনি মাগরেব এবং এশা একত্রে পড়ে রওয়ানা হতেন। আর যদি ঘরে থাকতে বেলা না ডুবতো তাহলে তিনি বেরিয়ে পড়তেন এবং যখন এশার সময় হতো তখন সওয়ারী থেকে নেমে মাগরেব এবং এশা একত্রে পড়তেন-(মুসনাদে আহমদ)।

হযরত মাআয বিন জাবাল (রা) তবুকের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

নবী (সঃ) তবুক অভিযানকালে সূর্য গড়ার পূর্বে যাত্রা শুরু করতে চাইলে যোহর নামায বিলম্বিত করে আসরের সাথে একত্রে পড়তেন। আর যদি বেলা গড়ার পর রওয়ানা হতেন তাহলে যোহরের ওয়াক্তে যোহর এবং আসর নামায একত্রে পড়তেন এবং তারপর যাত্রা শুরু করতেন। সূর্য ডোবার আগে রওয়ানা হলে মাগরেব নামায বিলম্বিত করে এশার নামাযের সাথে পড়তেন। বেলা ডোবার পরে রওনা হলে এশার নামায মাগরেব নামাযের সাথে মিলিয়ে পড়তেন (তিরমিযী)।

জুমার নামাযের বিবরণ

জুমার দিনের ফযীলত

আল্লাহ্‌র নিকটে জুমার দিন সমস্ত দিনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ দিনের মধ্যে ছয়টি এমন বিশিষ্ট গুণের সমাবেশ রয়েছে যা অন্য দিনগুলোর মধ্যে নেই, এ জন্যে দিনটিকে বলা হয় জুমা (বহুর সমাবেশ)। প্রথম বিশিষ্ট গুণ এই যে, এ দিনে মুসলমানদের বিরাট সমাবেশ হয়। কোন কেন্দ্রীয় স্থানে তারা আল্লাহ্‌র যিকির ও এবাদতের জন্যে একত্র হয় এবং এক বিরাট জামায়াতে জুমার নামায আদায় করে। এ জন্যে নবী (সঃ) এ দিনকে মুসলমানদের ঈদের দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] জাহেলিয়াতের যুগে আরববাসী এ দিনটিকে 'ইয়াওমে আরোবা' বলতো। ইসলামে যখন এ দিনটি মুসলমানদের সম্মেলনের দিন নির্ধারণ করা হলো তখন তার নাম রাখা হলো 'জুময়া'। জুময়া আসলে একটি ইসলামী পরিভাষা। ইহুদীদের শনিবার ছিল এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট। কারণ ঐদিন আল্লাহ্ বনী ইসরাইলকে ফেরাউনের গোলামী থেকে রক্ষা করেন। ঈসায়ীগণ নিজেদেরকে ইহুদীদের থেকে আলাদা করার জন্যে রবিবার দিনকে নিজেরাই নির্ধারণ করে। অথচ এর কোন নির্দেশ না হযরত ঈসা (আ) দিয়েছেন, আর না ইঞ্জিলে এর কোন উল্লেখ আছে। ঈসায়ীদের আকীদাহ এই যে, শুলে জীবন দেয়ার পর হযরত ঈসা (আ) কবর থেকে উঠে আসমানে চলে যান। সেটা ছিল রবিবার। অতপর ৩২১ খৃষ্টাব্দে রোমীয় সাম্রাজ্য এক সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে এ দিনটিকে ছুটির দিন বলে নির্ধারিত করে। ইসলাম এ দু'টি মিল্লাত থেকে মুসলিম মিল্লাতকে আলাদা করার জন্যে এ দু'টি দিন বাদ দিয়ে জুমার দিনকে সামষ্টিক এবাদতের জন্যে গ্রহণ করে। এর ভিত্তিতেই এ দিনটিকে মুসলমানদের ঈদের দিন বলা হয়। এছাড়া অন্য পাঁচটি গুণ বা সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী (সঃ) বলেন –

---

১. একবার জুমার খুৎবা দেয়া কালে নবী (সঃ) বলেন, –মুসলমানগণ! আজ এমন একদিন যাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে ঈদের দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ জন্যে তোমরা এদিনে গোসল কর, যার খুশবু সংগ্রহ করা সম্ভব, সে তা ব্যবহার করবে। এদিনে তোমরা অবশ্যই মিসওয়াক করে দাঁত–মুখ পরিষ্কার করবে– (মোয়াত্তা, ইবনে মাজাহ)।

জুমার দিন সকল দিনগুলোর মধ্যে উৎকৃষ্টতম এবং বৈশিষ্টপূর্ণ। আল্লাহর নিকটে সকল দিনগুলো থেকে এর মর্যাদা অধিক। এমন কি এ দিনের মর্যাদা ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফেতের থেকেও বেশী। এ দিনের পাঁচটি এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য দিনগুলোর মধ্যে নেই তা হলো ঃ–

১. এদিন আল্লাহ আদম (আ)কে পয়দা করেন।

২. এ দিনে আল্লাহ্ হযরত আদম (আ) কে দুনিয়ায় তাঁর খলীফা করে পাঠান।

৩. এ দিনে তাঁর এন্তেকাল হয়।

৪. এ দিনে এমন এক বিশিষ্ট সময় আছে যখন বান্দাহ আল্লাহ্র কাছে যে হালাল এবং পাক জিনিস চায় তা তিনি অবশ্যই তাকে দেন।

৫. আর এ দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ, আসমান, যমীন, বায়ু, পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র এমন কিছু নেই যা জুমার দিনের জন্যে ভীত ও কম্পিত হয় না–(ইবনে মাজাহ্)

নবী (সঃ) আরও বলেন–

দুনিয়াতে আমাদের আগমন সকলের শেষে হয়, কিন্তু কেয়ামতের দিনে আমরা সকলের আগে বেহেশতে যাব। এসব ইহুদী নাসারাদেরকে আমাদের পূর্বে কেতাব ও হেদায়েত দেয়া হয়েছিল এবং আমাদেরকে পরে। তাদের সকলের উপরেই জুমার শ্রদ্ধা ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এতে মতভেদ করলো এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে এর উপর অটল থাকার তওফীক দেন। এ জন্যে তারা সকলে আমাদের পিছনে থাকবে। ইহুদী আগামীকালকে (শনিবার) শ্রদ্ধা করে এবং নাসারা আগামী পরশু দিনের (রবিবার) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে– (বুখারী, মুসলিম)।

নবী (সঃ) জুমার আয়োজন বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু করতেন এবং বলতেন–

জুমার রাত সাদা রাত এবং জুমার দিন উজ্জ্বল দিন (মিশকাত)।

ইমাম গাজ্জালী (র) বলেন, জুমার দিনের প্রেরণা ও বরকত তারাই লাভ করে যারা তার প্রতীক্ষার সময় কাটাতে থাকে। আর অবহেলাকারীগণ বড়ই হতভাগ্য যাদের এ কথা জানা নেই যে, কখন জুমা এলো, তারা মানুষকে জিজ্ঞেস করে, 'আজ কোন্ দিন'?–(এহইয়াউল উলুম)।

জুমার নামাযের অপরিহার্যতা

জুমা ফরয হওয়ার হুকুম হিজরতের পূর্বে মক্কায় হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্যে সামষ্টিক এবাদত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং নবী (সঃ) তার উপর আমল করতে পারেননি। অবশ্যি তাঁর পূর্বে যাঁরা হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেছিলেন, তাঁদের সরকার হযরত মাসয়াব বিন উমাইর (রা) কে নবী (সঃ) লিখিত নির্দেশ দেন-

فَاِذَا مَالَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَتَقَرَّبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى -

জুমার দিন যখন বেলা দুপুর গড়ে যায়, দু'রাক্য়াত নামায পড়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ কর। এ হুকুমনামা পেয়ে মাসয়াব বিন উমাইর (রা) বার জন লোক নিয়ে মদীনায় প্রথম জুমা পড়েন-(দারে-কুতনী)।

হযরত কা'ব বিন মালেক (রা) এবং ইবনে সিরীন (রা) বলেন, তারও পূর্বে মদীনার আনসারগণ নিজেরাই পরামর্শ করে স্থির করেন যে, সপ্তাহে একদিন সকলে মিলে সামষ্টিক এবাদত করবেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ইহুদীদের শনিবার এবং নাসারাদের রোববার বাদ দিয়ে জুমার দিন নির্বাচন করেন এবং মদীনায় প্রথম জুমা আসয়াদ বিন যেরারাহ (রা) বিয়াযা অঞ্চলে ১৪০ জন লোক নিয়ে আদায় করেন-(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

তারপর নবী (সঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, তখন পথে চারদিন কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। পঞ্চম দিনে সেখান থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। যখন তিনি বনী সালেম বিন আওফের স্থানে পৌঁছেন তখন জুমার ওয়াক্ত হয়। সেখানে তিনি প্রথম জুমা পড়েন-(ইবনে হিশাম)।

জুমার নামাযের হুকুম, ফযীলত ও গুরুত্ব

জুমার নামায ফরযে আইন। কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা ইহার ফরয হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত। উপরন্তু ইসলামের প্রতীক হিসেবেও তার বিরাট মর্যাদা। এর ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত। অবহেলা করে তা পরিত্যাগ করলে সে ফাসেক হয়ে যাবে।

কুরআন বলে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(الجمعه : ٩)

মুমেনগণ, যখন জুমার দিনে জুমার নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্যে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা বন্ধ করে দাও। এ তোমাদের জন্যে ভালো, যদি তোমরা বুঝে সুঝে কাজ কর।

আল্লাহ্‌র যিকির বলতে খোতবা এবং নামায বুঝানো হয়েছে। দৌড়ানোর অর্থ পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে এবং মনোনিবেশ সহকারে যত শীঘ্র সম্ভব মসজিদে পৌঁছাবার চেষ্টা করা। এ অসাধারণ তাকীদের মর্ম এই যে, অন্যান্য নামায তো জামায়াত ব্যতীতও হতে পারে, ওয়াক্ত চলে গেলে কাযা করা যেতে পারে। কিন্তু বিনা জামায়াতে জুমার নামায হবে না এবং সময় চলে গেলে এর কাযাও নেই। এ জন্যে আযান শুনার পর যাদেরকে মুমেন বলে সম্বোধন করা হচ্ছে তাদের কোন বেচা-কেনার অথবা অন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকা কিছুতেই জায়েয নয়। প্রকৃতপক্ষে এ সময়টুকু আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড়ানো ও সিজদা করা এবং আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল থাকার চিরন্তন ফায়দা দুনিয়ার ব্যস্ততার সাময়িক ও স্থিতিহীন ফায়দার চেয়ে লক্ষ গুণে বেশী। তবে শর্ত এই যে, মানুষ জেনে বুঝে পূর্ণ অনুভূতির সাথে যেন এ কাজ করে।

নবী পাক (সঃ) বলেন –

* জুমার নামায জামায়াতসহ প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয। শুধু গোলাম, স্ত্রীলোক, নাবালেগ এবং রোগীর জন্যে নয়-(আবু দাউদ)।

* যে আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তার উপর জুমার নামায অপরিহার্য। তারপর সে যদি কোন খেলা-ধূলা তামাসা অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে এ নামায থেকে বেপরোয়া হয় তাহলে আল্লাহ্ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন কারণ তিনি পাক ও অমুখাপেক্ষী-(দারে-কুতনী)।

* যদি কেউ বিনা কারণে জুমার নামায ত্যাগ করে তার নাম মুনাফেক হিসাবে এমন এক কেতাবে লিপিবদ্ধ করা হবে যা কিছুতেই মিটানো যাবে না, আর না পরিবর্তন করা যাবে-(মিশকাত)।

* আমার মন বলছে যে, আমার বদলে আর কাউকে নামায পড়াতে দেই আর নিজে ঐ সব লোকের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেই যারা জুমার নামাযে না এসে বাড়ী বসে আছে -(মুসলিম)।

* হযরত ইবনে ওমর (রা) এবং হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেছেন যে, তাঁরা নবী (সঃ) কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে শুনেছেন-

লোকের উচিত যে, তারা যেন জুমার নামায ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে; নতুবা আল্লাহ্ তাদের দিলে মোহর মেরে দেবেন। তারপর তারা অবহেলায় মগ্ন হয়ে থাকবে-(মুসলিম)।

* যে ব্যক্তি জুমার নামাযের আযান শুনলো অতপর নামাযে এলো না, তারপর দ্বিতীয় জুমার আযান শুনেও এলো না এবং এভাবে ক্রমাগত তিন জুমায় এলো না তার দিলে মোহর মেরে দেয়া হয় এবং তার দিলকে মুনাফিকের দিলে পরিণত করা হয়-(তাবারানী)।

আল্লামা সারাখসী বলেন-

জুমা কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে ফরয এবং ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের এজমা প্রতিষ্ঠিত-(মবসূত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২)।

আল্লামা ইবনে হাম্মাম বলেন-

জুমা এমন এক ফরয যা ফরয করেছে কুরআন এবং সুন্নাহ। যে ব্যক্তি এ অস্বীকার করবে তার কুফরীর উপর উম্মতের এজমা রয়েছে-(ফতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-

যে ব্যক্তি অবহেলা করে ক্রমাগত কয়েক জুমা ত্যাগ করবে সে ইসলামকে পিছনে নিক্ষেপ করলো-(এলমুল ফেকাহ)।

নবী (সা) জুমার প্রেরণা দিতে গিয়ে তার ফযিলত বর্ণনা করে বলেন-

যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করলো, তার পাক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পুরাপুরি ব্যবস্থা করলো, তারপর তেল এবং খুশবু লাগালো এবং বেলা পড়ার সাথে সাথে আউয়াল ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে পৌঁছলো এবং দু'জনকে পরস্পর থেকে হটিয়ে দিল না অর্থাৎ তাদের কাঁধ ও মাথার উপর দিয়ে কাতার ডিঙ্গিয়ে অথবা দু'জন বসে থাকা লোকের মাঝখানে গিয়ে বসে পড়ার ভুল করলো না, বরঞ্চ যেখানে জায়গা পেলো সেখানেই চুপচাপ বসে পড়লো এবং

সুন্নাত নামায প্রভৃতি পড়লো যা আল্লাহ্ তার অংশে লিখে রেখেছেন, তারপর খতীব যখন মিম্বরে এলেন তখন নীরবে বসে খোতবা শুনতে লাগলো তাহলে এমন ব্যক্তির ঐ সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে যা সে বিগত জুমা থেকে এ জুমা পর্যন্ত করেছে-(বুখারী)।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন জুমায় আগমনকারীদের তিন প্রকার ভূমিকা হয়ে থাকে-

১. একদল ঐসব লোক যারা বেহুদা কথা-বার্তায় লেগে যায়। তাদের অংশে এসব বেহুদা কথা-বার্তা ব্যতীত আর কিছুই পড়ে না।

২. দ্বিতীয় ঐসব লোক যারা এসে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে থাকে। আল্লাহ্ চাইলে তাদের দোয়া কবুল করবেন আর না চাইলে করবেন না।

৩. তৃতীয় ঐসব লোক যারা এসে চুপচাপ বসে যায়, না তারা মুসলমানদের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে যায়, আর না তারা কারো মনে কোন কষ্ট দেয়, তাহলে এদের এ নেক আমল আগামী জুমা এবং তারপর তিন দিন পর্যন্ত করা সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়-(আবু দাউদ)।

যেমন আল্লাহ্ বলেন-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا - (انعام)

যে ব্যক্তি নেক আমল করে সে তার দশগুণ প্রতিদান পায়।

নবী (সঃ) আরও বলেন-

যে ব্যক্তি জুমার দিন ভাল করে গোসল করে, সকাল সকাল মসজিদে যায়, পায়ে হেঁটে যায়,-কোন বাহনে চড়ে নয়, তারপর নিশ্চিত মনে খোতবা শুনে এবং খোতবা চলাকালে কোন বাজে কাজ করে না, তাহলে এমন ব্যক্তি তার প্রতি কদমের পরিবর্তে এক বছরের এবাদতের প্রতিদান পাবে- এক বছরের নামাযের এবং এক বছরের রোযার -(তিরমিযী)।

জুমার নামাযের শর্ত

জুমার নামায সহীহ এবং ওয়াজেব হওয়ার জন্যে শরীয়ত কিছু শর্ত আরোপ করেছে। যদি এসব শর্ত পাওয়া না যায়, তাহলে জুমা ওয়াজেব হবে না। এসব শর্ত আবার দু'প্রকারের। কিছু শর্ত এমন যা নামাযের মধ্যেই থাকা

জরুরী। তাকে 'শারায়েতে ওজুব' বলে। কিছু শর্ত এমন যা বাইরে পাওয়া জরুরী। এসবকে বলে 'শারায়েতে সেহ্হাত'।

শারায়েতে ওজুব

জুমার নামায ওয়াজেব হওয়ার জন্যে পাঁচটি শর্ত।

১. পুরুষ হওয়া। নারীর জন্যে জুমা ওয়াজেব নয়।

২. স্বাধীন হওয়া। গোলামের উপর ওয়াজেব নয়।

৩. বালেগ এবং জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। নাবালেগ এবং পাগলের উপর ওয়াজেব নয়।

৪. মুকীম হওয়া। মুসাফিরের জন্যে ওয়াজেব নয়।

৫. সুস্থ হওয়া। রোগী ও অক্ষমের জন্যে ওয়াজেব নয়। রোগী হওয়ার অর্থ এই যে, যে মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে না। কিন্তু যারা চলাফেরা করে এবং মসজিদ পর্যন্ত যেতে সক্ষম তার উপর জুমার নামায ওয়াজেব।

অক্ষম দু'প্রকারের। প্রথমত যার দৈহিক কোন অক্ষতা রয়েছে। যেমন, অন্ধ, খঞ্জ, এমন বৃদ্ধ যে চলতে পারে না। দ্বিতীয়ত ঐসব লোক যাদের বাহির থেকে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঝড়-তুফান, বৃষ্টি, বাদল, পথে কোন হিংস্র জানোয়ার, শত্রু প্রভৃতির ভয় হওয়া।

শারায়েতে ওজুব পাওয়া না গেলে জুমার নামাযের হুকুম

জুমার নামায তো এমন ব্যক্তির জন্যে ওয়াজেব যার মধ্যে উপরের পাঁচটি শর্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি এসব শর্ত বা কিছু পাওয়া না যায় এবং সে যদি জুমার নামায পড়ে তাহলে তার নামায দুরস্ত হবে। অর্থাৎ জুমার নামায পড়ার পর তাকে আর যোহর নামায পড়ার দরকার হবে না। যেমন কোন মহিলা মসজিদে গিয়ে জুমার নামায পড়লো, অথবা মুসাফির বা অক্ষম ব্যক্তি জুমার নামায পড়লো, তাহলে তার নামায দুরস্ত হবে এবং যোহর নামায পড়তে হবে না।

শারায়েতে সেহ্হাত (شرائط صحت)

জুমার নামায সহীহ হওয়ার জন্যে পাঁচটি শর্ত। এ পাঁচটি শর্ত পুরা না করলে জুমার নামায দুরস্ত হবে না, এসব শর্ত পূরণ ব্যতিরেকে কেউ জুমা পড়লে তার যোহর নামায পড়ার প্রয়োজন হবে। শর্তগুলো নিম্নরূপ-

১. মেসরে জামে' হওয়া।

২. যোহরের ওয়াক্ত হওয়া।

৩. খোতবা হওয়া।

৪. জামায়াত হওয়া।

৫. সর্ব সাধারণের জন্যে নামাযে অনুমতি থাকা।

শর্তগুলোর ব্যাখ্যা

১. মেসরে জামে'

বন জংগল, পল্লীগ্রাম, সাময়িক অবস্থানের জায়গায় জুমার নামায দুরস্ত হবে না।

হযরত আলী (রা) বলেন–

জুমা এবং ঈদাইনের নামায মেসরে জামে' ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দুরস্ত হবে না।

মেসরে জামে' বলতে বুঝায় এমন এক শহর অথবা বড়ো বস্তি যেখানে এত সংখ্যক মুসলমান আছে যাদের উপর জুমা ওয়াজেব, তারা যদি ঐ বস্তির কোন মসজিদে জমা হয় তাহলে তাদের স্থান সংকুলান হবে না।*

---

* সাধারণত : মেসরে জামে'র উপরোক্ত সংজ্ঞা হচ্ছে হানাফী ফকীহদের। এ ছাড়াও আরও বহু সংজ্ঞা বর্ণিত আছে। যেমন :

১. যে স্থানের লোকসংখ্যা দশ হাজার, তা মেসর।

২. অথবা মেসর (শহর) তাকে বলে যেখানে সকল প্রকার পেশার লোক জীবিকা অর্জন করে।

৩. সমকালীন ইমাম যে স্থানকে মেসর বলে উল্লেখ করে জুমা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেবেন তা মেসর।

৪. মেসর ঐ স্থানকে বলে যেখানে বাজার, সড়ক এবং মহল্লা আছে এবং সেখানে এমন একজন পরিচালক থাকবে যে যালেমের হাত থেকে মযলুমের অধিকার আদায় করতে পারে এবং এমন একজন আলেম থাকবে যার নিকটে লোক মাসয়ালা–মাসায়েল শিখতে আসবে।

এসব ছাড়াও ফকীহগণ আরও অনেক সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। এর থেকে জানা যায় যে, মেসরে জামে'র কোন সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই যার দ্বারা নিসন্দেহে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জুমার নামায শুধু শহরেই পড়া যায় গ্রামে পড়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে

পূর্ববর্তী পৃঃ টীকার অংশ

ফকীহগণ মেসরে জামে'র শর্তের আসল উদ্দেশ্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যকে আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গীতে যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে তাঁরা দু'টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। এক এই যে, জুমার নামায যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফরয, যার জন্যে খুবই তাকীদ করা হয়েছে, সে জন্যে যত বেশী সংখ্যক মুসলমান তা আদায় করার জন্যে জমায়েত হয় এবং এ বিরাট ফরযটির সৌভাগ্য থেকে যথাসম্ভব কেউ বঞ্চিত না হয়। দ্বিতীয় এই যে, জুমার নামায লোক বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন আদায় না করে। বরঞ্চ কোন একটি কেন্দ্রীয় স্থানে আদায় করে যেখানে মুসলমানদের বিরাট সমাবেশ হতে পারে। আল্লামা মওদূদী মেসরে জামে'র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন–

আমি শরীয়তের হুকুমগুলো যতদূর চিন্তা–ভাবনা করে দেখেছি তাতে তার উদ্দেশ্যই মনে হয় যে, জুমার নামায বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা জুমার উদ্দেশ্যের পরিপূরক নয়। এ জন্যে শরীয়ত প্রণেতা নির্দেশ দেন যে, জুমা মেসরে জামে'তে পড়তে হবে। মেসরে জামে' শব্দটি স্বয়ং এ কথার দিকে ইংগিত করে যে, এর অর্থ এমন এক বস্তি যা ছোট ছোট জামায়াতকে একত্র করে অর্থাৎ অনেক ছোট ছোট বস্তির লোক একত্র হয়ে জুমার নামায আদায় করে। এ উদ্দেশ্যে দোকান–পাট, বাজার এবং বস্তির সংখ্যা এবং এ ধরনের অন্য কিছু মেসরের কেন্দ্রীকতায় কিছু যায় আসে না। না জুমার জামায়াতের সাথে মেসরের এ অংশগুলোর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে যে জুমার নামায সহীহ হওয়ার জন্যে বাজার এবং বহু দোকান পাটের প্রয়োজন। এর জন্যে শুধু এমন এক বস্তির প্রয়োজন যা কেন্দ্রীয় মর্যাদাসম্পন্ন। যাতে করে চার ধারের মুসলমান সেখানে জমায়েত হতে পারে। যদি কোন বড়ো শহর হয় যা তামাদ্দুনিক দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় মর্যাদা রাখে তাহলে খুবই ভালো। নতুবা সমকালীন ইমাম যে বস্তিকে ন্যায়সংগত মনে করবে তাকেই মেসরে জামে' বলে নির্ধারিত করবে। চারপাশের লোকজনকে সেখানে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দেবে। আল্লামা ইবনে হাম্মাম বলেন–

ولو مصر الامام موضعا وامرهم با لا قامة فيه جاز ولو منع اهل مصر ان يجمعوا لم يجمعوا –

অর্থাৎ যদি ইমাম কোন স্থানকে মেসর বলে ঘোষণা করেন এবং লোকদেরকে সেখানে জুমা কায়েম করার হুকুম দেন তাহলে সেখানে নামায জায়েয হবে। আর যদি কোন স্থানের বাসিন্দাকে জুমা কায়েম করতে নিষেধ করেন, তাহলে সেখানে জুমা কায়েম করা উচিত হবে না (ফতহুলকাদীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৯)। তবে যদি ইমাম না থাকে, তাহলে যেভাবে মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে জুমা কায়েম হতে পারে এবং তাদের সিদ্ধান্ত কাযী নিযুক্ত হতে পারে। সেভাবে তাদের সিদ্ধান্তে ইমামের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হয়ে যে কোন বস্তিকে 'মেসরে জামে' ঘোষণা করতে পারে।

অতপর তিনি একটা ন্যায়সঙ্গত এবং বাস্তব প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে বলেন–

পূর্ববর্তী পৃঃ টীকার অংশ

আমি মেসরের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করলাম তাতে করে অধিকাংশ পল্লীবাসীদের জন্যে এমনকি বাস্তুহারা মুসলমানদের জন্যে শরীয়তের সঠিক পন্থায় জুমার নামায আদায় করা সম্ভব হবে। সে পন্থা এই যে, পল্লী অঞ্চলকে ছোট ছোট মৌজায় বিভক্ত করতে হবে যাদের মধ্যে স্থানীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে দূরত্ব হবে চার পাঁচ মাইল থেকে আট নয় মাইল পর্যন্ত। এসব মৌজার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় স্থানকে মুসলমান বাসিন্দাদের সম্মতিক্রমে মেসরে জামে' ঘোষণা করতে হবে। তারপর পার্শ্ববর্তী পল্লীগুলোকে মেসরের অধীন ঘোষণা করতে হবে এবং ঐ সব মুসলমান বাসিন্দা সেখানে গিয়ে জুমার নামায আদায় করবে। এ ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীসগুলোর দৃষ্টিতেই দুরস্ত হবে তা নয়, বরঞ্চ হানাফী ফকীহদের বিচার বিশ্লেষণের পরিপন্থীও হবে না। ফকীহগণ মেসরের অধীন গ্রাম বা পল্লীগুলোর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেউ মেসরের অধীন আবাসগুলোর দূরত্ব নয় মাইল নির্ধারণ করেছেন, কেউ দু'মাইল এবং কেউ ছ'মাইল। আবার কেউ বলেন, যে স্থান থেকে মেসরে এসে জুমার নামায আদায় করে রাত হওয়ার পূর্বে বাড়ী ফেরা যায় তাকে মেসরের অধীন গণ্য করা হবে। 'বাদায়ের' গ্রন্থকার এ শেষোক্ত সংজ্ঞাই পসন্দ করেছেন। হাদীসেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে–

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من اواه الليل الى اهله –

অর্থাৎ নবী (সঃ) বলেন, জুমা তার উপর ফরয, যে জুমার নামায পড়ে রাত হওয়ার পূর্বে বাড়ী পৌছতে পারে।

অন্যত্র হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন যে, নবী (সা) বলেছেন–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهل عسى ان يتخذ الصبة من الغنم على راس ميل او ميلين فتعذر عليه الكلا فير تفع ثم تجىء الجمعة فلا يحى ولا يشهدها (ثلاثا) حتى يتبع على قلبه –

অর্থাৎ নবী (সা) বলেন, শুনো, তোমাদের মধ্যে কেউ ছাগলের পাল নিয়ে ঘাসের সন্ধানে এক মাইল দু'মাইল চলে গেল। কিন্তু যখন জুমা এলো তখন এখানে ফিরে এলো না। (এ কথা তিনি তিন বার বললেন) তাহলে এমন ব্যক্তির দিলে মোহর মেরে দেয়া হবে।

এসব হাদীস এবং ফকীহদের বিশ্লেষণে জানা যায় যে, মেসরের অধীন স্থানগুলোর দূরত্ব ছ'–সাত মাইল অথবা তার কাছাকাছি যার বাসিন্দাগণ নামায পড়ে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরতে পারে। এমন দূরত্বের মধ্যে যারা বাস করবে, তারা স্থায়ী পল্লীবাসী হোক অথবা বাস্তুহারা (Nomads) তাদের জন্যে মেসরে জামাতে হাযির হয়ে জুমার নামায আদায় করা ফরয। ইবনে হাম্মাম ফতহুল কাদীরে বলেন–

পল্লী গ্রামে জুমার নামায

মেসরে জামে'-এর শর্তগুলো উপেক্ষা করে প্রত্যেক ছোটো বস্তিতে এবং প্রত্যেক ছোট বড়ো পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে জুমা আদায় করা সহীহ নয়।[১] বরঞ্চ মুসলমানদের উপর ওয়াজেব যে, তারা মিলিতভাবে পরামর্শ ক্রমে কোন একটি কেন্দ্রীয় স্থানকে জুমার জন্যে নির্ধারিত করবে এবং আশপাশের মুসলমান সেখানে জমায়েত হয়ে জুমার নামায আদায় করবে।

আল্লামা ইবনে হামাম বলেন–

–এবং যারা শহরের উপকণ্ঠে বাস করে তাদের উপরেও শহরবাসীর মতো জুমা ফরয। তাদেরও সেখানে গিয়ে জুমা আদায় করা অপরিহার্য (ফতহুল কাদীর, ১ম খন্ড পৃঃ ৪১১)।

শহরের উপকন্ঠ বলতে আশেপাশের ঐ সকল বস্তি বুঝায় যেখান থেকে জুমার নামাযে অংশগ্রহণকারী সন্ধ্যার আগে নামায শেষে বাড়ী ফিরতে পারে।

নবী (সঃ) বলেন–

ومن كان من مكان من توابع المصر فحكمه حكم اهل المصر في وجوب الجمعة عليه بان ياتى المصر فليصلها فيه – (فتح القدير جلد اول صحه ٤١١)

যে ব্যক্তি মেসরের অধীনে যে কোন স্থানেই থাক না কেন, তার জন্যে আহলে মেসরের মতোই জুমা ওয়াজেব। মেসরে হাযির হয়ে জুমার নামায আদায় করা তার উচিত– (ফতহুল কাদীর প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১১)।

১. আহলে হাদীসের মতে শহর অথবা কোন বড়ো বস্তি হওয়া জুমার জন্যে শর্ত নয়। যেখানেই জামায়াতের জন্যে কিছু লোক জমায়েত হবে সেখানেই জুমা পড়া ফরয। তাদের দলীল এই যে, হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বাহরাইন থেকে হযরত ওমর (রা)-এর নিকটে একটি পত্রের মাধ্যমে জানতে চান যে, বাহরাইনে জুমা পড়া যাবে কিনা? আমীরুল মুমেনীন উত্তরে বলেন جمعوا حيثما كنتم তোমরা যেখানেই থাক না কেন জুমা পড়–(ইবনে হুযায়মা)। আল্লামা ইবনে হাযম বলেন, গ্রামে জুমা সহীহ হওয়ার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে, নবী (সঃ) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন, তখন মদীনার ছোট ছোট বস্তির আকারে আলাদা আলাদা বস্তি হিসাবে মসজিদ তৈরী করেন এবং ঐ বস্তিতে জুমার নামায পড়েন। আর এটা না কোন বড়ো গ্রাম ছিল, আর না শহর। (ইসলামী তালীম, আওনুল মা'বুদ–শরহে আবু দাউদ দ্রঃ)

জুমা তার উপর ফরয যে রাত পর্যন্ত তার সন্তান-সন্ততির কাছে পৌছতে পারে-(তিরমীযী)।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন-

লোক তাদের বাসস্থান এবং মদীনার উপকন্ঠ থেকে জুমার নামাযের জন্যে আসতো। তাদের শরীর ধূলা বালিতে ভরে যেতো এবং গা দিয়ে ঘাম ছুটতো। একবার নবী (সঃ) আমার নিকটে ছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজন নবীর খেদমতে হাযির হলো। তিনি বললেন, তোমরা আজকার দিনে গোসল করে আসলে কত ভালো হতো- (বুখারী)।

২. যোহরের ওয়াক্ত

যোহরের ওয়াক্তের পূর্বে এবং পরে জুমার নামায জায়েয নয়। জুমার নামায পড়াকালে যদি যোহরের ওয়াক্ত চলে যেতে থাকে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে-যদিও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াত পড়ার পরিমাণ সময়ও বসা হয়ে থাকে। এ জন্যে যে, জুমার নামাযের কাযা নেই।

৩. খুতবা

জুময়ার নামাযের আগে ওয়াক্তের মধ্যেই খুতবা পড়াও জরুরী। ওয়াক্তের পূর্বে খুতবা পড়া হলে নামায হবে না। এমনিভাবে নামাযের পর খুতবা হলেও নামায হবে না।

৪. জামায়াত

খুতবা শুরু হওয়া থেকে নামাযের শেষ পর্যন্ত ইমাম ব্যতীত আরও অন্তত তিন জন এমন হতে হবে-যারা ইমামতি করতে পারে। যদি নারী অথবা নাবালেগ ছেলে হয় তাহলে নামায হবে না।

৫. ইযনে আম (সর্ব সাধারণের অবারিত দ্বার)

অর্থাৎ এমন সাধারণ স্থানে ঘোষণা করে নামায পড়া যায় যেখানে প্রত্যেকের আসার এবং নামায পড়ার অবাধ অনুমতি থাকবে এবং কারো জন্যেই কোন প্রকারের বাধা নিষেধ থাকবে না। যদি এমন স্থানে জুমার নামায পড়া হয় সেখানে সাধারণ মানুষের জন্যে প্রবেশ নিষেধ অর্থাৎ দরজা বন্ধ করে

নামায পড়া হয়, তাহলে জুমার নামায দুরস্ত হবে না। যেমন কোন জমিদার অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তার কুঠী বা বাংলোতে জুমার নামাযের ব্যবস্থা করে যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ, সেখানে জুমা জায়েয হবে না।

জুমার নামাযের জন্যে মুসলমান শাসকের শর্ত

ফেকাহর কেতাবগুলোতে জুমার জন্যে শাসকের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।১ অর্থাৎ মুসলামন শাসক নিজে অথবা তাঁর কোন প্রতিনিধি জুমা কায়েম করবেন। এ শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান শাসকদের অপরিহার্য দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি জুমার নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবেন এবং এ বিরাট সম্মেলনের দেখা শুনার ব্যবস্থা করবেন যাতে করে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকে এবং কোন প্রকার বিশৃংখলা না হয়। এখন যেখানে অমুসলিম শাসক রয়েছে, সেখানে এ শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে মুসলমানদের থেকে জুমা রহিত হয়ে যায় না। বরঞ্চ তাদের কর্তব্য হয়ে পড়ে পরস্পর মিলে মিশে জুমার নামায পড়া। ফকীহগণ এ শর্তটির গুরুত্ব এভাবে উপলব্ধি করেছেন। তারপর সুস্পষ্ট ফতোয়া দিয়েছেন যে, যেখানে অমুসলমান শাসক থাকবে সেখানে মুসলমানদের নিজেদেরই পক্ষ থেকে জুমার নামাযের ব্যবস্থা করবে। ফেকার বিখ্যাত কেতাব শামীতে আছে-

واما فی بلاد فیها ولاة کفار فیجوز للمسلمین اقامة الجمع والاعیاد ویصیر القاضی قاضیا بتراضی المسلمین ویجب علیهم طلب وال مسلم-

যেসব দেশে কাফের শাসক হবে সেখানে মুসলমানদের নিজেদের পক্ষ থেকে জুমা এবং দু'ঈদের নামাযের ব্যবস্থা করা দুরস্ত হবে। সেখানে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যাকে কাযী বানানো হবে তিনি কাযী হবেন এবং তার জন্যে ওয়াজেব হবে মুসলিম শাসকের দাবী করা এবং তার জন্যে সংগ্রাম করা।

---

১. হেদায়াতে আছে-

لا یجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امره السلطان

অর্থাৎ জুমার প্রতিষ্ঠা কোন শাসন বা শাসকের প্রতিনিধি ব্যতীত জায়েয নয়।

মওলানা আবদুল হাই ফিরিংগী মহল্লী তো এতোখানি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যেসব দেশে অমুসলমান শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সেখানকার মুসলমানদের উপরেও জুমা ওয়াজেব। মোগল শাসনের পর যখন ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম হয়, তখন এ প্রশ্ন ওঠে যে,এখানে জুমা জায়েজ কিনা। কিছু স্থবীর ধরনের লোক মনে করলেন যে, যেহেতু জুমার জন্যে মুসলিম শাসন হওয়া শর্ত সে জন্যে ভারতে জুমার নামায না পড়াই উচিত। কিন্তু মাওলানা আবদুল হাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, মুসলিম শাসক না থাকলেও মুসলমানদের উপর জুমা ফরয।

انه لاشات فى وجوب الجمعة وضحة اذائها فى بلاد الهند التى غلبت عليه النصارى وجعلوا عليها ولاة كفار او ذالك باتفاق المسلمين وتراضيهم ومن افقى بسقوط الجمهة لفقد شرط السلطان فقد ضل واضل –

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতে যেখানে খৃষ্টানদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে এবং তারা কাফের শাসক নিযুক্ত করেছে, জুমা ওয়াজেব এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা আদায় করা দুরস্ত হবে, যে কেউ জুমা রহিত হওয়ার ফতোয়া দেবে সে নিজেও গোমরাহ এবং অপরকেও গোমরাহ করবে–(তাফহীমাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪১০, আল্লামা মওদূদী (র))।

জুমার সুন্নাতসমূহ

জুমার সুন্নাত আট রাক্‌য়াত এবং সব সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ফরযের পূর্বে এক সালামে চার রাক্‌য়াত এবং ফরযের পর এক সালামে চার রাক্‌য়াত। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র)–এর মত।

সাহেবাইন (র) (ইমাম সাহেবের দু'শাগরেদ) বলেন, জুমার দশ সুন্নাত, ফরযের পূর্বে চার রাক্‌য়াত এবং পরে ছ'রাক্‌য়াত। চার রাক্‌য়াত এক সালামে, পরে দু'রাক্‌য়াত এক সালামে।

জুমার আহকাম ও আদব

১. জুমার দিন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা, চুল এবং নখ কাটা, সাধ্যমত ভালো পোশাক পরিধান করা, খুশবু লাগানো এবং প্রথমে জামে মসজিদে গিয়ে হাযির হওয়া সুন্নাত।

নবী (সঃ) বলেন–

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করবে, ভালো কাপড় পরবে, সুযোগ হলে খুশবু লাগাবে, জুমার নামাযে আসবে, লোকের ঘাড়ের উপরে দিয়ে ডিঙিয়ে যাবে না, অতপর নামায পড়বে যা আল্লাহ ভাগ্যে লিখে রেখেছেন, ইমাম আসার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ-চাপ থাকবে, তাহলে আগের জুমা থেকে এ জুমা পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে–(ইলমুল ফেকাহ, ২য় খণ্ড)।

২. ব্যবস্থা সত্ত্বেও ভুলে অথবা কোন কারণে জুমা পড়তে না পারলে যোহরের চার রাক্‌য়াত ফরয পড়তে হবে এবং কিছু সদকা খয়রাত করে দেয়া উচিত। এমনি কোন রোগীর সেবা শুশ্রূষার কারণে, অথবা ঝড় তুফান অথবা শত্রুর ভয়ে জুমার নামায পড়তে না পারলে যোহর আদায় করতে হবে।

৩. যে খুতবা দেয় তারই নামায পড়ানো ভালো। কিন্তু কোন কারণে অন্য কেউ নামায পড়িয়ে দিলেও দুরস্ত হবে–(দূররে মুখতার)।

তবে জুমার নামায সেই পড়াবে যে খুতবা শুনেছে। এমন ব্যক্তি যদি নামায পড়ায় যে খুতবা শুনেনি তাহলে নামায হবে না।

৪. বস্তির সকল লোকের একই জামে' মসজিদে একত্র হয়ে জুমার নামায আদায় করা ভালো। তবে শহরে কয়েক মসজিদে নামায পড়াও জায়েয–(বাহরুর রায়েক)।

৫. শহরে অথবা এমন বস্তিতে যেখানে জুমার নামায হয়, সেখানে জুমার আগে যোহর নামায পড়া হারাম (ইলমুল ফিকাহ)।

৬. রোগী এবং অক্ষম ব্যক্তিগণ–যাদের উপর জুমা ওয়াজেব নয়, জুমার দিন যোহর নামায পৃথক ভাবে পড়বে। এ ধরনের লোকের জুমার দিন যোহর নামায জামায়াতে পড়া মাকরুহ তাহরীমি–(দুররে মুখতার)।

৭. খুতবার তুলনায় জুমার নামায দীর্ঘ হওয়া উচিত।

নবী (সঃ) বলেন –

জুমার নামায লম্বা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া এ কথারই নিদর্শন যে, খতীব দ্বীনের গভীর জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা রাখেন–(মুসলিম)।

৮. যদি কোন মসবুক শেষ বৈঠকে এসে জামায়াতে শামিল হয়ে যায় অথবা সহু সিজদার পর তাশাহহুদে এসে শরীক হয়, তবুও তার জুমার নামায দুরস্ত হবে। ইমাম সালাম ফেরার পর দাঁড়িয়ে দু'রাক্‌য়াত আদায় করবে।

৯. জুমার আয়োজন বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু করা উচিত। নবী (সঃ) বৃহস্পতিবার থেকেই আয়োজন শুরু করে দিতেন–(মিশকাত)।

১০. জুমার দিন, যিকির, তসবীহ, তেলাওয়াতে কুরআন, দোয়া, এস্তেগফার, দান–খয়রাত, রোগীর সেবা, জানাযায় শরীক হওয়া, কবরস্থান যিয়ারত এবং অন্যান্য নেক কাজ করার বেশী আয়োজন করা উচিত। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন– পাঁচটি নেক আমল এমন যে, কেউ যদি একদিনে তা করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে বেহেশতবাসী করবেন–

১–রোগীর সেবা–শুশ্রুষা করা

২–জানাযায় শরীক হওয়া

৩–রোযা রাখা

৪–জুমার নামায পড়া

৫–গোলাম আযাদ করা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)–এর আর একটি বর্ণনায় আছে যে, নবী (সঃ) বলেন–

যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে, তার জন্যে আগামী জুমা পর্যন্ত একটি নূর উজ্জ্বল হয়ে থাকবে–(নাসায়ী)।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমার রাতে সুরায়ে দোখান' তেলাওয়াত করবে তার জন্যে ৭০ হাজার ফেরেশতা এস্তেগফার করে এবং তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় (তিরমিযী)।

উপরন্তু নবী (সঃ) বলেন–

জুমার দিনে একটি সময় এমন আছে যে, বান্দাহ তখন যে দোয়াই করে তা কবুল হয়– (বুখারী)।

এ সময়টি কখন সে বিষয়ে আলেমদের কয়েক প্রকার উক্তি আছে, যার মধ্যে দু'টি অধিকতর সহীহ বলে স্বীকার করা হয়েছে। একটি হচ্ছে যখন ইমাম খুতবার জন্যে মিম্বরে আসবেন তখন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় জুমার দিনের শেষ মুহূর্তগুলো যখন সূর্য ডুবতে থাকে। এ দু'সময়ে দোয়ার ব্যবস্থা করা সমীচীন।

১১. জুমা নামাযের অনেক আগে মসজিদে যাওয়া মুস্তাহাব। নবী (সঃ) বলেন–

যেমন করে পাক হওয়ার জন্যে লোক গোসল করে তেমনিভাবে কেউ যদি জুমার দিন ভালোভাবে গোসলের ব্যবস্থা করলো এবং প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে পৌছলো, সে যেন একটি উট কুরবানী করলো। তারপর যে পৌছলো সে যেন একটি গরু কুরবানী করলো, তারপর যে পৌছলো সে যেন একট শিং ওয়ালা মেষ কুরবানী করলো, তারপর যে পৌছলো সে যেন একটি আণ্ডা কুরবানী করলো, তারপর যখন খতীব খুতবার জন্যে বেরিয়ে আসে, তখন ফেরেশতাগণ দরজা ছেড়ে দেন এবং হাজিরা বই বন্ধ করে খুতবা শুনার জন্যে এবং নামায পড়ার জন্যে মসজিদের ভেতর বসে পড়েন–(বুখারী, মুসলিম)।

১২. জুমার দিনে ফজরের নামাযে সূরা حم السجدة এবং সূরা الدهر পড়া সুন্নাত।

১৩. জুমার নামাযে সূরা الجمعة এবং সূরা المنافقون অথবা সূরা الاعلى এবং সূরা الغاشية পড়া সুন্নাত।

১৪. মসজিদে যেখানে স্থান পাওয়া যায় সেখানেই বসা উচিত, কারো মাথা ও ঘাড় ডিঙিয়ে যাওয়া মাকরুহ। এতে লোকের কষ্ট হয়, শরীরে এবং মনেও। তাদের একাগ্রতাও নষ্ট হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি প্রথম কাতার ছেড়ে দ্বিতীয় কাতারে এ জন্যে দাঁড়ায় যে, তার মুসলমান ভাইদের কোন কষ্ট না হয় তাহলে আল্লাহ্ তাকে প্রথম কাতারের লোকের দ্বিগুণ সওয়াব দেবেন– (তাবারানী)।

১৫. জুমার দিনে বেশী বেশী নবী (সঃ)–এর উপর দরুদ পড়া মুস্তাহাব। নবী (সঃ) বলেন–

তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন জুমার দিনে আদম (আঃ) পয়দা হন এবং এই দিনেই তার ইন্তেকাল হয়। এ দিনে কেয়ামত হবে। এ জন্যে এদিনে তোমরা বেশী বেশী করে আমার উপর দরুদ পাঠাও। কারণ তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার দেহ তো পচে গলে বিলীন হয়ে যাবে। নবী (সঃ) বলেন, আল্লাহ্ নবীদের দেহ ভক্ষণ করা মাটির জন্যে হারাম করে দিয়েছেন–(আবুদাউদ)।

খুতবার আহকাম ও আদব

১. খতীব দু'টি খুতবা দেবেন। প্রথম খুতবায় শ্রোতাদেরকে দ্বীনের নির্দেশ এবং তার উপর আমল করা শিখাবেন[১] এবং দ্বিতীয় খুতবায় কুরআনের কিছু আয়াত পড়বেন, নবীর উপর দরুদ পড়বেন এবং আসহাবে রসূল (সঃ) এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্যে দোয়া করবেন।

---

১. খুতবার এ বুনিয়াদী উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হতে পারে যখন খতীব শ্রোতাদেরকে তাদের নিজস্ব ভাষায় সম্বোধন করবেন যাতে করে শ্রোতাগণ বুঝতে পারেন। কিন্তু আরবী ভাষা ব্যতীত অন্যভাষায় খুতবা দেয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

আসল কথা এই যে, প্রথম খুতবা প্রকৃতপক্ষে ওয়াজ–উপদেশ, দ্বীনের মর্মকথা মানুষকে বুঝানো প্রভৃতি বিষয়ে দেয়া হয় এবং আরবী ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায়ও দেয়া যায়। অবশ্য দ্বিতীয় খুতবা আরবীতেই হওয়া উচিত। আর যেখানে মুসলমানদের কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় সেখানে দুটি খুতবাই আরবীতে হওয়া উচিত। আল্লামা মওদূদী (র) এ বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন–

এই হওয়া উচিত যে, খুতবার এক অংশ (দ্বিতীয় অংশ) অবশ্য অবশ্যই আরবী ভাষায় হবে। এ অংশে আল্লাহ্ তায়ালার হামদ ও সানা, আল্লাহ্র রসূল (সঃ) তাঁর আসহাব, আল–আওলাদ প্রভৃতির উপর সালাত ও সালাম এবং কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। তারপর দ্বিতীয় অংশে (প্রথম খুতবা) ওয়াজ নসীহত এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী শিক্ষা এসব কথা এমন ভাষায় হওয়া উচিত যা সকল শ্রোতা অথবা তাদের অধিকাংশ বুঝতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগ এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত যা মুসলমানদের নিকটে আন্তর্জাতিক বা আন্ত প্রাদেশিক মর্যাদা রাখে। যেমন ভারতে (বৃটিশ ভারতে) প্রাদেশিক ভাষা অথবা স্থানীয় কথ্যভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষায় খুতবা হওয়া উচিত। কারণ উর্দু প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের লোক বুঝতে পারে, অবশ্যি দূর দূরান্তের স্থানগুলোতে যেখানে লোক উর্দু বুঝতে পারে না স্থানীয় ভাষায় খুতবা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যেখানে মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে সেখানে আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুতবা দেওয়া উচিত নয়–(তাফহীমাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)।

২. খতীবের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেক জুমার জন্যে সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উপযোগী ভাষণ তৈরী করা এবং দেশ ও মিল্লাতের অবস্থা, মুসলিম জাতি যেসব সমস্যার সম্মুখীন সে সব সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উপদেশ দেয়া। দ্বীনের দৃষ্টিতে সকল সমস্যা সমাধানের প্রেরণা দান এবং তদনুযায়ী উপায় অবলম্বন করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা। মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাদের মধ্যে দ্বীন ও মিল্লাতের জন্যে দরদ সৃষ্টি করা কেতাব দেখে কোন তৈরী খুতবা পড়ে শুনানো যেমন জায়েয, তেমনি তাবাররুক স্বরূপ স্বয়ং নবী (সঃ)-এর কোন নির্ভরযোগ্য খুতবা পড়ে শুনানোও জায়েয। কিন্তু জুমার খুতবার আসল উদ্দেশ্য হলো। যিনি মুসলমানদের দায়িত্বশীল তিনি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলার সাথে মুসলমানদেরকে দ্বীনের নির্দেশাবলী শুনিয়ে দেবেন, তাদের দায়িত্ব সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেন এবং উদ্ভূত সমস্যাবলী সম্পর্কে কেতাব ও সুন্নাতের আলোকে দিক নির্দেশনা করবেন। এ জন্যে উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, খুতবার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে খতীব প্রয়োজনবোধে শরীয়তের মাসয়ালা বয়ান করবেন এবং হেদায়াত দান করবেন। শুধু বই পড়ে শুনানো যথেষ্ট হবে না।[১]

আহলে হাদীস আলেমগণও আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুতবা দেয়া জায়েয বরঞ্চ উত্তম মনে করেন। মাওলানা আবদুস সালাম বাস্তবী বলেন-

খুতবার অর্থ হলো উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে ওয়াজ নসীহত করা। নসীহত তখনই কাজে লাগে, যখন তা করা হয় শ্রোতাদের ভাষায়। অতএব শ্রোতাদের ভাষায় খুতবা দেয়া উচিত। শ্রোতা যদি আরবী ভাষাভাষী হয় তাহলে আরবী ভাষায় খুতবা এবং অন্যভাষী হলে সে ভাষায় খুতবা দেয়া উচিত। শুধু আরবী ভাষার খুতবা দেয়া ফরয নয়। বরং আরবী মূল বচন পড়ে পড়ে তার অনুবাদ করে শ্রোতাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত-(ইসলামী তালীম, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩০)।

১. খুতবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা মওদূদী (র) বলেন-

আসলে খুতবার ব্যবস্থা এ জন্যে করা হয়নি যে, লোক সপ্তাহে একদিন গতানুগতিকভাবে এমন এক জিনিস শুনবে যেমন খৃষ্টান গির্জাগুলোতে Serman বা সদুপদেশ শুনানো হয়ে থাকে। বরঞ্চ এ খুতবাকে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনের একটা সক্রিয় অংশ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সপ্তাহে একবার অনিবার্যভাবে সকল মুসলমানকে একত্র করে আল্লাহর নির্দেশাবলী শুনিয়ে দিতে হবে, দ্বীনের শিক্ষা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিতে হবে। ব্যক্তি বা জামায়াতের মধ্যে কিছু অনাচার দেখা দিলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, সমাজ কল্যাণমূলক কাজে

৩. খতীব প্রথম খুতবা দেয়ার পর মিম্বরে এতটুকু সময় পরিমাণ বসবেন। যে সময়ে ছোটো তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা যায় অথবা তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা যেতে পারে। তারপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবা দিবেন। প্রথম খুতবায় প্রাণস্পর্শী ভাষায় উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে জাতিকে দ্বীনের হুকুম আহকাম জানিয়ে দেবেন। খুতবায় উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভাবাবেগ সৃষ্টিকারী ভাষণ দেয়া মুস্তাহাব।

দ্বিতীয় খুতবায় কুরআনের কিছু আয়াত, দরূদ, সালাম এবং আসহাবে রসূল (সঃ) ও সাধারণ মুসলমানের জন্যে দোয়া করতে হবে।

৪. নামাযের তুলনায় খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। নামায থেকে খুতবা দীর্ঘ করা মাকরুহ। নবী (সঃ) বলেন– নামায দীর্ঘ করা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করা খতীবের বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। অতএব তোমরা নামায দীর্ঘ কর এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত কর–(মুসলিম)।

৫. খুতবার সময় চুপচাপ বসে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনা ওয়াজেব–শ্রোতা খতীবের নিকটে থাক অথবা দূরে।

৬. খুতবার সময়ে খতীবের নিকটে বসা এবং তার দিকে মুখ করা মুস্তাহাব। হাদীসে আছে খুতবায় হাযির থাক এবং ইমামের নিকটে থাক–(মিশকাত)।

৭. খতীব খুতবার জন্যে দাঁড়ালে নামায পড়া এবং কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। খুতবার সময় নামায পড়া, কথা বলা, যিকির ও তসবীহতে মশগুল হওয়া, খানাপিনা করা, সালাম করা, সালামের জবাব দেয়া। এমন কোন কাজ করা যা খুতবা শুনতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, মাকরুহ তাহরীমি। খুতবার সময়ে কাউকে শরীয়তের হুকুম শিখানো, নেক কাজের উপদেশ দেয়াও নিষিদ্ধ। নবী (সঃ) বলেন–

যখন ইমাম খুতবা দেয় তখন যে কথা বলে তার দৃষ্টান্ত, যে কেতাবের বোঝা বহন করে তার মতো এবং যে ব্যক্তি খুতবার সময় অপরকে বলে, 'চুপ কর,' তার জুমা হলো না–(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী)।

অবশ্য খুতবার সময় কাযা নামায পড়া শুধু জায়েয নয় বরঞ্চ ওয়াজেব।

তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উপরন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান (Head of the state) সরাসরি সরকারের পলিসি জনসাধারণের সামনে পেশ করবেন এবং প্রত্যেকের প্রশ্ন করার অথবা নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।–(তাফহীমাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৫)।

৮. খুতবার সময় নবীর নাম উচ্চারিত হলে মনে মনে দরূদ পড়া জায়েয।

৯. দ্বিতীয় খুতবায় নবীর আল আওলাদ, আসহাব বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীন, হযরত হামযা (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর জন্যে দোয়া করা মুস্তাহাব। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলের জন্যে দোয়া করাও জায়েয। তবে অসংগত এবং অতিরঞ্জিত প্রশংসা করা মাকরুহ তাহরীমি-(ইলমুল ফেকাহ দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৪৮' বরাত দুররে মুখতার)।

১০. রমযানের শেষ জুমার (জুময়াতুল বেদা) খুতবায় বিদায় ও বিরহের বিষয় বলা বা পড়া যদিও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু নবী (সঃ) সাহাবায়ে কেরাম থেকে এমন কিছু বর্ণিত নেই। ফেকাহর কোন প্রামাণ্য কেতাবেও এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। অতএব স্থায়ীভাবে এ ধরনের প্রবন্ধ পাঠ করা ঠিক নয়। এভাবে যে জিনিসটি শুধু মোবাহ পর্যায়ের তাকে মানুষ সুন্নাতের মর্যাদা দিয়ে ফেলবে। আজকাল জুমাতুল বেদার খুতবা খুব ধুমধামের সাথে পড়া হয়ে থাকে এবং যারা বিদায়ী খুতবা পড়ে না, তাদেরকে ভালো মনে করা হয় না এবং সাধারণ মানুষ জুমাতুল বেদাকে একটা শরয়ী মর্যাদা দিয়ে বসে আছে। এ জন্যে এর থেকে দূরে থাকা ভালো-(ইলমুল ফেকাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮)।

১১. খুতবা শেষ হওয়ার সাথে সাথে একামত দিয়ে নামায শুরু করা উচিত। খুতবা এবং নামাযের মাঝখানে কোন দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরুহ তাহরীমি। আর যদি এ বিরতি দীর্ঘ হয়, যেমন খতীব খানা খেতে বসে গেলেন, অথবা কারো কারবারের বিষয় মীমাংসা করতে বসলেন, তাহলে দ্বিতীয়বার খুতবা পড়তে হবে। তবে যদি কোন দ্বীনি প্রয়োজন হয়, যেমন কাউকে শরীয়তের হুকুম বলতে হলো অথবা অযুর প্রয়োজন হলো, অথবা খুতবার পর মনে হলো যে, গোসলের প্রয়োজন ছিল[১] তা হলে এ বিরতিতে কোন দোষ নেই। দ্বিতীয়বার খুতবা পড়ার প্রয়োজন হবে না।

---

১. প্রকাশ থাকে যে, খুতবার জন্যে তাহারাত শর্ত নয়। এমন কি কেউ যদি ভুলে জানাবাতের অবস্থায় খুতবা দিয়ে ফেলে তাহলে পুনরায় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ولو خطب قاعدا اوعلى غير طهارة جاز (هدايه)

খতীব যদি বসে অথবা পাক না থাকা অবস্থায় খুতবা দেন তাহলে তা জায়েয হবে-(হেদায়া)।

নামায এবং খুতবায় মাইকের ব্যবহার

খুতবার সময়ে প্রয়োজনে মাইক ব্যবহার জায়েয।

নামাযেও প্রযোজন হলে মাইক ব্যবহার করতে দোষ নেই।[১]

জুমার আযানের পরে বেচা-কেনা নিষিদ্ধ

জুমার আযান শুনার সাথে সাথে সব কারবার বেচা-কেনা খতম করে খুতবা শুনার জন্যে এবং নামাযের জন্যে সেজেগুজে রওয়ানা হওয়া উচিত। এ জন্যে যে, জুমার আযানের পর বেচা কেনা হারাম হয়ে যায়। কুরআনে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে-

يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ - (الجمعة ٩)

হে মুমেনগণ! জুমার দিন যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হবে তখন আল্লাহর যিকিরের জন্যে দ্রুত অগ্রসর হও এবং কেনা-বেচা বন্ধ করে দাও। (আল-জুমুয়াহ : ৯)

তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত যে ذِكْرُ اللّٰهِ এর অর্থ খুতবা অথবা খুতবা এবং নামায উভয়ই। এবং نُودِيَ বলতে যে আযান বুঝায় তা হলো সেই আযান যা খুতবার আগে দেয়া হয়। অনেক পূর্বে যে আযান দেয়া হয় তা নয়। হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা) বলেন যে, নবী (সঃ)-এর যমানায় শুধু একই আযান দেয়া হতো এবং তা দেয়া হতো যখন খতীব মিম্বরে গিয়ে

---

১. মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব এ ব্যাপারে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন- ফকীহগণের বর্ণিত বিশ্লেষণ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর কেবলা পরিবর্তনের আমল থেকে সুস্পষ্ট যুক্তি পাওয়া যায় যে, এতে নামায নষ্ট হওয়ার হুকুম দেয়া যায় না-(আধুনিক যন্ত্রাদি সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম, পৃঃ ৮৯)।

আল্লামা মওদূদী (র) মাইকে নামায শুধু জায়েযই নয় বরং উত্তম হওয়া সম্পর্কে দলীল দিতে গিয়ে বলেন- এসব যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতেই আমি নামাযে মাইক ব্যবহার শুধু জায়েযই নয় বরং উত্তম মনে করি। আমার মন সাক্ষ্য দেয় যে, যদি নবী (সঃ)-এর যমানায় এসব যন্ত্র থাকতো তাহলে তিনি অবশ্যই নামায, আযান এবং খুতবায় তা ব্যবহার করতেন। যেমন তিনি খন্দকের যুদ্ধে ইরানী পদ্ধতিতে খন্দক খনন করাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন-(তাফহীমাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৮০)।

বসতেন, তারপর হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমরের সময় যখন লোকসংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল, তখন তাঁরা অতিরিক্ত আর একটা আযান চালু করেন। সে আযান মদীনার বাজারে তাঁদের বাসগৃহ 'যাওরা' থেকে দেয়া হতো (বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী)।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী তাঁর তাফসীরে বলেন, نُودِيَ বলতে সেই আযান বুঝায় যা ইমামের সামনে দেয়া হয়। তার আগের আযান হযরত ওসমান (রা)-এর যমানায় সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর ঐকমত্যে দেয়ার রীতি চালু হয়।

খুতবায় মসনূন পদ্ধতি

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহকারে খতীব শ্রোতাদের দিকে মুখ করে বসবেন এবং মুয়াযযিন খতীবের সামনে আযান দিবেন।

আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে খতীব মেম্বরে উঠবেন এবং মনে মনে আউযুবিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজীম পড়ে খুতবা শুরু করবেন।

প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা, তারপর তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দেবেন। তারপর উৎসাহ উদ্দীপনা ও গুরুত্ব সহকারে সংক্ষিপ্ত অথচ সার্বিক ভাষণ দেবেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে বসে পড়বেন তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়ার সময় পর্যন্ত।

তারপর দ্বিতীয় বার উঠে দ্বিতীয় খুতবা দেবেন। এ খুতবাতেও হামদ-সানা এবং শাহাদাতের পুনরাবৃত্তি করবেন। কুরআন পাকের কিছু আয়াত পড়বেন নবীর (সঃ) উপর দরুদ ও সালাম পড়বেন। সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং বিশেষ করে হযরত হামযা (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর জন্যে দোয়া করবেন। তারপর সাধারণ মুসলমানদের জন্যে দোয়া করে খুতবা শেষ করবেন। খুতবা শেষ করার পর পরই নামাযের জন্যে সকলে দাঁড়াবেন।

দুই ঈদের নামাযের বিবরণ

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, লোক বছরে দু'টি নির্দিষ্ট দিনে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগ করে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দু'টি দিন কেমন?

তারা বলেন, আমরা ইসলামের আগমনের পূর্বে এ দু'টি দিনে খেল-তামাশা ও আনন্দ উপভোগ করতাম।

নবী (সঃ) বলেন, আল্লাহ্ এ দু'টি দিনের পরিবর্তে দুটি উৎকৃষ্টতর দিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। একটি ঈদুল ফেতরের দিন এবং অন্যটি ঈদুল আযহার দিন।

ঈদুল ফেতরের মর্ম

শওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানগণ ঈদুল ফেতর উৎসব পালন করেন। আল্লাহ্ তাআলা বান্দাহদের উপরে রমযান মাসের রোযা, তারাবীহ, কুরআন তেলাওয়াত, দান খয়রাত প্রভৃতি যেসব এবাদাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন, বান্দাহগণ তা ভালোভাবে আদায় করার তওফীক তাঁর কাছ থেকে লাভ করে সফলতা লাভ করেছে। তারই জন্যে সত্যিকার আনন্দ প্রকাশের জন্যেই এই ঈদুল ফেতরের উৎসব পালন করা হয়।

ঈদুল আযহার মর্ম

যুলহজ্জ মাসের দশ তারিখে মুসলমান ঈদুল আযহার উৎসব পালন করেন। এ উৎসব আসলে সেই বিরাট কুরবানীর স্মৃতি বাহক যা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাইল (আ) আল্লাহ্র দরবারে পেশ করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)কে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করতে প্রস্তুত হলেন। এদিকে হযরত ইসমাইল (আ) আল্লাহ্র এটাই ইচ্ছা তা জানতে পেরে আনন্দ চিত্তে ধারাল

ছুরির নীচে তাঁর গলা রেখে দিলেন। কুরবানির অতুলনীয় ইতিহাস স্মরণে ঈদুল আযহা পালন করে মুসলমানগণ তাদের কথা ও কাজের দ্বারা এ ঘোষণাই করে যে, তাদের কাছে যে জান ও মাল আছে তা আল্লাহ্‌র ইংগিত মাত্রই আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করবে। তারা পশুর গলায় ছুরি দিয়ে তার রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহ্‌র কাছে এ শপথ করে, "হে আল্লাহ্‌! তোমার সন্তুষ্টির জন্যে যেভাবে আমরা পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজন হলে তেমনি আমাদের রক্তও তোমার পথে প্রবাহিত করতে কুণ্ঠিত হবো না। এ সৌভাগ্য আমাদের হলে আমরা তোমার অনুগত ও বিশ্বস্ত বান্দাহ প্রমাণিত হবো।"

ঈদুল ফেতরের দিনে সুন্নাত কাজ

১. নিজের সাজ পোশাকের ব্যবস্থা করা।

২. ফজরের নামাযের পর ঈদের নামাযের জন্যে গোসল করা।

৩. মিসওয়াক করা।

৪. সাধ্যমত নতুন বা পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৫. খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা।

৬. সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া।

৭. ঈদগাহে যাবার আগে সদকা ফেতরা দিয়ে দেয়া।

৮. ঈদগাহে যাবার আগে কিছু মিষ্টি খাওয়া।

৯. ঈদগাহে ঈদের নামায আদায় করা। ঈদগাহে নামায পড়ার জন্যে যাওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। নবী (সঃ) ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তেন যদিও মসজিদে নববীতে নামায পড়ার অসাধারণ ফযিলত। একবার মাত্র বৃষ্টির জন্যে মসজিদে নববীতে তিনি নামায পড়েন-(আবু দাউদ)।

১০. এক পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে আসা।

১১. রাস্তায় ধীরে ধীরে নিম্নের তাকবীর বলা

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ
اَلْحَمْدُ--

ঈদুল আযহার দিনে সুন্নাত কাজ

ঈদুল আযহার দিনেও ঐসব কাজ সুন্নাত যা ঈদুল ফেতরের দিনে সুন্নাত।

১. ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যাবার আগে কিছু না খাওয়া সুন্নাত। হযরত বারীদাহ (রা) বলেন, নবী (সঃ) ঈদুল ফেতরে ঈদগাহে যাবার আগে অবশ্যই কিছু খেতেন এবং ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে খেতেন। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ এবং মুসনাদে আহমদে অতিরিক্ত এ কথা আছে যে, তিনি কুরবানীর গোশত খেতেন।)

২. ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাবার সময় উচ্চস্বরে তাকবীর পড়া সুন্নাত।

ঈদের নামায

ঈদের দিন দু'রাক্‌য়াত নামায পড়া ওয়াজেব। ঈদের নামায সহীহ এবং ওয়াজেব হওয়ার শর্ত তাই যা জুমার নামাযের জন্যে। অবশ্য ঈদের নামাযের জন্যে খুতবা শর্ত নয়, অথচ জুমার খুতবা ফরয। ঈদের খুতবা সুন্নাত।

ঈদের নামাযের নিয়ত

ঈদের দু'রাক্‌য়াত ওয়াজেব নামাযের নিয়ত করছি ছ'তাকবীরের সাথে। আরবীতে কেউ বলতে চাইলে বলবে–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّى رَكْعَتَىْ الْوَاجِبِ صَلٰوةَ عِيْدِ الْفِطْرِ مع سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبَةٍ –

(ঈদুল ফেতর হলে صَلٰواةِعِيْدِالْفِطْرِ বলবে এবং ঈদুল আযহা হলে صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى বলবে)।

ঈদের নামাযের পদ্ধতি

ঈদের নামাযের নিয়ত করে আল্লাহ আকবার বলতে বলতে কানের গোড়া পর্যন্ত হাত উঠাবে। তারপর হাত বেঁধে সানা পড়তে হবে।

তারপর তিনবার আল্লাহ আকবার বলতে হবে এবং প্রত্যেক বার কানের গোড়া পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে। প্রত্যেক তাকবীরের পর তিনবার সুবহানাল্লাহ

পড়ার পরিমাণ সময় থামতে হবে। তৃতীয় তাকবীরের পর হাত ঝুলিয়ে না রেখে বাঁধতে হবে। তারপর তায়াউয,তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা তার সাথে মিলাবে।

তারপর নিয়ম মত রুকু সিজদার পর দ্বিতীয় রাক্‌য়াতে সূরা ফাতেহা এবং তার সাথে অন্য 'সূরা' পড়বে।

তারপর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিন তাকবীর বলে হাত ঝুলিয়ে দেবে। অতপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।

ঈদের নামাযের সময়

সূর্য ভালোভাবে উঠার পর যখন উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়বে তখন ঈদের নামাযের সময় শুরু হবে এবং দুপুর পর্যন্ত বাকী থাকে। কিন্তু ঈদের নামায বিলম্বে না পড়া মুস্তাহাব। তবে মসনূন এই যে, ঈদুল আযহার নামায একটু তাড়াতাড়ি পড়তে হবে এবং ঈদুল ফেতরের নামায তার কিছু পরে।

ঈদের নামাযের মাসয়ালা

১. যদি কেউ ঈদের নামায না পায় তাহলে সে একাকী ঈদের নামায পড়তে পারে না। এ জন্যে যে, ঈদের নামাযের জামায়াত শর্ত। এমনি ভাবে কেউ ঈদের নামাযে শরীক হলো বটে কিন্তু তার নামায কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে সে আর কাযা পড়তে পারবে না, তার উপর কাযা ওয়াজেবও হবে না। কিছু অন্য লোক তার সাথে শরীক হলে নামায পড়তে পারে।

২. কোন কারণে ঈদুল ফেতরের নামায ঈদের দিন পড়া গেল না, তাহলে দ্বিতীয় দিনে পড়া যায়–আর এ অবস্থা যদি ঈদুল আযহার সময় হয়, তাহলে ১২ই যুলহজ্জ পর্যন্ত পড়া যায়।

৩. বিনা ওযরে ঈদুল আযহার নামায ১২ তারিখ পর্যন্ত পড়া যায় কিন্তু তা মাকরুহ হবে। ঈদুল ফেতরের নামায বিনা ওযরে বিলম্বিত করা একেবারে জায়েয নয়।

৪. ঈদের নামাযের জন্যে আযানও নেই একামাতও নেই।

৫. মেয়েদের জন্যে[১] এবং যে ব্যক্তি কোন কারণে ঈদের নামায পড়লো না তাদের জন্যে ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া মাকরুহ।

৬. কোন ব্যক্তি এমন সময়ে ঈদের নামাযে শরীক হলো যখন ইমাম তাকবীর বলে কেরায়াত শুরু করেছেন তখন সে নিয়ত বেঁধে প্রথমে তাকবীর বলবে। যদি সে রুকুতে শরীক হয়, তাহলে নিয়ত বেঁধে তসবিহ বলার পরিবর্তে তাকবীর বলবে কিন্তু হাত উঠাবে না। পুরা তাকবীর বলার পূর্বে যদি ইমাম রুকু থেকে ওঠে পড়েন, তাহলে সেও ইমামের সাথে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় যে তাকবীর ছুটে যাবে তা মাফ।

৭. ইমাম যদি ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলতে ভুলে যান এবং রুকুতে গিয়ে মনে হয়, তাহলে রুকু অবস্থাতেই তাকবীর বলবেন কেরাত করতে যাবেন না। কেয়াম করার জন্যে রুকু থেকে উঠলেও নামায নষ্ট হবে না।

৮. ঈদগাহে বা যেখানে ঈদের নামায পড়া হচ্ছে সেখানে অন্য নামায মাকরুহ। ঈদের নামাযের পূর্বেও এবং পরেও।[২]

---

১. ঈদের নামাযে শিশু এবং মেয়েদের অংশগ্রহণ :

আহলে হাদীসের মতে ঈদের নামাযে মেয়েদের এবং শিশুদের অংশগ্রহণ মসনূন। কেননা, ঈদ ও জুমার মত শায়ায়েরে ইসলামে শামিল। নবী (সঃ) স্বয়ং মেয়েদেরকে এ ব্যাপারে তাকীদ করেছেন যে, তারা যেন ঈদগাহে যায়। হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে হুকুম করেন যে, আমরা যেন কুমারী, যুবতী, পর্দানশীন মেয়েলোক এবং হায়েয অবস্থায় আছে এমন মেয়েলোকদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাই। অবশ্য যারা হায়েয অবস্থায় আছে তারা ঈদগাহে নামাযের স্থান থেকে আলাদা হয়ে বসবে, তাকবীর বলবে এবং মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হবে। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! অনেক মেয়েলোকের চাদর নেই। তারা কিভাবে ঈদগাহে যাবে? নবী (সঃ) বলেন, যার চাদর আছে সে তার চাদরের মধ্যে তার দ্বীনি বোনকে নিয়ে নেবে-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ঈদের নামাযে গেলাম। তিনি নামায পড়িয়ে খুতবা দিলেন। তারপর মেয়েদের সমাবেশে গিয়ে তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত করলেন এবং সদকা খয়রাতের জন্যে প্রেরণা দিলেন-(বুখারী)।

২. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সঃ ঈদের নামাযের জন্যে বেরুলেন। তারপর শুধু দু'রাক্য়াত পড়লেন তার আগে এবং পরে কোন নামায পড়লেন না-(তিরমিযী)।

৯. কেউ ঈদের নামায না পেলে কাযা পড়তে হবেনা। কারণ ঈদের নামাযের কাযানেই।[১]

১০. শহরে কয়েক স্থানে ঈদের নামায সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয। যারা ঈদগাহে যেতে পারে না তাদের জন্যে শহরে নামাযের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে করে তারা ঈদের নামায আদায় করতে পারে।

১১. ঈদের নামাযে উচ্চস্বরে কেরায়াত পড়তে হবে। যেসব সূরা নবী (সঃ) পড়তেন তা পড়া ভালো। তিনি কখনো সূরা 'আ'লা' এবং 'গাশিয়া' পড়তেন-(আহমদ, তিরমিযী) এবং কখনো সূরা 'কাফ' এবং 'কামার' পড়তেন-(তিরমিযী, আবু দাউদ)।

ঈদের খুতবার মাসয়ালা

১. ঈদের খুতবা সুন্নাত এবং শুনা ওয়াজেব।

২. ঈদের খুতবা নামাযের পর পড়া সুন্নাত। হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবী (সঃ) ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন। সেখানে সর্বপ্রথম তিনি নামায আদায় করতেন। তারপর জনসমাবেশের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। লোক আপন আপন কাতারে বসে থাকতো। তিনি তখন তাদের সামনে ওয়াজ করতেন, দ্বীনের হুকুম আহকাম বলে দিতেন। কোন দিকে সৈন্য পাঠাতে হলে অথবা কোন বিশেষ হেদায়েত দিতে হলে তা দিতেন। তারপর বাড়ী ফিরে আসতেন- (বুখারী, মুসলিম)।

৩. দু'খুতবা পড়া এবং উভয়ের মধ্যে এতটুকু বসা, যেমন জুমার খুতবায় বসা হয়, সুন্নাত।

৪. ঈদের খুতবায় তাকবীর বলতে হবে। প্রথম খুতবায় নয়বার এবং দ্বিতীয় খুতবায় সাতবার।

৫. ঈদুল ফেতরের খুতবায় সদকায়ে ফেতর সম্পর্কে এবং ঈদুল আযহার খুতবায় কুরবানী এবং তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কে মাসয়ালা-মাসায়েল বলতেহবে।

---

১. আহলে হাদীসদের মতে, কেউ ঈদের নামায না পেলে একাকী দু'রাকয়াত পড়ে নেবে।

তাকবীরে তাশরীক

১. যুলহজ্জ মাসের নয় তারিখকে 'ইয়াওমে আরফা' (আরাফাতের দিন) বলে। দশ তারিখকে 'ইয়াওমুন্নাহার' (কুরবানীর দিন) এবং এগারো, বারো এবং তেরো তারিখকে আইয়্যামে তাশরীক বলে। এ পাঁচ দিনে ফরয নামাযের পর যে তাকবীর বলা হয় তাকে তাকবীরে তাশরীক বলে।

২. তাকবীরে তাশরীক হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

৩. তাকবীরে তাশরীক আরফার দিনের ফজর থেকে শুরু করে ১৩ই যুলহজ্জের আসর নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়তে হবে। অর্থাৎ তেইশ ওয়াক্ত নামাযের পর তাকবীর পড়া ওয়াজেব।

৪. তাকবীরে তাশরীক উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজেব। মেয়েরা ধীরে ধীরে পড়বে।

৫. মুসাফির এবং মেয়েদের জন্যে তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজেব নয়। কিন্তু তারা যদি এমন লোকের পেছনে নামায পড়ে যার তাকবীর পড়া ওয়াজেব, তাহলে তাদের পড়াও ওয়াজেব হবে।

৬. তাকবীরে তাশরীক নামায পড়ার পর পরই পড়া উচিত। কিন্তু নামাযের পর যদি এমন কোন কাজ করা হয় যা নামাযে নিষিদ্ধ, যেমন অট্টহাসি করা, কথা বলা, অথবা মসজিদ থেকে বাইরে চলে যাওয়া, তাহলে তাকবীর বলবে না। তবে হাঁ অযু চলে গেলে বিনা অযুতে তাকবীর পড়া জায়েয এবং অযু করার পর পড়াও জায়েয।

৭. ইমাম তাকবীর পড়তে ভুলে গেলে, মুক্তাদীর উচিত সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর শুরু করা। তাহলে ইমামেরও মনে পড়বে। চুপ করে বসে থেকে ইমামের প্রতীক্ষায় থাকা ঠিক নয় যে, ইমাম পড়লে তারপর পড়া হবে।

রোগ ও মৃত্যুর বিবরণ

রোগীর এয়াদাতের মাসয়ালা ও আদব

রোগীর নিকটে গিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ইসলামী পরিভাষায় 'এয়াদাত' (পরিচর্যা) বলে, রোগীর এয়াদাত করা মুস্তাহাব। যে রোগীর কোন নিকট আত্মীয়-স্বজন নেই যারা তার দেখা শুনা করতে পারে, তার 'এয়াদাত' ও পরিচর্যা করা মুসলমানদের উপর ফরয। নবী (সঃ) এয়াদাতের বিশেষ চেষ্টা করতেন। শুধুমাত্র মুসলমানের 'এয়াদাতেই' নয়, অমুসলমানের এয়াদাতের জন্যেও তিনি যেতেন। তিনি এয়াদাতের বড়ই গুরুত্ব ও ফযিলত বয়ান করে তাঁর জন্যে তাকীদ করেছেন এবং কিছু আদব কায়দাও বলে দিয়েছেন।

১. এয়াদাতের প্রেরণা দিতে গিয়ে এ ধরনের ফযিলত বয়ান করেছেন-

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলবেন,-হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি কেন?

বান্দাহ বলবে, আল্লাহ্! তুমি তো বিশ্বজাহানের মালিক, তোমার কিভাবে এয়াদাত করবো?

আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তুমি তার এয়াদাত করনি। তুমি যদি তার এয়াদাতে সেখানে যেতে তাহলে আমাকে সেখানে পেতে-(মুসলিম)।

যখন কোন বান্দাহ তার মুসলমান ভাইয়ের এয়াদাত করে অথবা তার সাথে দেখা করার জন্যে যায়, তখন একজন ঘোষণাকারী আসমান থেকে ঘোষণা করে, তোমাকে মুবারকবাদ। তোমার রোগী দেখতে যাওয়ার জন্যে মুবারকবাদ, তুমি জান্নাতে একটা বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছো - (তিরমিযী)।

২. রোগীর নিকটে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়া উচিত। ধৈর্যধারণ করার জন্যে বলতে এবং তার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করতে হবে-রোগ আসলে আল্লাহ্র রহমত। কারণ এখন মুমেনের যে সামান্য পরিমাণেও দুঃখ-কষ্ট হয়, তার

দ্বারা তার গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। নবী (সঃ) রোগীর কাছে জিজ্ঞেস করতেন كَيْفَ تَجِدُكَ বলুন, কেমন আছেন? তারপর সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন لاَ بَاسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ "চিন্তা করবে না, আল্লাহ্‌ চাহেন এ রোগ গুনাহ্‌ থেকে পাক করার কারণ হবে।"

হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন–মুসলমানদের উপরে যে কোন বিপদ, যে কোন রোগ, যে কোন পেরেশানী, যে কোন দুঃখ, কষ্ট, শোক প্রভৃতি আসে এমন কি যদি একটা কাঁটাও বিদ্ধ হয়, তাহলে আল্লাহ্‌ এ সবের কারণে তাদের গুনাহ মাফ করে দেন– (বুখারী, মুসলিম)।

হযরত আবু সাঈদ (রা) আরও বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যখন তুমি কোন রোগীর পরিচর্যা করতে যাও, তারপর সান্ত্বনার বাণী শুনাও যদিও তোমার এসব কথায় পরিবেশ বদলে যায় না, তথাপি রোগী আনন্দ পাবে–(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

৩. রোগীর কাছে তার জন্যে দোয়া করাও সুন্নাত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সঃ)–এর অভ্যাস ছিল, যখন আমাদের মধ্যে কারো অসুখ হতো, তখন তিনি তাঁর ডান হাত তার শরীরের উপর বুলিয়ে দিতেন এবং এ দোয়া পড়তেন–

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا -

–হে মানুষের রব! এ রোগীর দুঃখ দূর করে দাও। তাকে আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্যদানকারী। আরোগ্য দানের কাজ তোমারই। এমন আরোগ্যদান কর যেন রোগের নাম নিশানা না থাকে।

৪. রোগীর দ্বারা নিজের জন্যে দোয়া করানোও উচিত। কারণ রোগ অবস্থায় তার অন্তকরণ আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট থাকে। হাদীসে আছে–যখন তোমরা কোন রোগীর এয়াদাতের জন্যে যাও তখন তোমাদের জন্যে দোয়া করার জন্যে তাকে বলো। রোগীর দোয়া ফেরেশতার দোয়ার মতো–(ইবনে মাজাহ)। ফেরেশতা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় দোয়া করেন এবং সে জন্যে তাঁদের দোয়া কবুল হয়।

৫. রোগীর নিকট বেশীক্ষণ বসে থাকা ঠিক নয়। তবে যদি মনে হয় যে, রোগী বেশীক্ষণ থাকা পসন্দ করে এবং তার সান্ত্বনা লাভ হচ্ছে তাহলে দোষ নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রোগীর নিকটে বেশীক্ষণ বসা এবং গোলমাল করা ঠিক নয়।

৬. অমুসলিমের এয়াদাতের সময় সুযোগ হলে হিকমতের সাথে ঈমান ও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা উচিত। রোগের সময় মন নরম হয়, হক কবুল করার জন্যেও তুলনামূলক ভাবে বেশী সজাগ হয়। হযরত আনাস (রা) বলেন, একটি ইহুদী বালক নবীর খেদমতে যাতায়াত করতো। সে অসুস্থ হলে নবী (সঃ) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার শিয়রে বসলেন। তারপর বললেন, দ্বীনে হক গ্রহণ কর। ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাপ বললো, 'আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও'।

ছেলেটি মুসলমান হলো, তারপর নবী (সঃ) তার ঘর থেকে এ কথা বলতে বলতে বেরুলেন, আল্লাহ্‌র শোকর, তিনি ছেলেটাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচালেন-(বুখারী)।

মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্যে আদবকায়দা ও হুকুম

১. যদি এমন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় যে, রোগী আর বেশীক্ষণ নয়, তাহলে তাকে ডান কাত করে দেয়া যাতে মুখ কেবলার দিক হয় এবং মাথা উঁচু করে দেয়া সুন্নাত। এরূপ করতে রোগীর কষ্ট হলে তার যাতে আরাম হয় সে অবস্থায় রাখা।

২. রোগীর কাছে বসে কালেমা পড়া উচিত। কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তিকে পড়তে বলা ঠিক নয়। এমন না হয় যে, জান বেরুবার কষ্টে সে হঠাৎ কালেমা পড়তে অস্বীকার করে বসে, অথবা অস্থিরতার মধ্যে এমন কোন অসংগত কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। একবার সে যদি কালেমা পড়ে তাহলে চুপ করে থাকা উচিত। তবে হাঁ রোগী যদি দুনিয়ার কোন কথা-বার্তা বলে তাহলে তালকীন করা উচিত যাতে শেষ কথা কালেমা তাইয়েবা হয়। রোগীকে কালেমায়ে তাইয়েবার তালকীন করানো মুস্তাহাব। নবী (সঃ) বলেন-

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকীন কর-(মুসলিম)। তিনি আরও বলেন-যার শেষ কথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে সে জান্নাতে যাবে-(আবু দাউদ)।

৩. মরণের সময় রোগীর পাশে সূরা ইয়াসীন পড়াও মুস্তাহাব। নবী (সঃ) বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে সুরায়ে ইয়াসীন পড়-(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)।

৪. শেষ সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে নেক এবং আল্লাহ্ভীরু লোকের বসা ভালো। আল্লাহ্ তাঁদের বরকতে রহমত নাযিল করতে পারেন-(ফতুয়ায়ে আলমগীরী)।

৫. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে খুশবু প্রভৃতি লাগানো মুস্তাহাব।

৬. জান বেরুবার পর আস্তে তার চোখ বন্ধ করে দিতে হবে।

চোখ বন্ধ করার সময় এ দোয়া পড়া উচিত ঃ

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ -

হে আল্লাহ্ তার কঠিন কাজ সহজ করে দাও। পরবর্তী কালে তার যে অবস্থা হবে তা তুমি সহজ করে দাও। তাকে তোমার দীদার লাভে ধন্য কর এবং যেখানে সে যাচ্ছে তা তার জন্যে ঐ স্থান থেকে ভালো করে দাও যেখান থেকে সে যাচ্ছে।

৭. প্রিয়জনদের মৃত্যুতে শোক দুঃখ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। চোখ দিয়ে পানি পড়াও স্বাভাবিক। কিন্তু বিলাপ করে কাঁদা, বুক চাপড়ানো, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, পাগলের মতো শোকে গড়াগড়ি করা প্রভৃতি ঠিক নয়। নবী (সঃ) এসব কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

৮. মৃত্যুর পর অভিযোগের সুরে কথা বলা, নিজেকে অভিসম্পাৎ করা, নিজের জন্যে বদ দোয়া করা একেবারে অন্যায়। নবী (সঃ) বলেন, নিজের জন্যে সব সময় দোয়া করতে থাকো। এ জন্যে যে, তোমরা যে দোয়া কর ফেরেশতাগণ তার জন্যে আমীন বলতে থাকেন-(মুসলিম)।

৯. মৃত ব্যক্তিকে ভালো কথার দ্বারা স্মরণ করা উচিত। কোন মন্দ কাজ করে থাকলেও শুধু তার গুণাবলী বর্ণনা করা উচিত। নবী (সঃ) বলেন-আপন মৃত ব্যক্তিদের গুণাবলী বর্ণনা কর। তাদের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখো-(আবু দাউদ)।

মাইয়েতের (মৃত ব্যক্তির) গোসলের হুকুম

১. মৃত্যুর পর তার গোসল ও কাফন দাফনে বিলম্ব করা উচিত নয়। নবী (সঃ)- এর নির্দেশ হচ্ছে ঃ-

কাফন-দাফনে তাড়াতাড়ি কর। মৃত ব্যক্তি কারো বাড়িতে অধিকক্ষণ পড়ে থাকা ঠিক নয়-(আবু দাউদ)।

২. মাইয়েতকে গোসল দেয়া ফরযে কেফায়া। কোন মাইয়েত লাওয়ারেস হলে তার গোসলের দায়িত্ব সামষ্টিকভাবে সকল মুসলমানের। গোসল ব্যতীত কোন মাইয়েত দাফন করা হলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে। যদি তাদের জানা থাকা সত্ত্বেও তারা অবহেলা করে।

৩. গোসল ব্যতীত কোন মাইয়েতকে কবরে রাখা হলে এবং তার উপর মাটি দেয়া না হলে তাকে উঠিয়ে গোসল দেয়া আবশ্যক তবে উপরে মাটি দেয়া হলে আর বের করা উচিত নয়।

৪. মাইয়েতের কোন অংগ-অংশ যদি ধোয়া না হয়ে থাকে এবং কাফন পরাবার পর মনে হয়। তাহলে কাফন খুলে তা ধুয়ে দেয়া উচিত। তবে যদি কোন সামান্য অংশ শুকনো থাকে যেমন কোন আঙুল শুকনো রয়ে গেছে অথবা সেই পরিমাণ অন্য কোন অংশ, তাহলে কাফন খুলে ধুয়ে ফেলার দরকার নেই।

৫. মাইয়েতকে একবার গোসল দেয়া ফরয এবং তিন বার দেয়া সুন্নাত।

৬. যার জন্যে মাইয়েতকে দেখা দেয়া জায়েয সেই গোসল দিতে পারে। সে জন্যে পুরুষ নারীর এবং নারী-পুরুষের গোসল দিতে পারে না। তবে বিবি স্বামীর গোসল দিতে পারে। এ জন্যে যে, ইদ্দতের সময় পর্যন্ত তাকে স্বামীর নেকাহের মধ্যেই ধরতে হবে। কিন্তু স্বামীর জন্যে স্ত্রীর গোসল জায়েয নয়। এ জন্যে যে, স্ত্রীর মৃত্যুর সাথে সাথে নেকাহ খতম হয়ে যায়। আহলে হাদীসের মতে স্বামী স্ত্রীর গোসল দিতে পারে।

৭. নাবালেগ বালক বালিকাকে নারী পুরুষ উভয়েই গোসল দিতে পারে।

৮. মাইয়েতের কোন প্রিয়জন হলে তারই গোসল দেয়া ভালো। তার গোসলের পদ্ধতি জানা না থাকলে অন্য কোন নেক লোক গোসল দিবে।

৯. কোন বাচ্চা পয়দা হওয়ার পরই মারা গেলে তার গোসল দেওয়া ফরয হবে। মৃত অবস্থায় পয়দা হলে তার গোসল ফরয হবে না। তবে গোসল দেয়া ভালো।

মাইয়েতের গোসল সুন্নাত মুতাবেক পদ্ধতি

মাইয়েতকে তক্তার উপর শুইয়ে তার কাপড় খুলে ফেলতে হবে এবং আর একটা কাপড় নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত উপরে দিতে হবে। যাতে করে তার লজ্জা স্থান দেখা না যায়। তারপর হাতে কাপড় জড়িয়ে তার এস্তেঞ্জা করে দিতে হবে। তারপর অযু করাতে হবে। তা এভাবে যে–প্রথমে তার চেহারা ধুতে হবে, তারপর কনুই পর্যন্ত দু'হাত, তারপর মাথা মুসেহ, তারপর দু'পা। নাকে মুখে পানি দিতে হবে না। তবে তুলা ভিজিয়ে দাতের মাড়ি এবং নাকের ভেতর মুছে দেয়া জায়েয। জানাবাত এবং হায়েয অবস্থায় মারা গেলে এরূপ করা আবশ্যক। তারপর নাক, মুখ এবং কানে তুলা দিতে হবে যেন পানি ভেতরে না যায়। তারপর ধুতে হবে। সাবান প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর মাইয়েতকে বাম কাত করে শুইয়ে কুলপাতা দিয়ে অল্প গরম পানি তিনবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে ঢালতে হবে যেন বাম কাত পর্যন্ত পৌছে যায়। তারপর ডান কাত করে এমনিভাবে তিনবার পানি ঢালতে হবে। তারপর মাইয়েতকে কিছু জিনিসের ঠেস দিয়ে বসাতে হবে এবং ধীরে ধীরে তার পেট ঠাসতে হবে। যদি কোন মল বের হয় তা পরিষ্কার করে দিতে হবে। কিন্তু অযু এবং গোসল দ্বিতীয় বার করাতে হবে না। তার পর বাম কাত করে শুইয়ে কর্পুর মেশানো পানি তিনবার ঢালতে হবে। তারপর একটা কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর মুছে দিতে হবে।

কাফনের মাসয়ালা

১. গোসলের পর শরীর শুকে গেলে কাফন পরাতে হবে।

২. কাফন পরানো ফরযে কেফায়া।

৩. কাফন কেনার দায়িত্ব তাদের যারা তার জীবনে ভরণ–পোষণ বহন করেছে। মাইয়েতের এমন যদি কেউ না থাকে এবং যদি কোন সম্পদও রেখে গিয়ে না থাকে তাহলে তার কাফনের দায়িত্ব সকল মুসলমানের সামষ্টিকভাবে। এখন কোন এক ব্যক্তি তার দায়িত্ব গ্রহণ করুক অথবা সকলে মিলে।

৪. বালেগ, নাবালেগ, মুহাররাম, গায়ের মুহাররাম সকলের কাফন একই সমান।

৫. কাফনের জন্যে সেই ধরনের কাপড় হতে হবে যা মাইয়েতের জন্যে জীবদ্দশায় জায়েয ছিল। মেয়েদের জন্যে রেশমী অথবা রঙিন কাপড়ের

কাফন দেয়া জায়েয। কিন্তু পুরুষের জন্যে রেশমী কাপড় অথবা জাফরানী রঙের কাপড় দেয়া যাবে না।

৬. বেশী মূল্যবান কাপড় কাফন হিসেবে দেয়া মাকরুহ। আর একেবারে নিকৃষ্ট ধরনের কাপড় হওয়াও ঠিক নয়। বরঞ্চ জীবদ্দশায় মাইয়েত যে মানের কাপড় ব্যবহার করতো সে মানের কাফন হওয়াই উচিত।

৭. সাদা কাফন হওয়াই ভালো-নতুন হোক বা পুরাতন।

৮. অনেকে জীবদ্দশায় আপন কাফনের ব্যবস্থা করে থাকে। তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু জীবদ্দশায় নিজের কবর খনন করে রাখা মাকরুহ।

৯. পুরুষের জন্যে তিনটি কাপড় সুন্নাত

(ক) অ-সিলাই করা জামা বা কোর্তা

(খ) তহবন্দ

(গ) চাদর

জামা গলা থেকে পা পর্যন্ত হতে হবে। ইজার ও তহবন্দ মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং চাদর তা থেকে একহাত লম্বা হতে হবে যেন মাথা এবং পা দু'দিকে বাঁধা যেতে পারে। কোর্তা বা জামায় আস্তিন অথবা কল্লী হবে না।

১০. মেয়েদের কাফনে পাঁচ কাপড়-

(ক) কোর্তা

(খ) ইজার

(গ) মাথাবন্ধ

(ঘ) সিনাবন্ধ

(ঙ) চাদর

কোর্তা গলা থেকে পা পর্যন্ত। কল্লী বা আস্তিন হবে না। ইজার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদর তার থেকে এক হাত লম্বা। মাথা বন্ধ তিন হাত লম্বা হতে হবে। মাথা ঢেকে চেহারার উপর দিয়ে দিতে হবে। বাঁধা অথবা পেচানো যাবে না। সীনাবন্ধ বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এমন চওড়া হতে হবে যেন, বাঁধা যায়।

১১. উপরের মুতাবেক কাফন সংগ্রহ করতে না পারলে পুরুষের ইজার ও চাদর এবং মেয়েদের ইজার, চাদর এবং মাথা বন্ধ হলেও চলবে। তাও

সংগ্রহ করতে না পারলে যা পারা যায় তাই করতে হবে। কোন অংশ খোলা থাকলে পাতা ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন উলংগ না থাকে।

১২. মৃত বাচ্চা হলে অথবা গর্ভপাত হলে কোন পাক সাফ কাপড় জড়িয়ে দাফন করা উচিত।

কাফন পরাবার নিয়ম

পুরুষকে কাফন পরাবার নিয়ম এই যে, প্রথমে কাফনের চাদর কোন চৌকি বা তক্তার উপর বিছিয়ে দিতে হবে। চাদরের উপর ইজার বিছাতে হবে। তারপর মাইয়েতকে কোর্তা পরিয়ে ইজারের উপর শুইয়ে দিতে হবে। তারপর ইজার এমনভাবে জড়াতে হবে যেন তার ডান কিনারা বাম কিনারার উপর থাকে। অর্থাৎ প্রথম বাম দিক থেকে জড়াবে। এভাবে চাদরও জড়াতে হবে।

মেয়েলোকদের কাফন পরার নিযম এই যে, প্রথমে চাদর বিছাবে তারপর ইজার, তারপর কোর্তা পরায়ে মাইয়েতের চুল দু'ভাগ করে ডানে বামে কোর্তার উপর রেখে দিতে-হবে। তারপর মাথাবন্ধ মাথায় উড়ে দিয়ে মুখের উপর রাখতে হবে, বাঁধা হবে না। তারপর মাইয়েতকে ইজারের উপর শুইয়ে দিতে হবে। তারপর উপরে বর্ণিত নিয়মে ইজার পরাতে হবে যেন ডান কিনারা বাম কিনারার উপরে পড়ে। এভাবে সিনাবন্ধ ও চাদর জড়াতে হবে। মাথা, কোমর এবং পা কাপড়ের ফিতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যেন বাতাসে রাস্তায় খুলে না যায়।

জানাযার নামায

জানাযার নামায হচ্ছে মাইয়েতের জন্যে রহমানুর রহীমের কাছে দোয়া করা। যখন কোন দোয়া মুসলমানগণ সমবেত ভাবে করে তখন তা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যে জানাযার নামাযে যতো বেশী লোক হয় ততো ভালো। কিন্তু লোক বেশী জমা করার জন্যে জানাযা বিলম্ব করা ঠিক নয়।

জানাযার নামাযের হুকুম

জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। কেতাব ও সুন্নাত থেকে তার ফরয হওয়া প্রমাণিত। অতএব অস্বীকারকারী কাফের।

জানাযা নামাযে দু'টি ফরয ঃ

১. চারবার আল্লাহু আকবার বলা। প্রত্যেক তাকবীর এক রাক্‌য়াতের স্থলাভিষিক্ত। এ নামাযে রুকু সিজদা নেই।

২. কেয়াম করা। বিনা ওযরে বসে জানাযার নামায জায়েয হবে না। কোন কিছুর উপরে আরোহণ করেও জায়েয হবে না।

জানাযা নামাযের সুন্নাত

এ নামাযে তিনটি সুন্নাত

১. আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পড়া।

২. নবীর (সঃ) উপর দরূদ পড়া।

৩. মাইয়েতের জন্যে দোয়া করা।

নামায পড়ার নিয়ম

নামাযের জন্যে তিন কাতার সুন্নাত। লোক বেশী হলে তিন কাতারের বেশী করা যাবে কিন্তু কাতার বেজোড় হওয়া উচিত। মাইয়েতকে কেবলার দিকে সামনে রেখে তার সিনা বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন এবং সকলে এই নিয়ত করবে ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ
اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

মাইয়্যেত স্ত্রীলোক হ'লে لِهٰذَا الْمَيِّتِ-এর স্থলে لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ এইরূপ নিয়ত করে একবার আল্লাহু আকবার (اللہ اکبر) বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত বাঁধবে এবং পড়বে-

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ
ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ -

-হে আল্লাহ্ সকল প্রশংসাসহ তুমি সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পাক ও পবিত্র। তোমার নাম মঙ্গল ও বরকতপূর্ণ, তোমার মহত্ত্ব অতি বিরাট, তোমার প্রশংসা অতি মহত্ত্বপূর্ণ এবং তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

সানা পড়ার পর আবার তাকবীর বলবে কিন্তু হাত উঠাবে না। তারপর নিম্নের দরুদ পড়বে

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

তারপর তাকবীর বলে মাইয়েতের জন্যে দোয়া পড়বে। মাইয়েত যদি বালেগ হয়, (পুরুষ হউক বা স্ত্রী) তবে এই দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا
وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلٰى
الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ (ترمذى)

–হে আল্লাহ্, আমাদের জীবিত, আমাদের মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোটো ও বড়ো, আমাদের পুরুষ এবং নারী সকলের গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ্, তুমি যাদেরকে জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, তুমি যাদের মৃত্যু দাও তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও।

তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে দুদিকে সালাম ফিরাবে। তাকবীর ইমাম উচ্চস্বরেবলবেন।

নাবালেগ মাইয়েতের জন্যে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا –

–হে আল্লাহ্, এ বাচ্চাকে আমাদের নাজাত ও আরামের জন্যে আগে পাঠিয়ে দাও, তার জন্যে যে শোক দুঃখ তা আমাদের প্রতিদান ও সম্পদের কারণ বানিয়ে দাও, তাকে আমাদের শাফায়াতকারী বানাও যা কবুল করা হবে।

নাবালিকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً –

যাদের এসব দোয়া জানা নেই, তারা বলবে –

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

তা বলতে না পারলে শুধু, চার তাকবীর বললে নামায হয়ে যাবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে তাদের প্রিয়জনদের জানাযায় শরীক হয়ে সমবেতভাবে দোয়া করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা নানা–ওযর আপত্তি করে নিজে জানাযায় শরীক হয় না। অন্যকে নামায পড়তে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন তামাশা দেখে।

জানাযার বিভিন্ন মাসয়ালা

১. জানাযার জন্যে জামায়াত শর্ত নয়। একজন জানাযার নামায পড়লে ফরয আদায় হবে। তবে ব্যবস্থাপনার সাথে জানাযায় শরীক হওয়া সকলের উচিত। নবী (সঃ) বলেন যে, জানাযায় শরীক হওয়া মুসলমান মাইয়েতের হক-(মুসলিম)।

২. জানাযা ঐসব মসজিদে মাকরুহ যা পাঞ্জেগানা নামাযের জন্যে তৈরী করা হয়েছে। জুমা মসজিদেও মাকরুহ। তবে যে মসজিদ বিশেষ করে জানাযায় নামাযের জন্যে তৈরী করা হয়েছে, সেখানে মাকরুহ নয়।

৩. একই সময়ে কয়েকটি জানাযা জমা হলে প্রত্যেকের পৃথক পৃথকও পড়া যায় এবং এক সাথেও পড়া যায়, একসাথে পড়তে হলে তার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক জানাযার মাথা উত্তরে এবং পা দক্ষিণে করে রাখতে হবে। অর্থাৎ কারো মাথা বা পায়ের দিকে কোন জানাযা থাকবে না। তারপর ইমাম পূর্বধারে রাখা জানাযার সিনা বরাবর দাঁড়াবেন। তাহলে সকলের সিনা বরাবর দাঁড়ানো হবে।

৪. যেসব কারণে অন্যান্য নামায নষ্ট হয় সেসব কারণে জানাযার নামায নষ্ট হবে। তবে অট্টহাসিতে জানাযার নামায নষ্ট হয় না অথবা পুরুষের বরাবর অথবা সামনে কোন মেয়েলোক দাঁড়ালেও নামায নষ্ট হবে না।

৫. যদি কোন ব্যক্তি বিলম্বে জানাযায় হাযির হয় যখন ইমাম কিছু তাকবীর বলে ফেলেছেন, তখন সে আসা মাত্রই ইমামের সাথে শামিল হবে না বরঞ্চ পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করবে যখন ইমাম তাকবীর বলবেন তখন সে তাকবীর বলে নামাযে শামিল হবে। এ তাকবীর তার তাকবীর তাহরীমা মনে করা হবে। ইমাম সালাম ফিরলে মসবুকের মতো সে ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো বলে নামায শেষ করবে।

৬. যদি কারো অযু বা গোসলের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং সে মনে করে যে অযু বা গোসল করতে গেলে জানাযা পাওয়া যাবে না, তাহলে তায়াম্মুম করে জানাযার নামাযে শরীক হওয়া জায়েয হবে। এ জন্যে যে, জানাযার কাযা নেই।

৭. জানাযা নামায পড়াবার সবচেয়ে হকদার ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান অথবা তাঁর নিযুক্ত শহরের শাসনকর্তা। তা না হলে শহরের কাযী অথবা তার সহকারী। এসব না থাকলে মহল্লার ইমাম। মহল্লার ইমাম তখন

পড়াবেন যখন মাইয়েতের আপনজন কেউ ইমামের চেয়ে এলম ও তাকওয়ার দিক থেকে উৎকৃষ্টতর না হয়। নতুবা আপনজনই জানাযা পড়াবার সবচেয়ে বেশী হকদার। তারপর অলী যাকে অনুমতি দেয় সে পড়াবে।

৮. জানাযার পর পরই মাইয়েত কবরে নিয়ে যাওয়া উচিত।

৯. মাইয়েত ছোট বাচ্চা হলে তাকে হাতে উঠিয়ে কবরে নিয়ে যেতে হবে এক ব্যক্তি কিছু দূর নেবে অন্য ব্যক্তি কিছু দূর এভাবে পালাক্রমে কবরে নিয়ে যাবে।

১০. মাইয়েত বয়স্ক হলে তাকে খাটিয়াতে করে চারজন চার পায়া ধরে কাঁধে করে নিয়ে যাবে।

১১. কোন ওযর ব্যতীত মাইয়েতকে যানবাহনে করে নেয়া মাকরুহ।

১২. জানাযা একটু দ্রুত কদমে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত, তবে এতোটা দ্রুত নয় যে, মাইয়েত ঝাকুনি পায়।

১৩. জানাযার পেছনে যাওয়া মুস্তাহাব। সকলের আগে যাওয়া মাকরুহ। কিছু আগে কিছু পেছনে যাওয়া যায়।

১৪. জানাযার সাথে যারা চলবে, জানাযা নামাবার আগে তাদের বসা ঠিক নয়। বিনা ওযরে বসা মাকরুহ।

১৫. জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে চলা মুস্তাহাব। যানবাহনে হলে তাকে পেছনে থাকতে হবে।

১৬. জানাযার সাথে চলতে গিয়ে উচ্চস্বরে দোয়া যিকির করা মাকরুহ।

১৭. জানাযার সাথে মেয়েদের যাওয়া মাকরুহ তাহরীমী।

জানাযা কাঁধে নেয়ার নিয়ম

জানাযা উঠিয়ে কাঁধে নেয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি এই যে, সামনের পায়া ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে। এমনি প্রত্যেকে দশ কদম পর পর পায়া বদল করবে। এভাবে ৪০ কদম যাবে। হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি জানাযা কাঁধে করে ৪০ কদম যাবে, তার ৪০টি কবীরা গুনাহ মাফ হয়।

দাফনের মাসয়ালা

১. মাইয়েত দাফন করা ফরযে কেফায়া। যেমন গোসল দেয়া। জানাযার নামায পড়া ফরযে কেফায়া।

২. কবরের দৈর্ঘ মাইয়েতের উচ্চতার সমান, গভীরতা তার অর্ধেক। প্রস্ত হাত দুই যাতে মাইয়েতকে রাখতে পারা যায়।

৩. কবরে নামাবার পূর্বে জানাযা কবরের কেবলার দিকে রাখতে হবে। যারা কবরে নামাবে তারা কেবলামুখী হয়ে নামাবে।

৪. কবরে নামাবার সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলা মুস্তাহাব।

৫. মাইয়েত কবরে রেখে ডান কাত করে কেবলামুখী করে দেয়া সুন্নাত।

৬. মাইয়েত মেয়েলোক হলে কবরে নামাবার সময় পর্দা করা মুস্তাহাব। মাইয়েতের শরীর খুলে যাওয়ার আশংকা হলে পর্দা করা ওয়াজেব।

৭. কবরে মাটি দেয়া মাথার দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। প্রত্যেকে দু'হাতে মাটি নিয়ে কবরে ঢালবে। প্রথমবার বলবে مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ দ্বিতীয়বার وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ এবং তৃতীয়বার বলবে وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

৮. দাফন করার পর কিছুক্ষণ কবরের পাশে থেকে মাইয়েতের জন্যে দোয়া করা মুস্তাহাব।

৯. কবরে মাটি দেয়ার পর কবরে পানি ছিটানো মুস্তাহাব।

১০. কবরে কোন তাজা গাছের ডাল পুঁতে দেয়া মুস্তাহাব। হাদীসে আছে, নবী (সঃ) একবার একটা সবুজ ডাল দু'ভাগ করে দু'টি কবরে পুঁতে দিয়ে বললেন, যতোক্ষণ না এ ডাল শুকনো হবে, ততোক্ষণ কবরে মাইয়েতের আযাব কম হবে।

১১. এক কবরে একটি মাইয়েত দাফন করা উচিত। প্রয়োজন হলে একাধিক করা যায়।

১২. সৌন্দর্যের জন্যে কবরের উপরে দালান-কোঠা, গম্বুজ, মিনারা প্রভৃতি তৈরী করা হারাম।

১৩. সমুদ্র ভ্রমণে কারো মৃত্যু হলে এবং স্থলভূমি বহু দূরে হলে-যেখানে পৌছতে পৌছতে লাশ খারাপ হওয়ার আশংকা, এমন অবস্থায় মাইয়েত

গোসল দিয়ে তার জানাযা করে সমুদ্রের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তবে স্থলভূমি নিকটে হলে স্থলে তার কবর দেয়া উচিত।

সান্ত্বনা দান (তা'যিয়াত)

মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনকে ধৈর্য ধারণের উদ্দেশ্যে কিছু সান্ত্বনার বাণী শুনানো, তাদের প্রতি সমবেদনা জানানো, তাদের দুঃখ লাঘব করা এবং মাইয়েতের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা প্রভৃতিকে ইসলামী পরিভাষায় 'তা'যিয়াত' বলে। নবী (স) স্বয়ং তা করেছেন এবং করার জন্যে তাকীদ করেছেন। তিনি বলেন–

–যে ব্যক্তি কোন বিপন্নের তা'যিয়াত করে, তার জন্যে ঐরূপ প্রতিদান রয়েছে, যেমন স্বয়ং বিপন্নের জন্যে রয়েছে–(তিরমিযী)।

হযরত মাআয (রা) বলেন, তাঁর ছেলের ইন্তেকাল হলে নবী (স) নিম্নোক্ত তা'যিয়াতনামা পাঠানঃ–

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে মাআয বিন জাবালের প্রতি–

তোমার উপরে সালাম হোক। আমি প্রথমে তোমার সামনে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পড়ছি যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তারপর দোয়া করছি এ শোকে আল্লাহ্ তোমাকে বিরাট প্রতিদান দিন। তোমাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। আমাদেরকে এবং তোমাকে তাঁর শোকর আদায় করার তওফীক দিন। আসল কথা এই যে, আমাদের জান-মাল এবং পরিবারবর্গ আল্লাহ্‌র মুবারক দান, আর এগুলো আমাদের কাছে তাঁর সপর্দ করা আমানত। আল্লাহ্ যতোদিন চান এ দানগুলো থেকে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দেন। যখন চান তখন এ দান ফেরত নেন। তার পরিবর্তে বিরাট প্রতিদান দেন। অর্থাৎ তুমি যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখেরাতের প্রতিদানের জন্যে সবর কর, তাহলে তিনি তোমাকে তাঁর খাস রহমত ও হেদায়েত দ্বারা ধন্য করবেন।

অতএব সবর কর, এমন যেন না হয় যে, তোমার শোকে হা হুতাশ করা তোমার প্রতিদান ও সওয়াব বরবাদ করে দেয়, তারপর তুমি অনুতাপ করতে থাকবে। মনে রেখো যে, শোকে কান্নাকাটি করাতে মৃত ব্যক্তি ফিরে আসবে না, আর না তার দ্বারা শোক-দুঃখ কমে যায়। যে হুকুম নাযিল হয় তা হয়ে থাকে এবং হয়ে গেছে–(মুয়াজ্জমে কবীর)।

ইসালে সওয়াব

ইসালে সওয়াবের অর্থ হলো সওয়াব পৌছানো। পরিভাষা হিসেবে ইসালে সওয়াব হলো, মানুষ তার নেক আমল এবং এবাদতের সওয়াব তার কোন প্রিয়জনকে পৌছাবার নিয়ত করে।

সকল নফল এবাদত, তা মালের হোক, যেমন সদকা, খয়রাত, কুরবানী অথবা দৈহিক হোক, যেমন নামায, রোযা প্রভৃতি–তার সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌছানো জায়েয। আর নবী মুস্তফা (সঃ)–এর রূহে মুকাদ্দাসে সওয়াব পৌছানো মুস্তাহাব। তাঁর যে বিরাট দান, স্নেহ ভালবাসা তার প্রতিদান দেয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে মুমেন বান্দাহ তার এবাদতের সওয়াব তার পাক রূহে পৌছে দেয়াকেই তার সৌভাগ্য মনে করে। যার এ সৌভাগ্য জীবনে একবারও হয়নি তার চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ নেই।

ইসালে সওয়াবের নিয়ম

ইসালে সওয়াবের নিয়ম পদ্ধতি এই যে, মানুষ যে এবাদতের সওয়াব কোন ব্যক্তিকে পৌছাতে চায় সে তার এবাদত শেষ করে এভাবে দোয়া করবে–

'আল্লাহ্', আমার এ এবাদতের সওয়াব তুমি আমার অমুক মৃত ব্যক্তিকে পৌছিয়ে দাও।

আল্লাহ্‌র অসীম মেহেরবানীতে আশা করা যায় যে, তিনি তার সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌছে দেবেন।

ইসালে সওয়াবের মাসয়ালা

১. ইসালে সওয়াবের জন্যে এটা শর্ত নয় যে, এবাদতের সময়েই অন্যকে সওয়াব পৌছাবার নিয়ত করতে হবে। বরঞ্চ পরে যখনই চাইবে নিজের এবাদতের সওয়াব অন্যকে পৌছাতে পারবে।

২. যে ব্যক্তি তার এবাদতের সওয়াব কোন মৃত ব্যক্তিকে পৌছায়, আল্লাহ্ তার সওয়াব সেই মৃত ব্যক্তিকে পৌছিয়ে দেন এবং এবাদতকারীকেও

বঞ্চিত করেন না। তাকেও সে এবাদতের পুরা সওয়াব দিয়ে দেন। সে জন্যে আল্লাহ্ তাআলা এ অসীম অনুগ্রহের দাবী এই যে, মুমেন বান্দাহ যখন কোন নফল এবাদত করবে, তখন তার সওয়াব সালেহীনদের রূহের উপর পৌছাবে।

৩. কেউ তার আমলের সওয়াব কয়েক ব্যক্তির কাছে পৌছাতে চাইলে তা কয়েক অংশে ভাগ করা হয় না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম অনুগ্রহে প্রত্যেককে পুরা পুরা সওয়াব দান করেন।

৪. ইসালে সওয়াবের এসব সরল মাসয়ালা ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন শর্ত আরোপ করা, কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা, তারপর শরয়ী হুকুমের মতো তা মেনে চলা, তার ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে ফেরকা বন্দী করা অত্যন্ত দুষনীয়। হক পথ অনুসরণ করার প্রেরণা যাঁরা রাখেন, সেসব মুমেনদের জন্যে এসব করা মোটেই শোভনীয় নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১। তাফসীরুন্নাসাফী।
২। তাফসীরে খাযেন।
৩। তাফসীরে বায়যাবী।
৪। তর্জুমানুল কুরআন–মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র)।
৫। তাফহীমুল কুরআন–মাওলানা মওদূদী (র)।
৬। তরজমা ও তাফসীর–মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী (র)।
৭। সেহাহ্ সেত্তা।
৮। মুয়াত্তা।
৯। রিয়াদুস সালেহীন।
১০। আল–আদাবুল মুফরাদ।
১১। হাসনে হেসীন।
১২। মিশকাত।
১৩। এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন।
১৪। কাশফুল মাহজুব প্রভৃতি।

নিম্নের গ্রন্থাবলী থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছেঃ–

১। হেদায়া।
২। আইনুল হেদায়া (হেদায়ার ব্যাখ্যা)।
৩। ফাত্হুল কাদীর।
৪। কুদুরী।
৫। শরহে বেকায়া।
৬। নূরুল ইযাহ্।
৭। ফেকহুস সুন্নাত–সাইয়েদ সাবেক (র)।
৮। ইলমুল ফেকাহ্।
৯। তা'লীমুল ইসলাম।
১০। নামাযে মুহাম্মদী–মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী (র)।
১১। ইসলামী তা'লীম–মাওলানা আবদুস সালাম বাস্তবী (র)।
১২। আলাতে জাদীদা কে শরয়ী আহকাম–মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)।
১৩। রাসায়েল ও মাসায়েল–মাওলানা মওদূদী (র)।
১৪। বেহেশতী যিওর–প্রভৃতি।